আত্মার পরিচর্যা

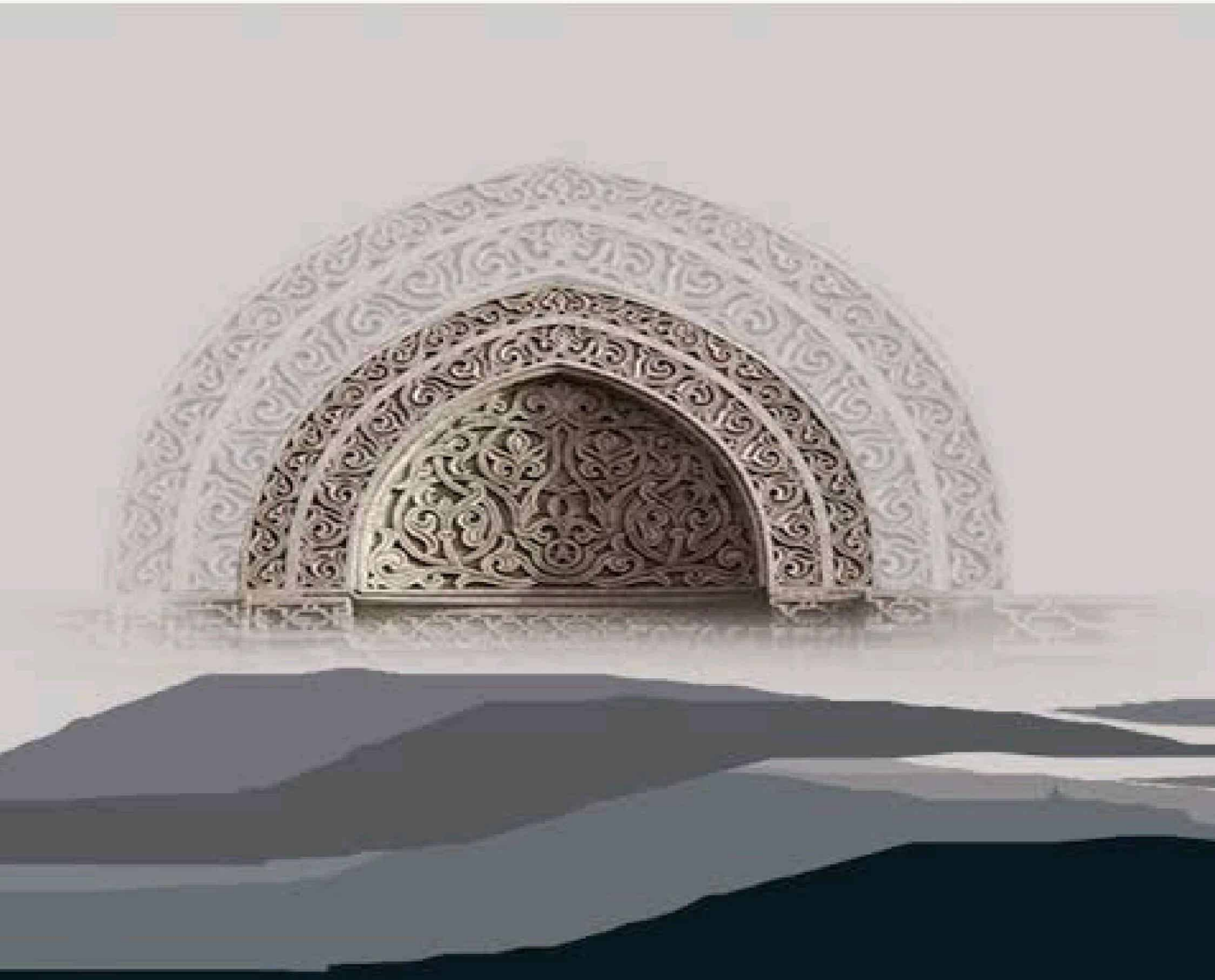

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নক্‌শবন্দী

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০১০

আত্তার পরিচর্যা

মূল ঃ হযরত মাওলানা যুলফিকার আলী সাহেব নাকশবন্দী, মুজাদ্দেদী মা. যি.
অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা এনামুল হক নূর, শিক্ষক জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
প্রকাশক ঃ প্রফেসর মুহাম্মদ নুরুল হক মিয়া। থানভী লাইব্রেরী, ৫৯ চকবাজার, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা। স্বত্ব ঃ প্রকাশক। কম্পিউটার কম্পোজ ঃ থানভী কম্পিউটার্স
হাদিয়া • ২৩০/- (দুইশত ত্রিশ) টাকা মাত্র

ATTAR PARICHARJA, HAJRAT MAULANA JULFIKAR ALI SAHEB NAKSHABANDI MUJADDEDI M. J.; Translator and Editor : Maulana Enamul Haque Nur, Teacher Jamea Rahmania Arabia; Publisher : Professor Muhammad Nurul Haque Miah, Thanvi Library, 59 Chawk Bazar, 50 Bangla Bazar, Dhaka; Proprietor : Publisher; Computer compose; Thanvi Computer, Hadia : 8 088

ইনতেসাব

ভাবতাম বড় হয়ে বাবা-মাকে
অনেক অনেক উপহার দিব
কিন্তু আমি পারিনি
আজ আব্বাজান ও আম্মাজান -এর
খেদমতে বিলম্বিত এ ক্ষুদ্র
উপহারটি পেশ করছি

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক দামাত বারাকাতুহুম -এর

বাণী ও দু'আ

আত্মার শুদ্ধি-অশুদ্ধির উপরই নির্ভর করে মানবজীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা। এ কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

'সফলতা লাভ করল যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল আর ব্যর্থ হল যে তার আত্মাকে কলুষিত করল।' আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মাবনদেহে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে সেটা শুদ্ধ হলে পূর্ণ মানুষ সুস্থ হয়, আর সেটা অশুদ্ধ হলে পূর্ণ মানুষ কলুষিত হয়, আর সেটা হল মানুষের আত্মা।'

আত্মার পরিশুদ্ধির এ অপরিহার্যতার কারণেই ইসলামের প্রাথমিকযুগ থেকে অদ্যাবধি আল্লাহওয়ালা-বুযুর্গানেদ্বীন এ পথে সাধনা চালিয়েছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। মানুষের আত্মার উৎকর্ষতা সাধনে তাদের চেষ্টার কোন অন্ত নেই। তাই তারা হলেন মানুষের আত্মার রোগের চিকিৎসক। বুযুর্গানেদ্বীনের বাতানো আত্মার রোগমুক্তির চিকিৎসাপত্র আত্মার সুস্থতাকামী মু'মিনদের জন্য মূল্যবান তোহফা।

সিলসিলায়ে নক্শবন্দিয়্যার বিশিষ্ট বুযুর্গ ও পীর হযরত মাওলানা যুলফিকার আলী নক্শবন্দী (দামাত বারাকাতুহুম) এর ইসলাহী বয়ান আল্লাহর পথের সাধকদের জন্য বিশেষ পাথেয়। তিনি এ সকল বয়ানের মাধ্যমে মানবাত্মার রোগ ও তার প্রতিকারের চমৎকার চমৎকার ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপন করেছেন। উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত মাওলানার বয়ান সংকলন 'দাওয়ায়ে দিল' এ বিষয়ে এক অনন্য গ্রন্থ। মুসলমান সমাজে এর বহুল প্রসার বিশেষ প্রয়োজন।

আমার প্রিয় দৌহিত্র নওজোয়ান আলিম, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (সাত মসজিদ) এর হাদীসের শিক্ষক মাওলানা এনামুল হক এ অমূল্য গ্রন্থখানির সরল বঙ্গানুবাদ করেছে, যা 'আত্মার পরিচর্যা' নামে পাঠকদের সামনে উপস্থিত। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি তিনি যেন এ মেহনতকে কবুল করে অনুবাদক ও সকল পাঠকবর্গ-কে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের তাওফীক দান করেন।

বান্দা

শাইখুল হাদীস আজিজুল হক

অনুবাদকের কথা

আত্মা ও দেহ নিয়ে মানুষ। মানুষের যেরূপ দৈহিক রোগ-ব্যাধি রয়েছে, তেমনি আছে আত্মিক রোগ-ব্যাধি। আত্মার তুলনায় দেহের মূল্য কতটুকু? আত্মা জড় দেহে প্রাণ সঞ্চার করে। আত্মাহীন দেহ একটি লাশ; মূল্যহীন বস্তু। আমরা এ দেহের অনেক ভয়ানক রোগের কথা জানি, আত্মার তুলনায় মূল্যহীন হওয়া সত্ত্বেও যদি দেহের এত মারাত্মক রোগ-ব্যাধি থাকে, তাহলে আত্মার রোগ-ব্যাধি কত মারাত্মক হবে? দৈহিক রোগ-ব্যাধি হল সর্দি-জ্বর, আমাশয়, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ইত্যাদি। আত্মার রোগ হল অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা, লোভ, প্রতিশোধ পরায়ণতা, মিথ্যাচার ইত্যাদি। দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্য আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করি, আত্মিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা গ্রহণও একটি অপরিহার্য বিষয়।

আম্বিয়ায়ে কেরামের নবুয়তের অন্যতম দায়িত্ব ছিল তার অনুসারীদেরকে আত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে পরিশুদ্ধ করা। কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারার ১২৯, আল-ইমরানের ১৬৪, আল-জুমআর ২নং আয়াতে এ দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা যে সব বিষয়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য শপথ করেছেন, তন্মধ্যে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য শপথ করেছেন সব চেয়ে বেশি। দেখুন ৯১ নং সূরা আশ-শামস; সাতবার শপথ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। আর যে তার প্রতি উদাসীন রয়েছে, সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি সবার দৃষ্টিতে এক নয়, এ কথা ঠিক কিন্তু সফলতার যে সংজ্ঞা স্বয়ং স্রষ্টা নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেটাই যে একমাত্র মাপকাঠি এতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মশুদ্ধি অর্জনকে চূড়ান্ত সফলতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় হচ্ছে দ্বীনের অন্য কোন শাখা এর মত উপেক্ষিত নয়। মুসলমানদের কোন স্তরেই আজ এর যথাযথ চর্চা নেই। পরিণামে মুসলিম উম্মাহ আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ইসলামপূর্ব যুগের বর্বরতা, অশ্লীলতা ও খোদাদ্রোহীতার ভিভীষিকাময় ছবি আমাদের সমাজ-রাষ্ট্রকে প্রতি নিয়ত হত বিহ্বল করে দিচ্ছে।

আত্মা হল চালক, বিস্ময়কর মানবদেহকে এ আত্মাই পরিচালিত করে। নেশাগ্রস্ত মাতাল চালক যেমন একাই ধ্বংস হয় না, গাড়ির আরোহীসহ আরো অনেককে ধ্বংস করে, তদ্রূপ কল্যাণের জন্য নিবেদিত মানুষ আত্মিক রোগ গ্রস্ত হলে কেমন ধ্বংসাত্বক হতে পারে, বিশ্বের বর্তমান ঘটনাবলী এর জলন্ত প্রমাণ।

বক্ষমান গ্রন্থটি মানুষের আত্মিক রোগ নিরাময় বা আত্মশুদ্ধি অর্জন বিষয়ক একটি অনবদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা আলিম ও বুযুর্গ হযরত মাওলানা জুলফিকার আলী নকশবন্দী (দামাত বারাকাতুহুম)। গ্রন্থটি মূলত উদু ভাষায় রচিত তাঁর বক্তৃতা-সংকলন। আমি ২০০৬ সালে হজের সফরে মদীনা শরীফ গেলে মদীনা নিবাসী আমার মুহতারামা শাশুড়ি আমাকে বইটি পড়তে দেন। বইটি পড়ে আমি পুলকিত হই। মনে হয় আত্মশুদ্ধি বিষয়ে এটি আমার দেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমার মুহতারামা বুযুর্গ শাশুড়ি বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। আমি হজ থেকে ফেরার সময় বইটি সাথে নিয়ে আসি।

দেশে ফিরে বিভিন্ন ঝামেলার ফাঁকে ফাঁকে অনুবাদের কাজ অব্যাহত রাখি। আল-হামদুলিল্লাহ, আব্বাজান, আম্মাজনের বিরামহীন দু'আ এবং জগৎ বিখ্যাত নানাজান হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক দা. বা. এর নেক দৃষ্টির বরকতে অনুবাদ কর্মটি সম্পন্য হয়ে এখন আত্মপ্রকাশের দার প্রান্তে। আল্লাহ তা'আলা আমার সকল মুরব্বিকে নেক হায়াত দান করুন, সুস্থতার সাথে এ ছায়াগুলিকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন।

আমি অনুবাদে একদম নবীন। এটি আমার প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। আমার বুযুর্গ মুহতারামা শাশুড়ির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে, তিনি অনুবাদের জন্য একটি সুন্দর বই আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। মদিনায় বসে আমার জন্য দু'আ করেছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আব্বাজান দা. বা. নানা অসুস্থতার মধ্যেও অনুবাদটি যেভাবে দেখে দিয়েছেন, সর্বক্ষণ আমাকে উৎসাহিতও করেছেন। আমি অধম এর যোগ্য কোন দিন ছিলাম না। আল্লাহ তা'আলা আব্বাজানকে সত্বর শিফায়ে কামিলা দান করুন। আব্বাজানের সব নেক মাকছাদগুলো পূর্ণ করুন। অধমকে আব্বাজান, আম্মাজান, নানাজান সহ সকল মুরব্বির আকাঙ্ক্ষা পূরণের তাওফীক দিন।

এ ছাড়াও বন্ধুবর মাওলানা কারামাত আলী এবং মাওলানা অসিউর রহমান আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা উত্তম জাযা দিন। অনুবাদে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। কেউ ভুলগুলো শুধরে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। প্রুফ রিডিং, কম্পোজ ও প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আল্লাহ তাআলা সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমরণ ইখলাছের সাথে দ্বীনের কাজে ব্যস্ত মগ্ন থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

মুহাম্মদ এনামুল হক নূর

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আত্মার পরিচর্যা করুন -১৭

কিয়ামতের দিন যা কাজে আসবে ১৯
অন্তর এক আজব বসতি ২০
অন্তর হল আল্লাহর আরশ ২০
আত্মশুদ্ধিতে বিলম্ব কেন? ২১
একটি আশ্চর্য নমুনা ২২
সকল অঙ্গ অন্তরের অনুসারী ২২
দেখতে ছোট আসলে বড় ২৩
একটি দৃষ্টান্ত ২৪
অন্তর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ২৪
অন্তর একটি অমূল্য সম্পদ ২৫
একটি আশ্চর্য উপমা ২৫
প্রিয়ের আলোচনা অন্তরকে অস্থির করে দিয়েছে ২৬
অন্তর বিনষ্ট হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত ২৮
ঘুম আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য ২৮
আত্মার ব্যধি ----------২৯
দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ২৯
অন্তর কঠিন হয় কখন? ৩০
অন্তর কিভাবে যিকিরে মগ্ন হবে? ৩২
একজন মুজাহিদের রাত্রি জাগরণ ৩২
তাহাজ্জুদের তাওফীক কি করে লাভ হবে? ৩৫

মুখলিছ এবং আমলদার আলিম হোন -৩৭

চিরস্থায়ী সম্মান লাভের উপায় ৩৯
হযরত আলী রা. এর সম্পদের উপর ইলমকে প্রাধান্য দেওয়া ৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুনিয়া হল দারুল আসবাব	৪০
হযরত আদম আ.কে ফিরিশতাদের সিজদা করা	৪০
হযরত দাউদ আ.	৪১
হযরত সুলাইমান আ.	৪১
হযরত ইউসুফ আ.	৪২
সাইয়্যিদিনা হযরত রাসূলে কারীম সা.	৪৩
ইলম কি?	৪৩
ইলম এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য	৪৪
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আল-কুরআনের অনুবাদ	৪৪
জ্ঞানের পর অজ্ঞতা	৪৫
ইলম অর্জনের জন্য বড়দের কুরবানী	৪৬
ইমাম মালিক র. এর সাথে ইমাম শাফী র. এর সাক্ষাৎ	৪৭
কন্যাদের অভিযোগ	৫১
দুনিয়াদারদের অভিযোগ	৫১
ইমাম শাফী র. এর উত্তর	৫২
ইখলাছের গুরুত্ব	৫৩
তারা কেমন ছিলেন? আর কেমন হলাম আমরা?	৫৪
একটি সূক্ষ্ম বিষয়	৫৪

মানবতার নামে আল্লাহর পয়গাম -৫৭

কুরআনে কারীম হল রহমতের চুম্বক	৫৯
কাফিররা গোপনে কুরআন শ্রবণ করত	৬০
কুরআন পাঠে স্বাদ অনুভব না হওয়ার কারণ	৬১
রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ	৬১
ক্রমাগত তীরবিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা	৬২
শাইখাইনের তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন পড়া	৬২
ফিরিশতাও আকাশ থেকে নেমে আসলেন	৬৩
তোমার কান্নায় ফিরিশতাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে	৬৩

বিষয় পৃষ্ঠা
তার মুখ থেকে সুগন্ধ ছড়ায় ৬৪
এমন কিছু বস্তু যা দ্বারা মন কখনো ভরে না ৬৫
রাখাল থেকে আমীরুল মু'মিনীন ৬৬

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব -৬৯

সাহচর্যের আছর ৭১
দৃষ্টি দ্বারা চিকিৎসা ৭২
তোমার চিকিৎসা দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে ৭১
তাছফিয়া ও তাযকিয়া এর মধ্যে পার্থক্য ৭২
তাযকিয়ার গুরুত্ব ৭৩
তাযকিয়ার পদ্ধতি দু'টি ৭৫
দুনিয়ার নিয়ম ৭৬
জান্নাতে যাওয়ার দু'টি পথ ৭৭
জাহান্নামীদের পোষাক ৮২
জাহান্নামীর খাবার ৮১
জাহান্নামীদের পানীয় ৮২
যাকাত না দেয়ার পরিণতি ৮২
বে-পর্দা মহিলাদের শাস্তি ৮৩
মুখ সংযত রাখুন ৮৩
অপকর্মকারীদের শাস্তি ৮৪
চিন্তার বিষয় ৮৫
উম্মুল মু'মিনীনদেরকে পর্দার আদেশ ৮৫
তওবায় বিলম্ব কেন? ৮৭
ক্ষমার এক আশ্চর্য ঘটনা ৮৮
আশ্চর্য অসিয়ত ৯২

দুনিয়া রং তামাশার জায়গা নয় -৯৫

দুনিয়া ভ্রমন স্থল নয় পরীক্ষার স্থল ৯৭
অস্থিরতা এবং পেরেশানীর মধ্যে পার্থক্য ৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুখ-দুঃখ কেন?	৯৮
উদ্ভূত পরিস্থিতি পরীক্ষা হওয়ার লক্ষণ	৯৮
এক বুজুর্গের ইলহাম	১০০
পরিস্থিতি শান্তি হওয়ার আলামত	১০১
[illegible]তে পাড় সৃষ্টিকারী একটি হাদীসে কুদসী	১০২
[illegible]আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বুঝার পদ্ধতি	১০৩
আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা	১০৩
বিপদাপদে মু'মিনের কর্মপন্থা	১০৪
যেদিকে মাওলা সোদকে গোটা দৌলত	১০৫
কষ্ট লাঘবের পরীক্ষিত আমল	১০৬
বিপদাপদ কেন আসে?	১০৭
নবী কারীম সা. এর দূরদর্শিতা	১০৭
যিকিরের প্রভাব -১০৯	
যিকির শব্দের ব্যাখ্যা	১১
আল্লাহ তা'আলার স্মরণ আশ্চর্য নেয়ামত	১১১
যিকিরের ফায়দা	১১২
যিকিরের গুরুত্ব	১১৩
যোগ্যতা ধীরে ধীরে তৈরী হয়	১১৫
যিকির না করার শাস্তি	১১৮
মনোযোগের সাথে উপস্থিতি	১১৯
অধিক যিকির কাকে বলে?	১২০
যিকিরের বরকত	১২০
ইলম এবং ইস্তেহযারের মধ্যে পার্থক্য	১২২
মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব	১২৩
নবী-রাসূলদের বিভিন্ন অবস্থা	১২৪
যিকিরের প্রকার	১২৮
যিকরে ক্বলবী কাকে বলে?	১২৮

ahmohsin7

বিষয় পৃষ্ঠা
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. ১২৯
যিকরে কুলবীর পদ্ধতি ১৩১
যিকরে কুলবীর একটি উপমা ১৩৩

কুরআনের স্বাদ -১৩৫

কুরআন যাকে সম্মানিত করেছে ১৩৮
অন্তর এ স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ১৩৮
আল্লাহ তা'আলা যে সাহাবীর তিলাওয়াত শুনার আগ্রহ করেছেন ১৪০
তোমার কান্না ফিরিশতাকেও কাঁদিয়েছে ১৪০
কুরআন শ্রবণে নাস্তিকের কান্না ১৪১
কুরআন মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে ১৪৩
কি করে আমীরুল মু'মিনীন হলেন? ১৪৩
পৃথিবীর সর্বশেষ রাষ্ট্র ১৪৬

গুনাহগার বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল প্রভুর ভালবাসা -১৪৯

গুনাহের পরিচয় ১৫১
একজন বুজুর্গের ইলহাম ১৫২
গুনাহের কারণ ১৫২
গুনাহের চার সাক্ষী ১৫৪
গুনাহের আগ্রহ এবং শাস্তির ভয় ১৫৬
গুনাহের মধ্যে অস্থিরতা রয়েছে ১৫৯
গুনাহের দ্বারা দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হয় ---------- ১৫৯
গুনাহের পরিণতি ১৬০
এক স্বর্ণকারের স্ত্রীর ঘটনা ১৬১
আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন ১৬১
তওবা কাকে বলে? ১৬২
তওবা ও ইস্তিগফারের মধ্যে পার্থক্য ১৬২
আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি কাদের উপর? ১৬২
আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা ১৬৩

@gamii.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাত নামানোর আগেই ক্ষমা	১৬৪
মূল্যবান দু'টি ফোটা	১৬৫
আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া	১৬৭
একটি ঘটনা	১৬৭

পরকাল ভাবনা -১৬৯

মানুষের জীবন প্রদীপের ন্যায়	১৭৩
দুনিয়া হল অস্থায়ী নিবাস	১৭৪
দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান	১৭৪
জান্নাত হল মু'মিনের ঘর	১৭৬
এক আল্লাহ ওয়ালার প্রিয় উক্তি	১৭৬
মৃত্যু নিশ্চিত কাফন-দাফন নিশ্চিত নয়	১৭৭
একটি উপমা	১৭৮
হযরত সুলাইমান আ. এর মর্যাদা	১৮০
আমরা মৃত্যু থেকে কেন উদাসীন?	১৮০
তারা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য লোক রাখতেন	১৮১
মৃত্যুর পয়গাম	১৮১
মৃত্যু অবধারিত বাস্তবতা	১৮২
ঘর থেকে যায় ঘরের বাসিন্দা চলে যায়	১৮৫
কম্পন সৃষ্টিকারী কথা	১৮৭
মৃত্যুর স্মরণ	১৮৭
সাহাবীর জানাযায় ফিরিশতাদের ভীড়	১৮৯
মু'মিনের মৃত্যুতে আসমান-জমিন কাঁদে	১৮৮
ফিরিশতাদের সাদর সম্ভাষণ	১৮৯

পুরুষের জীবন গঠন ও উন্নতি সাধনে নারীর অবদান -১৯১

প্রকৃত বান্দা কে?	১৯৩
নারী-পুরুষের জন্য আল্লাহর নৈকট্য	১৯৩
ইলম অর্জনের আদেশ উভয়ের জন্য	১৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সফল পুরুষের পিছনে নারীর ভূমিকা	১৯৪
পুরুষদের আগে মহিলা	২০৯
কন্যা-জননীর কথোপকথন	২১০
অনেক সুন্দর প্রশ্ন	২১৩
ইলম অর্জনে নারীদের আগ্রহ	২১৪
সাহাবাদের যুগে মহিলাদের ইলমের মান	২১৪
এক বৃদ্ধার হুমকি	২১৫
কুরআনে আয়াত দ্বারা যে মহিলা কথা বলতেন	২১৬
কুরআন সংরক্ষণে নারীর অবদান	২১৮
আল্লাহর মা'রিফাত এবং নারী	২১৯
দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতিযোগিতা	২১৯
শিক্ষার্থীরা আল্লাহর প্রিয় হয়ে থাকেন	২২১
নেককার হওয়ার পথ -২২৫	
আত্মসংশোধন কাকে বলে?	২২৭
তারবিয়াত কোথায় হয়?	২২৭
বুজুর্গরা মানুষকে মুক্তা বানিয়ে দেন	২২৮
জিজ্ঞাসাবাদের নাম হল তারবিয়াত	২২৯
তারবিয়াতের আদেশ	২৩১
নবীজী সা. এর তারবিয়াতের মমতামাখা পদ্ধতি	২৩১
শুধু ইলম অহংকার জন্ম দেয়	২৩২
শুধু যিকিরের পরিণাম	২৩৩
ইলম ও যিকির এক সাথে	২৩৩
বে-আমল আলিমের উদাহরণ	২৩৩
সোহবত দ্বারা সাহাবী হয়েছেন	২৩৪
একটি উদাহরণ	২৩৫
সোহবতের তাছীর	২৩৫
সোহবত অবলম্বন করার আদেশ	২৩৬
মহব্বতের মর্ম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন	২৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মরণীয় কথা	২৩৯
দেওবন্দী উলামাদের মর্যাদা	২৪০
হযরত গাঙ্গুহী র. এর ঘটনা	২৪০

আল্লাহর ভয় -২৪৭

আশা এবং ভয়	২৪৯
ভয় এবং বিষন্নতার মধ্যে পার্থক্য	২৪৯
আশা এবং ভয় আল্লাহর নেয়ামত	২৫০
সব কিছুর উপর আল্লাহর আদেশ	২৫০
তাকওয়ার সংজ্ঞা	২৫২
অমুখাপেক্ষী সত্ত্বা আল্লাহ	২৫২
আল্লাহর ইচ্ছা-ই সর্বদা পূর্ণ হয়	২৫৩
ভয়- এর তিন স্তর	২৫৪
আবদুল্লাহ উন্দুলুসী র. এর ঘটনা	২৫৭
ওজব এর চিকিৎসায় দু'টি আয়াত	২৫৮
আল্লাহর হাবীব সা. এর ভয়	২৬০
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর ভয়	২৬০
হযরত উমর ফারুক রা. এর ভয়	২৬১
আল্লাহর ভয়ের চুড়ান্ত নমুনা	২৬২
হযরত হাসান বসরী র. এর ভয়	২৬৩
হযরত রাবেয়া বছরিয়্যা র. এর কান্না	২৬৩
সরবত পান করার সময় আল্লাহর ভয়	২৬৪
হাদীসের পাঠ দানের সময় আল্লাহর ভয়	২৬৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর ভয়	২৬৫
সৃষ্টি জীব মাত্রই আল্লাহকে ভয় করে	২৬৫
আল্লাহ তা'আলা বড়ই আত্ম মর্যাদাশালী	২৬৬
নামায হল সব ইবাদতের সমষ্টি	২৬৮
উটের খোদাভীতির আশ্চর্য ঘটনা	২৬৯
হযরত রাবেয়া বসরী র. এর আশ্চর্য দু'আ	২৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

গোলাপ বেলি হাসনাহেনার মালা গেঁথেছি
ধন্য আমায় কর গো প্রভু দু'হাত মেলেছি

بسم الله الرحمن الرحيم

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْم

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হবে, একমাত্র এমন হৃদয়-ই সেদিন কাজে আসবে।'

আত্মার পরিচর্যা করুন

মুখের দাগে বিচলিত তুমি
দেখ আয়না বারে বার
আত্মার কোন খবর রাখ কি
সে যে কুৎসিত কদাকার।
ইহ-জীবনেই বিভোর তুমি
নেই মরণের খবর
তুমি যে ভাই নামে মুসলিম
কাজে ইবলিসের দোসর।
মিনারে মিনারে তাকবীর ধ্বনি
যায় শোনা যায় আজো
হৃদয় রাজ্যে কাঁপন ধরানো
নাই সে ধ্বনির খোঁজও।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى،

أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنٌ اِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ فِيْ جَسَدِ كُلِّ بَنِيْ آدَمَ لَمُضْغَةً اَذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

কিয়ামতের দিন যা কাজে আসবে

কুরআনে কারীমের যে আয়াত তিলাওয়াত করা হল, তাতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন ধন-সম্পদও কোন কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও কোন কাজে আসবে না। তবে

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হবে, একমাত্র এমন হৃদয়-ই সেদিন কাজে আসবে।'

এ আয়াতে দু'টি বস্তুকে নাকচ করা হয়েছে : এক. সম্পদ, দুই. স্বজন। দুনিয়াতে সাধারণত মানুষ এ দু'টি বস্তু দ্বারাই প্রতারিত হয়। মানুষ মনে করে টাকা থাকলে সব কিছুই হয়। এমনকি বাঘের চোখও কেনা যায়। অথচ ধারণাটি সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ টাকা দিয়ে মানুষের কিছু সাধ মিটলেও সব সাধ কিন্তু মিটে না।

একটু লক্ষ্য করুন, টাকা খরচ করে মানুষ উন্নত পোষাক তো কিনতে পারে, সৌন্দর্য কিনতে পারে না। টাকা ব্যয় করে নরম বিছানা ক্রয় করা যায় সুখনিদ্রা ক্রয় করা যায় না। টাকার জোরে উন্নত চিকিৎসা করা গেলেও সুস্থতা নিশ্চিত করা যায় না। টাকা ঢেলে সাদা চুল কালো করা সম্ভব, কিন্তু যৌবন ফিরানো সম্ভব নয়।

বুঝা গেল দুনিয়াতেও সব কাজ টাকা দ্বারা সম্পাদিত হয় না। আর পরকালে তো টাকা কোন কাজেই আসবে না। কোন জিনিস কাজে আসবে?

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

'যে ব্যক্তি পরিমার্জিত অন্তর নিয়ে আসবে'

এমন অন্তর যেখানে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ব্যতীত অন্য কারো মহব্বতের চিহ্নও নেই, হ্যাঁ একমাত্র এমন অন্তরই সেদিন কাজে আসবে। মনে রাখবেন দুনিয়ার মহব্বত দ্বারা হৃদয় অন্ধকার হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা হৃদয়রাজ্য আলোকিত হয়ে উঠে।

মানুষ যখনই কোন গুনাহ করে, প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে যথাযথ তওবা করে তাহলে দাগটি মুছে যায়। অন্যথায় গুনাহের দাগে দাগে এক সময় অন্তর সম্পূর্ণরূপে কালো হয়ে যায়।

অন্তর এক আজব বসতি

আত্মশুদ্ধির সাধনা যখন মানুষ আরম্ভ করে, তখন সে অনুধাবন করে যে, এখানে কত জঞ্জাল পড়ে আছে; আত্মার সংশোধন তো কোন সহজ বিষয় নয়। সুদীর্ঘ সাধনার পর এ আত্মা সংশোধিত হয়।

ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے ÷ جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے

دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا کھیل نہیں بھائی ÷ بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے

দেখেছি আমি অনেক কিছুই
দেখেছি ভাঙ্গা গড়া
দিল হল ভাই আজব নগর
ভাংলে তো আর যায় না জোড়া।
ভেঙ্গে চুরে যায় নিমিষেই
যত্নে গড়া বসত্,
গড়তে যে হায় ঘাম ঝরে যায়
দিন কেটে যায় শতত।

বসতি স্থাপন যেমন সহজ নয়, দীর্ঘ সাধনার পর একটি শহর আবাদ হয়, মুখরিত হয়। তদ্রূপ জীবন ক্ষয় হয়ে যায়, তারপর একটি আত্মা আবাদ হয়। আত্মা নষ্ট হতে সময় লাগে না, কিন্তু গড়তে হয় কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে।

مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم ÷ تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا

এই ভেবে উদাস ছিলাম কোন যখম হয়ত আছে
এখন দেখি যখম তো নয় মরণ একদম কাছে।

যখন কোন আল্লাহ ওয়ালার তত্ত্বাবধানে আত্মা মেরামত করবেন, তখন অনুধাবন করতে পারবেন কোথায় কোথায় ক্ষত রয়েছে।

অন্তর হল আল্লাহর আরশ

আবদুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দার হৃদয় হল আরশুল্লাহ তথা আল্লাহর আরশ। দেখুন বাইতুল্লাহ শরীফকে আমরা আল্লাহর ঘর কেন বলি? (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা কি সেখানে থাকেন? না। বরং এ জন্যই বলি যে, সেখানে আল্লাহ তা'আলার যাতি নূরের তাজাল্লী হতে থাকে।

তদ্রূপ মু'মিন যখন তার হৃদয়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, তখন তার হৃদয়েও আল্লাহ তা'আলার যাতি নূরের তাজাল্লী হয়।
অতএব মু'মিনের হৃদয়ও আল্লাহর ঘর।

دل بدست آور کہ حج اکبر است ÷ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

کعبہ بنیادے خلیل آزر است ÷ دل گذرگاہے جلیل اکبر است

ভগ্ন হৃদয়ের যত্ন নেয়া
আকবরি হজ্ব বটে
কাবার চেয়েও হৃদয় বড়
আরো যা আছে এই তটে।
কাবা হল আযর তনয়
ইবরাহীমের গড়া
হৃদয় হল মহানপ্রভু
আল্লাহ তা'আলার পাড়া।

আত্মশুদ্ধিতে বিলম্ব কেন?

আমাদের ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক এটা আমরা সকলেই চাই। ঘরের কোথাও সামান্য আবর্জনা দেখলেই মহিলাদের বকা-ঝকা করি। ঘর কেন পরিষ্কার করা হয়নি। গৃহের পরিচ্ছন্নতাকামিরা একটু ভেবে দেখুন! আত্মাও তো আল্লাহর ঘর। এ ঘরটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। আফসোস! গুনাহের ময়লা-আবর্জনায় এ ঘরটি একেবারে ডাষ্টবিন হয়ে রয়েছে অথচ ঘরের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও চান, তার এ ঘরটি যেন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি থাকে।
একটু ভেবে দেখুন! কেউ যদি আপনাকে একটি ময়লামাখা পাত্র দিয়ে বলে, এতে দুধ দিন। আপনি কি দিবেন? বরং আপনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলবেন, এমন পাত্রেও কি দুধ দেওয়া যায়?
সুতরাং দুর্গন্ধ পাত্রে যেমন দুধ দেয়া কেউ পছন্দ করে না। আল্লাহ তা'আলাও ময়লা-কলুষিত অন্তরে স্বীয় মহব্বত দেয়া পছন্দ করেন না। তিনিও চান তার ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হোক। ঘষা-মাজা করা হোক। গুনাহের কালিমা ধুয়ে মুছে আয়নার মত ঝকঝকে করা হোক হৃদয় যখন আয়নার মত স্বচ্ছ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর রহমতের বারিধারা আপনা আপনিই বর্ষিত হবে।

হযরত আশরাফ আলী থানভী র. এর বিখ্যাত খলীফা খাজা আজীজুল হাসান মাজযূব র. একটি শ্লোক বলেছিলেন। শ্লোকটি যদিও সাদা মাটা ছিল, কিন্তু হযরত থানভী র. এমন পছন্দ করেছিলেন যে, ঐ যুগে তিনি বলেছিলেন, আজ আমি যদি সামর্থবান হতাম, তাহলে এ শ্লোকটির জন্য তাকে এক লক্ষ রুপি পুরষ্কার দিতাম। শ্লোকটি ছিল-

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ÷ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی

হৃদয়ের সব কামনা-বাসনা
পালিয়েছে আজ দূরে,
এসো হে মহান! রহমান, সুবহান
আমার অন্ত:পুরে।

সত্যিই মানুষ যখন সকল প্রকার লোভ-লালসা কামনা-বাসনা অন্তর থেকে বিদায় করে দেয়, তখন অন্তর জুড়ে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের প্লাবন বয়ে যায়।

একটি আশ্চর্য নমুনা

একটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করুন। মাসআলা হল, যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে আল্লাহ তা'আলার রহমতের ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না। অতএব যে অন্তরে কারো ছবি অংকিত রয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি করে ঐ অন্তরে আগমন করবেন? যেখানে রহমতের ফিরিশতাই আসেন না, সেখানে রহমত বর্ষণকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত কি করে আসবে?

এ যুগের যুবকদের অন্তর জুড়ে তো ছবির স্তূপ জমে আছে, চলার পথে যার উপরই চোখ পড়ে, তার ছবিই অন্তরে গেঁথে যায়। আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের স্বাদ কিভাবে অনুভূত হবে। এ জন্যই এমন অন্তরের পিছনে অত্যধিক পরিশ্রম করা প্রয়োজন।

সকল অঙ্গ অন্তরের অনুসারী

মানুষের শরীরে যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, সবই এ অন্তরের অধীন। দেখবেন কোন ব্যক্তি যদি আপনার প্রতি রুষ্ট থাকে, তাহলে সে আপনার দিকে তাকাবেও না। আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই আমার দিকে তাকান না কেন? সে বলবে, আমার মনে চায় না। লক্ষ্য করুন দেখা তো চোখের কাজ, কিন্তু বলছে কি? মনে চায় না। বাচ্চা খাবার খাচ্ছে না এখন

মা তাকে বলছে, বাবা খাচ্ছ না কেন? সে বলে, আমার মনে চায় না। এখানেও খাওয়া মুখের কাজ, পেটের চাহিদা, কিন্তু বলছে, মনে চায় না। ভাই! আপনি আমার কথা কেন শুনছেন না? আরে ভাই আমার মনে চায় না। শ্রবণ করা কানের কাজ, কিন্তু এখানেও সিদ্ধান্ত অন্তরের।

বুঝা গেল চোখ, কান, মুখ তথা শরীরের প্রতিটি অঙ্গই অন্তরের অনুগত। অন্তরের ইচ্ছা অনিচ্ছা-ই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত হয়, বাস্তবায়িত হয়। এ জন্যই অন্তর ঠিক, তো সব ঠিক। অন্তর নষ্ট, তো সবই নষ্ট।

دل کی بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی ÷ اور جس نے اسے سنوار دیا وہ سنور گیا

নষ্ট হৃদয়ের ভ্রষ্ট মানুষ আসল মানুষ নয়
সুস্থ হৃদয়ের শুদ্ধ মানুষ আসল মানুষ হয়।

দেখতে ছোট আসলে বড়

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের এ অন্তর অনেক দামী। দেখুন সিন্দুকের মূল্য তার মধ্যে রক্ষিত বস্তুর মূল্যের উপর নির্ভরশীল। আমাদের বাসা-বাড়িতে কিছু সিন্দুক আছে যার মধ্যে লেপ-চাদর এবং বিভিন্ন প্রকার শীতবস্ত্র মহিলারা গরমকালে রেখে থাকেন। সাধারণত এ সব সিন্দুকে তালা দেয়া হয় না, কিন্তু একটি ছোট বাক্স এমন আছে, যাকে জুয়েলারী বক্স বলে। এর মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈরি অলংকার রাখা হয়। এ বাক্সটি তালা দিয়ে অনেক যত্ন সহকারে নিরাপদ কোন স্থানে রাখা হয়। কখনো বাইরে গেলে সর্বশেষ এ বাক্সটির উপর চোখ বুলিয়ে যাই। ফিরে এসে সর্বপ্রথম এ বাক্সটি-ই খোঁজ করি।

ঘরে আগুন লেগেছে এমন ভয়ানক সংবাদে মানুষ যখন প্রাণ নিয়ে ছুটে, তখনও এ ছোট্ট বাক্সটির কথা কেউ ভুলে না। বুঝা গেল, অলংকারের এ বাক্সটি ছোট হলেও অনেক দামী। মানুষের অন্তরও ঠিক এমন।

বাস্তবে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু মহা মূল্যবান। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত এবং নূর গচ্ছিত থাকে। আর এ কারণেই অন্তর আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকট এমন অন্তরই চাইবেন। ইরশাদ হয়েছে-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

'কিয়ামতের দিন ধন-সম্পদও কোন কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও কোন কাজে আসবে না। কাজে আসবে শুধু পরিচ্ছন্ন-পরিমার্জিত আত্মা'।

একটি দৃষ্টান্ত

আপনি বাজারে গেলেন, আপেল কিনবেন, একশত টাকা কেজি আপেল। একটি দাগি আপেলও যদি আপনাকে দেয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফিরিয়ে দিবেন এবং ঝাঁঝের সাথে বলবেন, মিয়া! পয়সা দিয়ে আপেল কিনছি। দাগিটা নিব কেন? আমরা টাকার বদলে দাগি আপেল নিতে চাই না। আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী জান্নাত এবং স্বীয় সন্তুষ্টির বিনিময়ে দাগি অন্তর কেন নিবেন? তিনিও চান তার বান্দার অন্তর যেন দাগহীন হয়।

গুনাহের দাগ অথবা অন্য কোন দাগ যেন এর মধ্যে না থাকে। এমন নিষ্কলুষ অন্তরকেই قَلْبٍ سَلِيْم (কলবে সালীম) বলে। এমন অন্তরই আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ.

'আল্লাহ তা'আলা কারো বক্ষে দু'টি অন্তর সৃষ্টি করেননি'

যে, একটি মানুষের জন্য হবে, অপরটি আল্লাহর জন্য হবে। বরং অন্তরও একটিই এবং এর মালিকও একজন।

অন্তর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি

আল্লাহ তা'আলা হলেন দিলের ব্যাপারী। তিনি আমাদের কাছে দিল চান যে, আমাকে দিল দাও। এ প্রসঙ্গে একটি সূক্ষ্ম বিষয় এইমাত্র আমার নিকট স্পষ্ট হল যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন'।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ঘর যেহেতু মু'মিনের দিল, 'তাই জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল ক্রয় করেছি না বলে দিল ক্রয় করেছি' বললে মনে হয় বেশী ভাল হত। উলামায়ে কিরাম এর উত্তরে বলেছেন, এখানে জান-মালের কথা বলা হয়েছে, দিলের কথা বলা হয়নি। এর তাৎপর্য হল এই যে, মু'মিনের অন্তরকে তো আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য ওয়াক্‌ফ-ই করে নিয়েছেন। আর ওয়াকফের সম্পত্তি তো বেচা-কেনা হয় না। এখন থাকে শুধু জান আর মাল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্ম হল আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে এ দু'টি বস্তুকেও ক্রয় করে নিয়েছেন।

অতএব অন্তর হল ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি। এটি আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে গেছে। যেমন কেউ বলল, আমি এ সম্পত্তিটি মসজিদের জন্য দিয়ে দিলাম। এর দ্বারা যেমন ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়, তদ্রূপ মানুষের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণের জন্য ওয়াকফ করে দেয়া হয়েছে, এখানে যদি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থাকে, যিকির থাকে, তাহলে এ অন্তর অনেক দামী, অনেক মূল্যবান।

অন্তর একটি অমূল্য সম্পদ

একবার শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. দিল্লীর জামে মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, মোগল সম্রাটরা শুন! তোমাদের ধন-দৌলতের অনেক তা'রীফ আমি শুনেছি। কিন্তু ওলী উল্লাহর বক্ষে এমন একটি অন্তর রয়েছে, তোমাদের যাবতীয় ধন-ভান্ডার একত্রিত করেও যার মূল্য আদায় করতে সক্ষম হবে না। একটু ভেবে দেখুন! ঐ অন্তর কতই না মূল্যবান ছিল। সুতরাং অন্তরকে মূল্যবান করার জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। সাধনার দ্বারা অন্তরকে সাজাতে হবে। তৈরী করতে হবে। অন্তরের সব অনাকাঙ্খিত কামনা-বাসনাকে পদদলিত করে আমরণ সংগ্রাম আর সাধনা দ্বারা এ অন্তরকে তিলে তিলে গড়তে হবে। আর অন্তর গড়ার পদ্ধতি হল, আল্লাহ ওয়ালাদের কাছ থেকে শিখে যিকির করা। অধিক পরিমাণে যিকির করার দ্বারা অন্তর সুসজ্জিত হয়ে যায়।

একটি আশ্চর্য উপমা

কুরআনে কারীমে একটি আয়াত রয়েছে। ঐ আয়াতে কারিমার আলোচনায় হযরত থানভী র. একটি আশ্চর্য উপমা উপস্থাপন করেছেন।

হযরত থানভী র. বলেন, সূরা নামলের নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً.

'রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে'। -নামল

অর্থাৎ রাণী বিলকিস সভাসদবৃন্দের নিকট পরামর্শ চাইলে তারা বলল, আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সাথে আছি। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিন, অথবা যে কোন সিদ্ধান্ত নিন, আমরা আপনার সাথে আছি, থাকব। তখন, রাণী বিলকিস যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, বললেন-

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً

অর্থাৎ 'রাজা-বাদশারা যখন কোন শহরে প্রবেশ করে, তখন'

اَفْسَدُوْهَا

'তা তছনছ করে দেয়।'

وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

'এবং ঐ শহরের সম্মানিত লোকদেরকে অপদস্থ করে বের করে দেয়।'

এতো হল আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। কিন্তু হযরত থানভী র. বলেন, এটা হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর একটি উপমা। তিনি বলেন, যদি এখানে اَلْمُلُوْكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলা এবং قَرْيَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হয় অন্তর্জগত। তখন আয়াতটির অর্থ হবে-

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً

'যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাম অন্তর্জগতে প্রবেশ করে,'

اَفْسَدُوْهَا

'তখন বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়।'

وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

'এবং দুনিয়া যা অন্তর জুড়ে মর্যাদার আসন দখল করে রেখেছিল, তাকে অপদস্থ করে অন্তর থেকে বের করে দেয়।'

অতএব বন্ধুরা আমার! আল্লাহ তা'আলার যিকিরের মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে। এর বদৌলতে দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে বিতাড়িত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দ্বারা দিল আলোকিত হয়ে যায়। অন্তর যখন পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়, আল্লাহর মহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তখন মানুষের অবস্থা এক অসাধারণ রূপ লাভ করে।

প্রিয়ের আলোচনা অন্তরকে অস্থির করে দিয়েছে

একবার হযরত ইবরাহীম আ. বকরীর পাল নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন- হঠাৎ দেখলেন এক পথচারী পাশ দিয়ে যাচ্ছে, আর গুন গুন করে এ তাসবীহটি পড়ছে-

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ
وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ.

এমন সুন্দর শব্দমালায় আল্লাহ তা'আলার গুণগান শুনে হযরত ইবরাহীম আ. এর অন্তর নেচে উঠল। তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন। ব্যাকুল মনে কামনা করলেন-

ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی

তোমার বন্দনা প্রভু, চলুক অবিরাম।

ইবরাহীম আ. : আকুতি ভরা কণ্ঠে আরজ করলেন, প্রাণের ভাই আমার! আরেকটি বার গাওনা ঐ সুমধুর গান!

পথচারী : আচ্ছা ঠিক আছে, গাব। তবে বিনিময়ে আমাকে কি দিবে?

ইবরাহীম আ. : এই যে, বকরীর পাল দেখছ, এর অর্ধেকটা তোমাকে দিয়ে দিব। তুমি আরেকটি বার ঐ তাসবীহ খানা আমাকে শুনাও।

পথচারী ঐ তাসবীহ খানা আবার শুনালেন।

হযরত ইবরাহীম আ. এর কাছে মনে হল, জগতের সব মধু, সব রস যেন তার কর্ণে ঢেলে দেয়া হয়েছে।

ইবরাহীম আ. : তাসবীহটি আরেকবার শুনাও।

পথচারী : এবার কি দিবে?

ইবরাহীম আ. : অবশিষ্ট সব বকরী তোমায় দিয়ে দিব।

পথচারী : তাসবীহ খানা আবার শুনালেন।

হযরত ইবরাহীম আ. এর মন ভরল না। বরং ব্যাকুলতা যেন আরো বেড়ে গেল। তাসবীহটি শুনার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল।

ইবরাহীম আ. : আরেকটা বার শুনাও না ভাই আমার!

পথচারী : এখন আপনার কাছে আমাকে দেয়ার মত আর কি আছে?

ইবরাহীম আ. : ভাই! বকরীগুলো চরাবার জন্য তোমার তো একজন রাখালের প্রয়োজন, তুমি তাসবীহটি আরেকবার শুনাও। আমি তোমার রাখাল হয়ে যাব।

এ কথা শুনামাত্র পথচারী বলে উঠল, ওহে আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম! মোবারক হোক, আমি তো একজন ফিরিশতা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, বলেছেন, যাও। আমার বন্ধু ইবরাহীমের সম্মুখে আমার নাম উচ্চারণ কর, দেখ, আমার নামের মূল্য তিনি কি নির্ধারণ করেন?

অতএব অন্তর যখন পরিশুদ্ধ হয়, তখন বান্দা আল্লাহ তা'আলার নামের উপর নিজের জীবনও উৎসর্গ করে দেয়।

جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی ÷ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا

বিলিয়ে দিয়েছি জীবন তাকে
জীবন তো তারই দান,
হয়নি শোকর আদায় যে তাই
কাঁদে আমার প্রাণ।

আল্লাহওয়ালারা প্রাণ তো উৎসর্গ করেনই, আবার এটাকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ মনে করেন। অতএব এই অন্তর গড়লে গড়ে, আর বিনষ্ট করলে বিনষ্ট হয়। আমাদের এ অন্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস।

অন্তর বিনষ্ট হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত

অন্তর বিনষ্ট হওয়া খুবই সহজ। যেমন দেখুন, প্রত্যেক ঘরেই জানালা থাকে। এখন এই জানালা যদি সব সময় খোলা রাখা হয়, তাহলে ঘর ধুলা-বালিতে ভরে যায়। তদ্রূপ চোখ হল অন্তরের জানালা। এ চোখও যদি সর্বদা খোলাই থাকে, তাহলে এ অন্তরও ধুলা-মলিন হয়ে যাবে। এখনকার যুবকদের মনের এ জানালা তো কখনো বন্ধই হয় না। তারা অপাত্রে দৃষ্টি ফেলে, পরিণামে অন্তর বিগড়ে যায়। লেখা-পড়ায় মন বসে না, স্মরণ শক্তি কমে যায়। যা পড়ে কিছুই মনে থাকে না। সম্মুখে বইয়ের পাতা খোলা থাকলেও মন হারিয়ে যায় অন্য কোথাও। হাজার চেষ্টার পরও তার চোখের সামনে বইয়ের পৃষ্ঠার বদলে ভেসে উঠে কারো ছবি, কারো অবয়ব। কারণ অন্তর তো নষ্ট হয়ে গেছে।

ঘুম আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী র. এর কাছে এসে বলল।

: হযরত! আমার অন্তর মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

হযরত : তা কিভাবে?

আগন্তুক : হযরত! আপনি তা'লীম করেন, ওয়াজ নসীহত করেন, কিন্তু আমার অন্তরে এসবের কোন প্রতিক্রিয়া-ই আমি লক্ষ্য করি না।

হযরত : আচ্ছা! ঘটনা যদি এমনই হয়, তাহলে শুন! তোমার অন্তর ঘুমিয়ে নয়; বরং মরে গেছে।

আগন্তুক : অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, হযরত! অন্তর আবার মরে কিভাবে?

হযরত : দেখ! যে লোকটি সত্যিই ঘুমিয়ে আছে তাকে নাড়া দাও, সে জেগে

উঠবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নাড়লেও উঠে না, সে ঘুমন্ত নয়; বরং মৃত।
সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস শ্রবণ করল। এতদসত্ত্বেও অন্তরের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া অনুভব করল না। নি:সন্দেহে এটি অন্তর মরে যাওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ। তাই আসুন, এ রুগ্ন অন্তরকে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই সুস্থ করে নেই।

আত্মার ব্যধি

দেহের যেমন অনেক রোগ, আত্মার রোগও তেমনই অনেক। ডায়বেটিস, হাইপ্রেসার, মেলেরিয়া ইত্যাদি যেমন দৈহিক রোগ, তদ্রূপ হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, ক্রোধ ইত্যাদি হল আত্মার রোগ। আত্মার রোগ সর্বদা জটিল এবং ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে।
নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আমরা সকলেই আত্মার রোগী। এখন এ রোগ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? উপায় হল এর জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে সময় কাটাতে হবে। যারা অন্তরের চিকিৎসক তাদের সান্নিধ্যে বসার দ্বারা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত জন্ম নেয়। তাদের সোহবতের বরকতে আত্মা পরিচ্ছন্ন হয়, জীবন লাভ করে। দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন লোকেরাও আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করার দ্বারা অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করে। আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও ভালবাসায় তাদের হৃদয়ও উতালা হয়ে ওঠে।

দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি

দেখুন, একটি হল চর্মচোখের দৃষ্টি (بصارت), আরেকটি হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি (بصیرت)। আমাদের দৃষ্টিশক্তি তো আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নেই। কুরআনে কারীমে নূহ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ.

তারা অন্ধ ছিল। প্রশ্ন হল, তাদের কি দৃষ্টিশক্তি ছিল না? হ্যাঁ ছিল, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। এক হাজার বছর পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা হয়, তবুও তারা সত্যকে অনুধাবন করেনি। তাই ইরশাদ হয়েছে- তারা অন্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলার নিকট অন্ধত্ব হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টির অন্ধত্ব।

আরো ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا.

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী সম্পর্কে অন্ধ, কিয়ামত দিবসেও সে অন্ধ হবে।' -বনী ইসরাঈল ৭২।

এক আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে-

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ أٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ.

'তারা এ উদ্দেশ্যে কেন পৃথিবী ভ্রমণ করে না যেন তারা সমঝদার অন্তর এবং শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে, বস্তুত: চক্ষু তো অন্ধ হয় না।'

وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ.

'কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।'

বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার নিকট অন্ধত্ব হল, অন্তর্দৃষ্টির অন্ধত্ব, চর্ম চোখের অন্ধত্ব নয়। অতএব এ অন্তরকে শুদ্ধ করা, দৃষ্টিসম্পন্ন করা প্রয়োজন।

অন্তর কঠিন হয় কখন?

অন্তর যখন পরিশুদ্ধ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দ্বারা ভরপুর হয়ে যায় এবং অন্তরের অবস্থা তখন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو ÷ دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو

دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا ÷ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو

হৃদয়টাকে মোর কর হে খোদা!
তোমার প্রেমের আবাস,
থাকে যেন সদা মোর দেহ মন জুড়ে
তোমার দয়ার সুবাস।
তোমার প্রেমেই থাকি যেন মজে
প্রতি দিন প্রতি রাত,
ক্ষণিকের তরেও হয় না যেন প্রভু
তোমার স্মরণে ব্যাঘাত।

হ্যাঁ আল্লাহ ওয়ালাদের অবস্থা এমনই হয়, তাদের হৃদয় জুড়ে থাকে শুধু আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা। আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন কিছুর প্রতি তাদের তন-মন আকৃষ্টই হয় না। অন্তরের অবস্থা যখন এমন হয়, তখন অন্তর মহামূল্যবান হয়ে যায়।

জমিন সম্পর্কে কথিত আছে, যে জমিন পরিত্যক্ত থাকে, কোন চাষাবাদ হয় না, ঐ জমিন ক্রমেই শক্ত হয়ে কৃষির অযোগ্য হয়ে যায়। তদ্রূপ যে অন্তরের উপর মেহনত হয় না, কিছু দিন পর ঐ অন্তরও কঠিন হয়ে যায়। এর প্রমাণ হল, কুরআনে কারীমের এ আয়াত-

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ.

'যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?' -হাদীদ ১৬

এর পরের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ.

'মু'মিন যেন তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের ন্যায় না হয়।'

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ

'তাদের উপর দিয়ে অবহেলার এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার দরুন তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল।'

মোদ্দাকথা, যখন মানুষ এক দীর্ঘ সময় স্বীয় প্রতিপালক সম্পর্কে উদাসীন থাকে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে কঠিন করে দেন। এমন কঠিন করেন যে,

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ

'অন্তর পাথরের ন্যায় হয়ে যায়।'

اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

'বরং পাথর থেকেও কঠিন।'

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ.

'কেননা কিছু পাথর এমনও আছে যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়।'

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ.

'আর কিছু পাথর তো এমন যা বিদীর্ণ হয়, অত:পর তা থেকে পানি নির্গত হয়।'

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

'আবার কিছু পাথর এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠে।'

কিন্তু হে মানুষ! যখন তোমার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, আল্লাহর ভয়ে সে কেঁপে উঠে না। তখন বাস্তবিক অর্থেই অন্তর পাথর থেকেও নিকৃষ্টতর হয়ে যায়।

অন্তর কিভাবে যিকিরে মগ্ন হবে?

এ জন্যই মাশায়েখগণ বলেন, যিকির অব্যাহত রাখ। দেখবে এ যিকিরই দিলের অভ্যন্তরে নিজেই নিজের পথ করে নিচ্ছে। আপনারা দেখে থাকবেন, কোন পাথর খণ্ডের উপর অনবরত পানির ফোঁটা পড়লে পাথর খণ্ডটি ক্রমেই ছিদ্র হয়ে যায়। তদ্রূপ আমরাও যদি আল্লাহ তা'আলার নামের যিকির অব্যাহত রাখি, তাহলে আমাদের পাষাণ হৃদয়েও এ যিকির আপন রাস্তা করে নিবে। তাই মাশায়েখগণ আত্মশুদ্ধির জন্য গুরুত্বের সাথে যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হল, নিয়মিত যিকির করা। যেন আমাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তখন রাত্রি জাগরণ আনন্দে পরিণত হবে। তাহাজ্জুদের জন্য ঘড়িতে বেল দেয়ার প্রয়োজন হবে না, স্বয়ং বিছানা-ই ছিটকে ফেলে দিবে। হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দাও আছেন শেষ রাতে স্বয়ং বিছানা-ই যাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

'তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' -সাজদা ১৬

আল্লাহ তা'আলা এমন বান্দাদের দু'আ কবুল করেন, দুনিয়া- আখিরাতে তারা সফলকাম হন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের জন্য বিশেষ স্থান রয়েছে।

একজন মুজাহিদের রাত্রি জাগরণ

হযরত সালাহুদ্দীন আইয়ুবী র. রণাঙ্গণে ব্যস্ত। মুজাহিদদের তুলনায় শত্রুবাহিনীর সংখ্যা অনেক বেশী। এমন সময় সংবাদ এল যে, শত্রুপক্ষের আরো সৈন্য সমুদ্র পথে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এ সংবাদে হযরত সালাহুদ্দীন

আইয়ুবী র. চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, পরিস্থিতি তো মুসলমানদের জন্য আরো জটিল হয়ে গেল। তিনি বাইতুল মাকদিসে ছুটে গেলেন। রাতভর রুকু ও সিজদায় পড়ে রইলেন। আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে কাকুতি-মিনতি আর আহাজারিতে সারা রাত কাটিয়ে দিলেন। ফজর নামায শেষে মসজিদ থেকে যখন বের হলেন, দেখলেন, একজন আল্লাহ ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছেন, যার নূরানী চেহারাই বলে দিচ্ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আত্মাধ্যিক জগতে বিশেষ মাকাম দিয়েছেন।

হযরত সালাহুদ্দীন আইয়ুবী র. তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সালাম দিয়ে বললেন, হযরত! দু'আ করুন, সমুদ্রপথে শত্রুপক্ষের আরো অনেক সৈন্য আসছে। বুজুর্গ লোকটি হযরত সালাহুদ্দীন আইয়ুবী র.কে গভীরভাবে দেখলেন, তার দৃষ্টিতে ছিল বিশেষ তীক্ষ্ণতা। অত:পর তার কাছে যেন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। বললেন, সালাহুদ্দীন! তোমার চোখের পানি শত্রুর সামুদ্রিক জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এর তিনদিন পর জানা গেল যে, সত্যিই শত্রুর জাহাজের সলীল সমাধি হয়েছে।

বস্তুত: যে ব্যক্তি রাতের নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পৃথিবীর মানচিত্র পর্যন্ত বদলে দেন। তার হাত দুটো উপরে উঠা মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার জন্য ফায়সালা করে দেন। এটি মামুলি কথা নয়, অনেক বড় নেয়ামত। এর জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। একটি সময় তো ছিল যখন যুবকরা পাল্লা দিয়ে এবাদত করত,

وَفِيْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

'এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত'। -মুতাফফিফীন : ২৬

ঐ সব যুবকরা আজ কোথায়? যারা শেষ রাত্রে চোখের পানি ঢেলে স্বীয় প্রতিপালক থেকে চেয়ে নিত। আফসোস এমন নূরানী চেহারাগুলো আজ হারিয়ে গেছে।

تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے ÷ شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے

নূরের ঐ জলসাগুলো
হারিয়ে গেছে আজ
প্রেম পিয়াসী ভক্ত যাকির
কোথায় তাদের রাজ।

কোথায় গেল ভোরের কোকিল
কোথায় তাদের কান্না
শূন্য পথে রই চাহিয়া
আমি চাতক বান্না।

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے ÷ کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ

তব চাহনিতে কাঁপত পাষাণ
কাঁপত নিখিল ভূবন,
হারিয়ে গেছে মু'মিন তোমার
সেই দৃষ্টি সম্মোহন।

শেষ রাতের আহাজারী অনেক বড় নেয়ামত যা আজ হারিয়ে গেছে, আবার আমাদেরকে ঐ নেয়ামত অর্জন করতে হবে, আত্মার সংশোধনে মনোনিবেশ করতে হবে। হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেন-

منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے ی ÷ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گے

تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے مناروں میں اے انور ÷ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گے

মুখের দাগে বিচলিত তুমি
দেখ আয়না বারে বার
আত্মার কোন খবর রাখ কি
সে যে কুৎসিত কদাকার।
ইহ-জীবনেই বিভোর তুমি
নেই মরণের খবর
তুমি যে ভাই নামে মুসলিম
কাজে ইবলিসের দোসর।
মিনারে মিনারে তাকবীর ধ্বনি
যায় শোনা যায় আজো
হৃদয় রাজ্যে কাঁপন ধরানো
নাই সে ধ্বনির খোঁজও।

এখন সর্বপ্রথম কাজ হল আমরা যিকির দ্বারা আমাদের অন্তরকে জাগাব। অন্তর যখন জাগবে, আল্লাহ তা'আলার মহববতে পূর্ণ হবে, তখন ইবাদত-বন্দেগীতে স্বাদ অনুভূত হবে। তাই আসুন, আমরা আমাদের হৃদয় রাজ্যকে সুন্দর করি, সঞ্জীবিত করি। আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির

হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা যেন এর প্রতি মহব্বতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এ অন্তর যদি ময়লা-আবর্জনায় পূর্ণই থাকে, তাহলে আমরা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দৃষ্টি লাভে সক্ষম হব না। অপরিচ্ছন্ন ঘর যেমন কেউ পছন্দ করে না, তদ্রূপ ময়লা-আবর্জনায় ভরা অন্তরের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহের দৃষ্টি দেবেন তো দূরের কথা, সে দিকে ফিরেও তাকাবেন না।

দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে আমাদের অন্তর সজ্জিত করার তাওফীক দান করেন। যেন আমরা ইবাদত-বন্দেগীতে প্রকৃত স্বাদ লাভ করতে পারি।

প্রিয় ভাইয়েরা! দিল যখন তৈরী হবে, তখন রাত্রি জাগরণ শুধু সহজই নয়, আনন্দদায়ক হবে। আজকাল তো অনেক আলিমকেও বলতে শুনা যায় এবং এই বলে নিশ্চিন্ত থাকতে দেখা যায় যে, আমরা তো দিনভর পড়া আর পড়ানোর কাজেই লিপ্ত থাকি। তাহাজ্জুদের সওয়াব আমরা এমনিতেই পাব। আমার প্রশ্ন সাহাবায়ে কিরাম রা. সারা দিন কি করতেন? শাক-সব্জি বিক্রি করতেন, দ্বীনের কোন কাজই করতেন না? তারা রাত কাটাতেন কি ভাবে? প্রিয় ভাইয়েরা আমার! সাহাবায়ে কিরাম রা. সারা দিন দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থেকে রাত্রি বেলা আবার জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আমাদেরও কর্তব্য হল, তাদের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। যে পথ ধরে তারা এগিয়ে গেছেন, আমরাও যদি ঠিক সে পথেই যাত্রা আরম্ভ করি, তাহলে সন্দেহ নেই এক দিন আমরাও মঞ্জিলে মাকসাদে পৌঁছতে সক্ষম হব। অন্যথায় পথ যদি বদলে যায়, ঠিকানাও বদলে যাবে। সুতরাং সাবধান!

তাহাজ্জুদের তাওফীক কি করে লাভ হবে?

হযরত হাসান বসরী র. এর খেদমতে এক লোক এসে বলল, হযরত! তাহাজ্জুদ মনে হয় আমার ভাগ্যে নেই। দয়া করে এই সৌভাগ্য লাভের কোন পন্থা বলে দিন। হযরত হাসান বসরী র. বললেন, হে বন্ধু! তুমি তোমার দিনের আমলগুলো সুন্দর কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রাতের আমলের তাওফীক দান করবেন। এ জন্য প্রথমে আমরা আমাদের দিনের আমলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেই। এগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করি। বেশী বেশী যিকির করি। তাহলে এ অন্তর প্রস্তুত হবে। তখন রাতের শেষ প্রহরে এ অন্তর আর ঘুমাবে না, জেগে উঠবে।

বন্ধুরা আমার! আল্লাহ ওয়ালাগণ রাতের আমলে যে স্বাদ আর তৃপ্তি লাভ করতেন, দিনের আমলে তা অনুভব করতেন না।

ইমাম শা'রানী র. লিখেন, আগের যুগের লোকেরা রাতের জন্য এমন ভাবে. অপেক্ষা করতেন, যেমন নতুন বর রাতের অপেক্ষায় অস্থির থাকে। আমাদের মাশায়েখরা বলেন- جو دم غافل وہ دم کافر যে মুহূর্তটি অবহেলায় কেটে গেল, মনে করবে ঐ মুহূর্তটি কুফুরির মধ্যে অতিবাহিত হল।

হযরত আযীযুল হাসান মাজযূব র. একবার কোথাও যাচ্ছিলেন, পথে পরিচিত এক লোকের সাথে দেখা। সে জিজ্ঞেস করল, হযরত! কেমন আছেন? হযরত মাজযূব র. বললেন-

پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی ÷ اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی

اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم ÷ ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم

আছি বেশ ফুর্তিতে ভাই
পেয়ে যে গেছি পেনশন
দিবস-রাতি সমান আজি
নেই তো কোন টেনশন।
জীবন আমার বদলে গেছে
রঙ ধরেছে শাপলা
মিলন সুখে বিভোর থাকি
মাহবূব আমার আল্লাহ।

দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এমন অবস্থা দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء.

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উলামারাই শুধু তাঁকে ভয় করে।'

মুখলিছ এবং আমলদার আলিম হোন

তাদের আমল ইবাদত ছিল
পবিত্র নির্মল
পৃথিবী কোথায় দেখেছে এমন
নিষ্ঠার তাজমহল?

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت.

وقال الله تعالى في مقام آخر : اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء.

وقال الله تعالى في مقام آخر : وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

চিরস্থায়ী সম্মান লাভের উপায়

পৃথিবীতে সব মানুষই সফলকাম হতে চায়। পার্থিব জীবনে সাফল্য লাভের পথ হল দু'টি– ১. সম্পদ ২. সৎকর্ম। তবে এ দু'টির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল– সম্পদ যেমন অস্থায়ী, আজ আছে তো কাল নেই, এর দ্বারা অর্জিত সম্মান-মর্যাদারও কোন ভরসা নেই। যারাই ধন-সম্পদ দ্বারা সম্মান লাভ করেছে, একদিন তাদেরকে অপদস্থ হতেই হয়েছে। পক্ষান্তরে নেক আমল দ্বারা যে মর্যাদা লাভ হয়, তা স্থায়ী হয়ে থাকে। কারণ নেক আমলকে بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ স্থায়ী সৎকর্ম বলা হয়। কিন্তু নেক আমলের জন্য ইলমের কোন বিকল্প নেই। ইলম ব্যতীত নেক আমল করা আদৌ সম্ভব নয়।

বুঝা গেল মানুষ যদি ইয্যতের জিন্দেগী লাভ করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে।

হযরত আলী রা. এর সম্পদের উপর ইলমকে প্রাধান্য দেওয়া

এক লোক হযরত আলী রা.কে জিজ্ঞেস করল। হযরত! আমি ইলম হাসিল করব, না সম্পদ অর্জন করব? হযরত আলী রা. বললেন, তুমি ইলমে দ্বীন হাসিল কর। কারণ অনেক বিবেচনাতেই সম্পদ অপেক্ষা ইলম উত্তম। লোকটি বলল, হযরত! একটু খুলে বলুন। হযরত আলী রা. বললেন,

۞ ইলম হল নবীদের রেখে যাওয়া সম্পদ, পক্ষান্তরে মাল হল ফিরআউন, কারূণের পরিত্যক্ত সম্পদ।

۞ ইলম যত বৃদ্ধি পায় সেই সাথে ভক্তবৃন্দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। আর ধন-সম্পদ বাড়ার সাথে সাথে হিংসুক এবং শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

۞ সময় যত গড়ায় সম্পদের মূল্য হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে জ্ঞানের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

۞ সম্পদ সংরক্ষণ করতে হয়, অপর দিকে জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানীকে রক্ষা করে।

۞ সর্বদা সম্পদ চুরি হওয়ার আশংকা থাকে, বিপরীতে ইলম চুরি হওয়ার কোনই শঙ্কা নেই। এই রত্ন আলিমের অন্তরে সর্বদা সংরক্ষিত থাকে।

۞ আরো ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন দু'টি। ১. কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছ? ২. কোন খাতে ব্যয় করেছ? আর ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন মাত্র একটি। যে তুমি ইলম

অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? ইলম কোথা থেকে অর্জন করেছ? এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না।

❁ হযরত আলী রা. এ পর্যায়ে বড়ই আশ্চর্যজনক একটি কথা বলেছেন। বলেছেন, তুমি চাইলে জ্ঞান দ্বারা সম্পদ অর্জন করতে পারবে, কিন্তু সম্পদ দ্বারা কখনই জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না।

❁ অত:পর বললেন, সম্পদশালী হলে মানুষ অহংকারী হয়, যেমন ফিরআউন বলেছিল, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (আমি তোমাদের বড় খোদা) আর মানুষ যত বড় জ্ঞানী হয়, তার বিনয়-নম্রতা ততই বৃদ্ধি পায়। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ.

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার বন্দেগীর হক আদায় করতে পারিনি।'

অতএব বুঝা গেল অনেক দিক দিয়েই মাল অপেক্ষা ইলম উত্তম। বড়ই সৌভাগ্যবান ঐসব শিক্ষার্থীরা যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য কবুল করেছেন।

দুনিয়া হল দারুল আসবাব

দুনিয়া হল দারুল আসবাব। এখানে সকল প্রকার ইজ্জত-সম্মানের পিছনে কোন না কোন রহস্য লুকায়িত থাকে। নবী-রাসূলদেরকে যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন, এর পিছনেও একটি হেতু রয়েছে, আর তা হল ইলম। কুরআনে কারীম থেকে এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

হযরত আদম আ.কে ফিরিশতাদের সিজদা করা

হযরত আদম আ.কে ফিরিশতাদের সিজদা করা একটি বিরল ঘটনা, বিরাট সম্মান। এর পিছনে রহস্য কি?

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.কে সব কিছুর নাম, পরিচয় শিক্ষা দিলেন'। অত:পর ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এগুলোর নাম বল তো? ফিরিশতারা আরজ করলেন-

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

'আপনি পবিত্র। আমাদেরকে আপনি যা শিখিয়েছেন এর বাইরে আমরা কিছুই জানি না।'

এরপর হযরত আদম আ.কে জিজ্ঞেস করা হল। হযরত আদম আ. সব কিছুর নাম বলে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে আদেশ করলেন, এখন তোমরা আদমকে সিজদা কর।

সুতরাং হযরত আদম আ. যে এ বিরল সম্মানে ভূষিত হলেন এর কারণ ছিল ইলম। একজন আরিফ বিল্লাহ উল্লেখিত ঘটনা থেকে এ শিক্ষা আহরণ করেছেন যে, হযরত আদম আ.কে বস্তুসমুদয়ের নাম শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, বিধায় তিনি এমন সম্মান লাভ করেছিলেন। হে মু'মিন! তুমি যদি আল্লাহ তা'আলার মুবারক নামসমূহের জ্ঞান লাভ করতে পার, তাহলে কী পরিমাণ ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী তুমি হবে!

হযরত দাউদ আ.

হযরত দাউদ আ. আল্লাহর নবী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যৌবনেই নবুওয়াত দান করেছিলেন এবং পৃথিবীর বিশাল ভূ-ভাগের রাজত্বও দিয়েছিলেন। এসব সম্মানের পিছনে কারণ কি ছিল?

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি বিশেষ বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। তাঁর হাতে লোহা মোম হয়ে যেত। তিনি লোহার রিং দ্বারা লৌহ বর্ম তৈরী করতেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ

'আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি' (সুবহানাল্লাহ!)। শিক্ষাদানের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের দিকে করেছেন। বলেছেন আমি তাকে তোমাদের জন্য লৌহবর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম।

যাহোক, হযরত দাউদ আ.কে লোহার রিং দ্বারা লৌহ বর্ম তৈরী করার বিদ্যা শিখানো হয়েছিল। বাহ্যিকভাবে এ বিদ্যাই পৃথিবীর বুকে তাঁর রাজত্বের কারণ হয়।

হযরত সুলাইমান আ.

হযরত দাউদ আ. এর পুত্র হযরত সুলাইমান আ.কে রাণী বিলকিসের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে সম্মানিত করা হয়েছিল। রাণী বিলকিস তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া আরো অনেক সম্মান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হল, এসবের পিছনে রহস্য কি? রহস্য হল, তাঁর ইলম।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

'হে লোক সকল! আমাকে পাখির সাথে কথা বলার ইলম শিক্ষা দেয়া হয়েছে।' তিনি হুদহুদ পাখির সাথে কথা বললেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে? হুদহুদ বলল, আমি আপনার জন্য একটি সংবাদ এনেছি, তারপর সে রাণী বিলকিসের ঘটনা শুনাল। এখান থেকে ঘটনার শুরু। রাণী বিলকিসের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা ঘটনার পরিসমাপ্তি।

আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান আ.কে এত সম্মান-মর্যাদা দিলেন কিসের উসিলায়? দিলেন ইলমের উসিলায়।

হযরত ইউসুফ আ.

সাইয়্যিদিনা হযরত ইউসুফ আ.কেও আল্লাহ তা'আলা প্রভূত সম্মান-মর্যাদা দিয়েছিলেন। একটা সময় তো এমন ছিল যে, মিশরের কোন এক বাজারে বিক্রির জন্য তাঁকে উঠানো হয়েছে। ক্রেতারা যার যার মত দামও বলছেন। এমনকি তাঁকে ক্রীতদাসও বানানো হয়েছিল। অবশেষে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সফলকাম করলেন। কয়েক বছর কারাবন্দি থাকার পর মুক্তি লাভ করে সোজা ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করলেন।

বলাবাহুল্য, এ সবই হয়েছিল ইলমের বদৌলতে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যার ইলম শিখিয়েছিলেন-

وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ.

'আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান শিক্ষা দিয়েছেন।'

কারাগারের সঙ্গীরা বাদশাহকে বলল, কারাবন্দী একজন লোক আছেন, যিনি স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা দেন। বাদশাহ তাঁকে ডেকে আনলেন। বললেন,

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ

'আজ আপনি আমাদের নিকট বড়ই সম্মানিত এবং নির্ভরযোগ্য।'

হযরত ইউসুফ আ. বললেন,

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْأَرْضِ

মিশরের রাজভাণ্ডারের সব চাবি আমার হাতে ন্যস্ত করুন। এভাবে অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্ত করে ক্ষমতার উজ্জ্বল আলোয় তাঁকে নিয়ে আসা হল, এর হেতু কি? উত্তর একটিই। আর তা হল ইলম।

বুঝা গেল, নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, এর বাহ্যিক কারণ হল, তাদের ইলম। এমনকি হযরত খিযির আ. একজন ওলী হয়ে নবীর উস্তাদ হওয়ার মত গৌরব অর্জন করেছিলেন এ ইলমের বদৌলতে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ.কে বললেন, যাও, তার সাথে সাক্ষাৎ কর। হযরত মূসা আ. রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইরশাদ হয়েছে-

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا.

'অত:পর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।' -কাহাফ ৬৫

সাক্ষাতের পর হযরত মূসা আ. প্রশ্ন করছেন, আর হযরত খিযির আ. উত্তর দিচ্ছেন। এভাবে একজন ওলী নবীর শিক্ষকতার সম্মান লাভ করলেন ইলমের কারিশমায়।

সাইয়্যিদিনা হযরত রাসূলে কারীম সা.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাধিক ইলম দান করা হল। পূর্ব ও পরবর্তী সকলের সর্দার বানানো হল, ইরশাদ হল- হে আমার প্রিয়

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

'এবং আপনাকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।' -নিসা ১১৩

সুতরাং কুরআনে কারীম থেকে এমন অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে, নবী-রাসূলদের সম্মান-মর্যাদার বাহ্যিক রহস্য ছিল তাদের ইলম। বুঝা গেল ইলম মানুষকে সম্মানিত করে, মর্যাদার আসনে সমাসীন করে। প্রশ্ন হতে পারে, ইলম কি জিনিস?

ইলম কি?

এক জলসায় হযরত মুফতী শফী সাহেব র. উপস্থিত ছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে এই অধমও হযরতের সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। হযরত ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ভাই! ইলম কাকে বলে? ইলম শব্দ দ্বারা আসলে কি বুঝানো হয়?

ছাত্রদের মধ্যে কেউ বলছিল, ইলম অর্থ জ্ঞান অর্জন। আবার কেউ বলছিল ইলম অর্থ অজানাকে জানা ইত্যাদি। এমন সময় এক ছাত্র দাঁড়িয়ে বলল, হযরত! দয়া করে আপনি-ই বলে দিন। বড়দের কথাও বড় হয়ে থাকে।

তিনি এক আশ্চর্যজনক কথা বললেন।

হযরত বললেন, ইলম এমন এক নূরকে বলে, যা অর্জন করার পর আমল করা ব্যতীত স্বস্তি আসে না। যদি অবস্থা এই হয়, তাহলেই ইলম অন্যথায় তা শুধুই বোঝা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বনী ইসরাঈলের বেআমল আলিমকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। বাল'আম বা'উরা বড় সুফী ছিল, অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

'সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।'

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'বস্তুতঃ তার দৃষ্টান্ত ছিল কুকুরের ন্যায়।'

অন্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের বেআমল আলিমদেরকে গাধা আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'এরা হল গাধা যার উপর পুস্তকের বোঝা চাপানো রয়েছে।'

সুতরাং ইলম আর সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে তফাৎ রয়েছে।

ইলম এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! এ কথাটি দিলের মধ্যে গেঁথে নেয়া চাই যে, ইলম এবং সাধারণ জ্ঞান এক জিনিস নয়। কাফিরদের কাছেও তো অনেক জ্ঞান বিদ্যা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো কি ইলম? এ অধমের এমন সব কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে যেখানে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানসহ অনেক ধর্মের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেছেন। যারা নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে কথা বলেছেন। আমারও ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি এমন লোকও দেখেছি, যে অমুসলিম কিন্তু অনর্গল আরবী বলছে। যেন আরবীই তার মাতৃভাষা, আবার আয়াতও পাঠ করছে, হাদীসও বলছে, বিলকুল সহীহ তরজমা করছে (শাব্দিক তরজমা)। কিন্তু এগুলো কি ইলম? না; এগুলো হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আল-কুরআনের অনুবাদ

পিকথল যিনি ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করেন এবং ইংরেজি ভাষায় তার অনুবাদটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। মজার ঘটনা

হল, এই ইংরেজি অনুবাদক আল-কুরআনের ভাষান্তর সমাপ্ত করার পূর্ব পর্যন্ত কাফির ছিলেন। শুধুমাত্র ভাষাগত পান্ডিত্য দিয়ে আল-কুরআনের অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত করেন। এটা ভিন্ন কথা যে, আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি তাকে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এ কথা তো প্রমাণিত হল যে, একজন অমুসলিমের পক্ষেও আরবী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করা সম্ভব। এমনকি কুরআন-হাদীসের অনুবাদ করাও সম্ভব।

তবে এর অর্থ তো এই নয় যে, তার কাছে ইলম রয়েছে, যা আসলে নূর এবং মানুষকে আমলের প্রতি উৎসাহিত করে, তার মধ্যে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে।

যে জ্ঞানের কোন গভীরতা নেই; শুধু ভাষা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান। এ কারণেই হাদীস শরীফে উপকারী ইলমের আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে। অনেক সময় এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে আলিম হন, অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক তো আলিম হয়, কিন্তু অন্তর জাহিলই থাকে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

'আপনি কি এমন লোককে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে মা'বুদ বানিয়েছে'? বস্তুতঃ প্রবৃত্তির পূজা, মনের পূজা, নারী পূজা, সম্পদের পূজা এসবগুলোই মূর্তিপূজার শাখা-প্রশাখা। আল্লাহর বন্দেগী তো ভিন্ন জিনিস। ইরশাদ হয়েছে- আপনি কি দেখেছেন এমন লোককে, যে তার প্রবৃত্তিকে মা'বুদ বানিয়েছে?

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

'ইলম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন' আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলছেন- ইলম থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে গোমরাহ করে দিয়েছি।

জ্ঞানের পর অজ্ঞতা

দেখবেন, যারা ধূমপান করে, তারা জানে ধূমপান করলে ক্যান্সার হয় এবং অনেক সময় তারা ছোটদেরকে উপদেশও দেয় যে, খবরদার! তোমরা ধূমপান করো না। আমরা তো আমাদের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমরা এমন করো না। আর সিগারেট কোম্পানীর মালিকরা তো প্যাকেটের গায়ে লিখেই দেয় 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'।

এখন দেখুন: ধূমপায়ীরা এর ক্ষতি সম্পর্কে অবগত, অন্যদেরকে নিষেধও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে কিছু সময় পর পর এমন এক চাহিদার সৃষ্টি হয় যার সম্মুখে তারা পরাস্ত হয়ে ধূমপান শুরু করে দেয়। একেই বলে ইলম থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হওয়া।

অনেক সময় মানুষ জানে যে, এ কাজটি কবীরা গুনাহ, কিন্তু তার ঘাড়ে শয়তান চড়ে বসে, প্রবৃত্তি তাকে পরাস্ত করে, বিবেকের উপর আবরণ পরে যায়, কাজটি কবীরা গুণাহ জেনেও সে তা করে বসে। একেই বলে ইলম থাকা সত্ত্বেও পথ ভ্রষ্ট হওয়া।

وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ.

(আল্লাহু আকবার!) 'তাদের কর্ণের উপর এবং অন্তরের উপর মোহর লেগে গেছে।'

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً

'চোখের উপর পর্দা পড়ে গেছে।'

فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না?' -জাসিয়া ২৩

প্রিয় ভাইয়েরা! মনে রাখবেন ইলম অর্জন করা হল প্রথম পদক্ষেপ। আর ইলম বলে যার উপর আমল করা হয়। অন্যথায় তা শুধুই সাধারণ জ্ঞান। এ জন্যই বড়রা বলেন,

اَلْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ وَبَالٌ وَالْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ ضَلَالٌ

'আমল ব্যতীত ইলম হচ্ছে ধ্বংস। আর ইলম ব্যতীত আমল হচ্ছে ভ্রষ্টতা।'

সুতরাং সর্বপ্রথম ইলম হাসিল করতে হবে। অত:পর ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে।

ইলম অর্জনের জন্য বড়দের কুরবানী

আমাদের বড়রা ইলম হাসিল করার জন্য অনেক কুরবানী পেশ করেছেন। পরিশ্রম করেছেন। মনোযোগের সাথে লেগে থেকেছেন। মাদরাসাকে মাতৃভূমি মনে করতেন। কিতাবের পাতাকে কাফন ভাবতেন। পড়া-শুনায় জীবন লাগিয়ে দিতেন। এ কারণেই হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বলতেন, নিয়ত যদি পরিশুদ্ধ হয়, তাহলে তালিবে ইলমের চেয়ে উত্তম আর কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই। তারা এমন বরকতময় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন যে,

ফিরিশতারা পর্যন্ত বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের পদতলে আপন ডানা বিছিয়ে দেন।

এমনকি বর্ণিত আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন কোন সাধারণ মু'মিনের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পক্ষান্তরে যখন কোন আলিম অথবা তালিবে ইলমের প্রতি খুশী হন, তখন তাদের জন্য জান্নাতে শহর স্থাপন করেন। যেমন দুনিয়াতে নবাবদের পৃথক পৃথক এলাকা থাকে, আল্লাহ তা'আলা আলিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতে তাদের জন্য পৃথক শহর আবাদ করেন। তাদের জন্য আলাদা ষ্টেট তৈরি করেন।

আরো বর্ণিত আছে-

مَنْ كَانَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ الْجَنَّةُ فِيْ طَلَبِهِ.

'যে ব্যক্তি ইলমের পিছনে ছুটবে, জান্নাত তার পিছনে ছুটবে।'

অতএব কোন বান্দাকে ইলমে দ্বীনের জন্য কবুল করা আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ। আপনারা বড়ই ভাগ্যবান এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা! স্বয়ং কুরআন এর সাক্ষী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا.

'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি।' -সূরা ফাতির ৩২

অর্থাৎ আমি আমার এ কিতাবের উত্তরসূরী আমার ঐ সব বান্দাদেরকে করেছি, যাদেরকে আমি বেছে নিয়েছি, যারা আমার নির্বাচিত, আমার প্রিয়, আমার পছন্দের বান্দা।

সুতরাং যারা কিতাবের উত্তরসূরী হন, তারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার কত অনুগ্রহ যে, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের ইলমের জন্য আমাদেরকে কবুল করেছেন। আমাদের উচিত আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহের প্রতিদানে অত্যন্ত মনোযোগ আর মেহনতের সাথে ইলমে দ্বীন হাসিল করায় নিয়োজিত থাকা।

ইমাম মালিক র. এর সাথে ইমাম শাফী র. এর সাক্ষাৎ

ইমাম শাফী র. বলেন, আমি একবার মিনার বাজারে ছিলাম। হজ্বের মৌসুম ছিল। হাজীগণ কংকর নিক্ষেপের বিধান মাত্র সম্পন্ন করেছেন।

এমন সময় এক বৃদ্ধের সাথে আমার দেখা হল, তিনি আমাকে গভীরভাবে কিছুক্ষন দেখলেন তারপর বললেন-

আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমার দাওয়াত গ্রহণ করুন।

: আমি তার দাওয়াত গ্রহণ করলাম।

বৃদ্ধটি নি:সংকোচে এক টুকরো রুটি বের করে দস্তরখানে রেখে বললেন, আহার করুন।

: আমি আহার করতে লাগলাম। তিনি আমাকে দেখতে থাকলেন এবং বললেন-

আমার মনে হচ্ছে আপনি কুরাইশ বংশের লোক।

ইমাম শাফী র. : ঠিক বলেছেন, কিন্তু জানলেন কি করে?

বৃদ্ধ : কুরাইশ বংশের লোকেরা নি:সংকোচে দাওয়াত দেন এবং নি:সংকোচে তা গ্রহণও করেন। অত:পর তিনি অন্যান্য কথা বলতে লাগলেন। আমি বুঝলাম বৃদ্ধটি মদীনা শরীফ থেকে এসেছেন।

: আমি তার কাছে ইমাম মালিক র. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তার জীবনের কিছু ঘটনা তুলে ধরলেন। যখন দেখলেন আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ইমাম মালিক র. এর ঘটনাবলী জিজ্ঞেস করছি, তখন বললেন-

আপনি যদি মদীনা শরীফ যেতে চান, তাহলে ধূসর বর্ণের এ উটটি আমাদের কাছে অতিরিক্ত রয়েছে। আমরা এটি আপনাকে দিয়ে দিব। আপনি মদীনায় পৌছে যাবেন।

: আমি তো পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। তাই রাজি হয়ে গেলাম। মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনা শরীফ পৌছতে আমাদের ষোল দিন লেগে গেল। এ সময়ে আমি ষোল খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলাম। (সুবহানাল্লাহ)

অথচ বর্তমান যুগের অবস্থা তো হল– আমরা হজ্ব করে আসি। দশ দিন মদীনায় কাটাই। এক খতম কুরআন শরীফ পড়ারও তাওফীক আমাদের হয় না। আমাদের পূর্বসূরীরা যখন হজ্বে আসতেন, তখন অসংখ্য-অগণিত মানুষ তাদের হাতে কালিমা পড়ে মুসলমান হতেন। আর আজ আমরা হজ্ব করে আসি, নিজের ঈমানটা পর্যন্ত দুরস্ত হয় না। হজ্ব থেকে ফিরে এসে আবার সেই পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যাই।

যাহোক ইমাম শাফী র. মদীনার সফরে ষোল খতম কুরআন শরীফ পড়লেন। তিনি বলেন, যখন আমরা মসজিদে নববীতে পৌছলাম, নামাযের

পর দেখলাম, লুঙ্গি পড়া গায়ে চাদর জড়ানো একজন উঁচা-লম্বা বুজুর্গ লোক একটি উঁচু স্থানে গিয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অন্য অনেক লোক তাকে ঘিরে বসে পড়ল। আমি বুঝলাম, ইনি-ই ইমাম মালিক র. হবেন। হযরত ইমাম মালিক র. তখন হাদীস লিখাচ্ছিলেন। অর্থাৎ মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক গ্রন্থে সংকলিত হাদীসগুলো লিখাচ্ছিলেন। আমি একটি কাঠি হাতে তুলে নিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, এটি হচ্ছে আমার কলম, আর একটি হাত সম্মুখে তুলে ধরলাম, ভাবলাম এটাই আমার খাতা। কাঠিটি আমার জিহ্বায় লাগালাম, যেন আমি কলমে কালি ভরছি, অত:পর হাতের তালুতে লিখা আরম্ভ করলাম। অন্যরা কাগজে লিখছিল। আমি তাদের এ সৌভাগ্যে অংশীদার হওয়ার জন্য হাতের তালুতে লিখে চললাম। এক পর্যায়ে ইমাম মালিক র. আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি ঐ মজলিসে মোট ১২৭ টি হাদীস লিখালেন। অত:পর পরবর্তী নামাযের সময় হলে মজলিস শেষ হয়ে গেল। শিক্ষার্থীরা যার যার মত চলে গেলেন। তখন ইমাম মালিক র. আমাকে কাছে ডেকে বললেন-

তোমাকে অপরিচিত মনে হচ্ছে।

ইমাম শাফী র. : জী হ্যাঁ। আমি মক্কা শরীফ থেকে এসেছি।

ইমাম মালিক র. : হাতের তালুতে তুমি কি করছিলে?

ইমাম শাফী র. : হাদীস লিখছিলাম।

ইমাম মালিক র : আচ্ছা দেখাও তো!

ইমাম শাফী র. : যখন দেখালাম, হাতের তালু ছিল খালী। সেখানে কিছুই লিখা ছিল না।

ইমাম মালিক র. : কিছুই তো লিখা নেই।

ইমাম শাফী র. : হযরত! আমার কাছে না কলম ছিল, না কাগজ! আমি তো আপনার কাছ থেকে সরাসরি হাদিস লিখার সৌভাগ্য লাভের জন্য একটি কাঠি দিয়ে হাতের তালুতে লিখার অভিনয় করছিলাম।

একথা শুনে ইমাম মালিক র. অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন-

এটি তো হাদীসের আদব পরিপন্থী হয়েছে। তুমি এ ভাবে কেন লিখলে?

ইমাম শাফী র. : হযরত! অন্য সকলের সাথে সাদৃশ্যতার জন্য বাহ্যিক ভাবে হাতের তালুতে লিখার অভিনয় করলেও বাস্তবে আমি আমার অন্তরের পাতায় লিখে যাচ্ছিলাম।

ইমাম মালিক র. : আচ্ছা! তুমি যদি তোমার অন্তরেই লিখে থাক, তাহলে আমার বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে কয়েকটি হাদীস শুনাও। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব।

ইমাম শাফী র. : আমি এক থেকে শুরু করলাম একশত সাতাশটি হাদীস মতন এবং সনদসহ শুনালাম এবং হাদীসগুলো যে ধারাবাহিকতার সাথে তিনি লিখিয়েছিলেন, আমি ঠিক ঐ ভাবেই শুনালাম। ইমাম মালিক র. অত্যন্ত খুশী হলেন। বললেন-

হে যুবক! তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।

ইমাম শাফী র. : অন্ধের প্রয়োজন দু'টি চোখ। আমি তো পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। বললাম, হযরত! আমি রাজি।

ইমাম মালিক র. ঘরে গেলেন। ঘরে তাঁর কন্যারা ছিল। তারা একই সাথে কুরআন এবং হাদীসের হাফিযা ছিলেন। অত্যন্ত দ্বীনদার, পরহেযগার, পবিত্র জীবন-যাপনে অভ্যস্ত নারী ছিলেন। এমনকি ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে লিখা রয়েছে যে, তারা ইমাম মালিক র. এর হাদীসের দরসে পর্দার আড়ালে শরীক হতেন এবং তাদের ইলমী যোগ্যতা এমন উঁচু মানের ছিল যে, ইমাম মালিক র. এর কোন শাগরিদ হাদীস পাঠে কোন ভুল করলে ইমাম মালিক র. এর কন্যারা টেবিল চাপড়ে সতর্ক করতেন। যার দ্বারা ইমাম মালিক র. বুঝতেন যে, হাদীস পাঠকারী কোন ভুল করেছে।

ইমাম মালিক র. কন্যাদেরকে বললেন, আজ একজন বড় আলিম আমাদের মেহমান হয়েছেন, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী। ইলমের প্রতি আসক্ত। অতএব তারা খানা-পিনার বিরাট আয়োজন করলেন। বিছানা প্রস্তুত করলেন, জায়নামায বিছিয়ে রাখলেন। অজুর জন্য পাত্র ভরে রাখলেন। ইমাম শাফী র. খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন। সকাল হলে ইমাম মালিক র. এর সাথে মসজিদে চলে গেলেন। ইশরাক নামায শেষে যখন ঘরে ফিরলেন, তখন ইমাম মালিক র. ইমাম শাফী র.কে বললেন-

আপনার ব্যাপারে আমার কন্যাদের অভিযোগ রয়েছে। এ সম্পর্কে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

এ সব ব্যক্তিত্বরা ছিলেন পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী। স্পষ্টভাবে সবকিছু বলে দিতেন। তিনি বললেন, আমার কন্যারা বলছে, আব্বাজান! আপনি তো বলেছিলেন, মেহমান অত্যন্ত ভাল মানুষ, বড় আলিম। কিন্তু আমাদের তার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

কন্যাদের অভিযোগ

প্রথম অভিযোগ হল, আমরা যে পরিমাণ খাবার মেহমানের জন্য পাঠিয়েছিলাম। তা কয়েকজনের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি একাই সব খেয়ে এমন সাফ করে দিয়েছেন যে, বরতনগুলো ধোয়ারও প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি।

দুনিয়াদারদের অভিযোগ

বর্তমান যুগের লোকদের অভিযোগ! সন্তানকে আলিম বানাবো তো তারা খাবে কি? আপনিই বলুন, আজ পর্যন্ত কি শুনেছেন কোন নেককার আলিম অথবা হাফিয না খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেছেন? হ্যাঁ, এমন একটি উদাহরণও কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। আমি পৃথিবীর অনেক দেশে প্রশ্নটি রেখেছি। কেউ একটি দৃষ্টান্তও উপস্থিত করতে পারেনি। কিন্তু আমরা অনেক এম. বি. বি. এস, পি. এইচ. ডি ডিগ্রীধারী ডাক্তারের কথা জানি বার্ধক্যে যাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তারা শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাহলে বলুন, রিযিক কোন পথে বেশী লাভ হয়? দ্বীনদারীর পথে, না অন্য কোন পথে? আমাদের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত তো আছে যে, খাবার বেশী গ্রহণ করার ফলে মৃত্যু হয়েছে। যেমন ইমাম মুসলিম র. এর মৃত্যুর ঘটনা, তিনি হাদীসের সন্ধান করছিলেন আর সম্মুখে রাখা খেজুর খাচ্ছিলেন, হাদীস অন্বেষণে এমন মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, খেতে খেতে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার কারণে তার মৃত্যু এসে যায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত আহারের কারণে মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত তো আছে, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যু বরণের কোন উদাহরণ আমাদের এ পথে নেই।

আলহামদুলিল্লাহ! রিযিকের দরজা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একেবারে খুলে দেন। অথচ দুনিয়াদারদের ভয় হল, আমার সন্তান আলিম হলে খাবে কি? আল্লাহর বান্দারা শুন! তারা ঐ ভাণ্ডার থেকে আহার সংগ্রহ করবে, যে ভাণ্ডার থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলকে আহার দিয়েছেন।

যাহোক ইমাম শাফী র. সম্পর্কে তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি কয়েকজন লোকের খাবার একাই সাবাড় করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল, আমরা জায়নামায বিছিয়ে রেখেছিলাম, অজুর জন্য পাত্রে পানি ভরে রেখেছিলাম। কিন্তু জায়নামায যেমন বিছানো ছিল,

তেমনই রয়েছে। পানির বরতনও খালি হয়নি। বুঝা যায়, তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়েননি।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হল, ঘুম থেকে উঠে তিনি সোজা মসজিদে চলে গেলেন, সেখানে তো অজুর কোন ব্যবস্থা নেই। লোকেরা ঘর থেকে অজু করে মসজিদে যান। তিনি এভাবে অজু না করেই মসজিদে চলে গেলেন। আমাদের জানা নেই, তিনি নামায কিভাবে পড়েছেন? বিষয়গুলো আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

ইমাম শাফী র. এর উত্তর

ইমাম শাফী র. : হযরত! আসল ঘটনা হল, আপনার এখানে পরিবেশিত খাবারে হাত রেখেই অনুভব করলাম, খাবারে নূর আর নূর, মনে হল প্রতিটি লোকমায় আমার বক্ষ নূরে ভরে যাচ্ছে। ভাবলাম এমন হালাল নূরানী খাদ্য হয়ত জীবনে আর কখনো পাব না। তাই একে শরীরের অংশই বানিয়ে নেই। এই ভেবে আমি সমস্ত খাবার একাই খেয়ে পরিষ্কার করে দিলাম (আল্লাহু আকবার!)। অত:পর আমি শুয়ে পড়লাম। কিন্তু খাবারে এত নূর ছিল যে, আমার নিদ্রা কোথায় পালিয়ে গেল। অগত্যা আমি হাদীস ভাণ্ডারে মনোনিবেশ করলাম।

এই হাদীসটি আমার গবেষণায় আসল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট ছেলেকে, যার পাখিটি মরে গিয়েছিল, আদরের সাথে বলেছিলেন,

يَا اَبَا عُمَيْرُ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

'ওহে আবু উমায়ের! কি হল তোমার নুগায়ের?'

এ কয়টি শব্দ নিয়ে আমি ভাবতে থাকলাম। ভাবতে ভাবতে এ শব্দটুকু থেকে চল্লিশটি মাসআলা বের করলাম। এতটুকু বাক্য يَا اَبَا عُمَيْرُ! অর্থাৎ কারো উপনাম কেমন হওয়া চাই, শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, কারো হৃদয় জয় করার জন্য কোন পদ্ধতিতে কথা বলা যায়।

يَا اَبَا عُمَيْرُ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

শুধু এতটুকু বাণীর উপর গবেষণা করে চল্লিশটি মাসআলা আমি উদঘাটন করেছি।

হযরত! যেহেতু আমার অজু ছিল, তাই উঠে ফজরের নামায ঐ অজু দ্বারাই সম্পন্ন করেছি।

আমাদের বড়দের এই ছিল অবস্থা। অতএব সর্ব প্রথম পদক্ষেপ ইলম অর্জন হওয়া চাই। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হওয়া চাই ঐ ইলম অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু মনে রাখবেন, আমল করার সাথে সাথে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আরেকটি পদক্ষেপ থেকে যায়, তার নাম হল ইখলাছ।

ইখলাছের গুরুত্ব

মনে রাখবেন, ইলমের অসম্পূর্ণতা আমল দ্বারা, আর আমলে কোন ত্রুটি রয়ে গেলে ইখলাছ দ্বারা পূর্ণ হয়। কিন্তু ইখলাছের অসম্পূর্ণতা অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হয় না। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যদি কোন কাজ করা হয়, তাহলে সেটা কাজ হয়। যে ব্যক্তি ইখলাছের সাথে আমল করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

আমাদের আকাবিররা যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল তাদের ইখলাছ।

عابد کے عمل سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل ÷ آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص ایسا تاج محل

তাদের আমল ইবাদত ছিল
পবিত্র নির্মল
পৃথিবী কোথায় দেখেছে এমন
নিষ্ঠার তাজমহল?

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতবী র. যখন দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছিলেন, তখন আকাবিরদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ঘোষণা করলেন, আজকে দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি প্রস্তর এমন এক ব্যক্তিত্ব দ্বারা স্থাপন করব, যিনি জীবনে কখনো কবীরা গুনাহ করা তো দূরের কথা, ইচ্ছাও করেননি, কল্পনাও করেননি। একজন বুজুর্গ ছিলেন। নাম ছিল মুন্নে শাহ। দেখতে তেমন উঁচু লম্বা ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তার স্থান ছিল অনেক উঁচু। ঘাস কাটতেন এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতিদিনের উপার্জন থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে বছর শেষে দারুল উলূমের উস্তাদবৃন্দকে একবার দাওয়াত করতেন।

দারুল উলূমের উস্তাদগণ লিখেছেন যে, আমরা সারা বছর তার দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কারণ যেদিন আমরা তার দাওয়াত গ্রহণ করতাম, সেদিন থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমাদের নামাযে মগ্নতা বৃদ্ধি পেত।

বুঝা গেল, প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ইলম, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমল। আর তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে আমলের মধ্যে ইখলাছ। এ তিনটি বস্তু যখন একত্রিত হবে, তখন ঐ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট মাকবূল হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ তিনটি নেয়ামত দান করুন। আমাদের বক্ষকে ইলমের আলো দ্বারা আলোকিত করুন। অত:পর ইখলাছের সাথে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

তারা কেমন ছিলেন? আর কেমন হলাম আমরা?

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আজ আমলহীনতার এক ভয়াবহ পরিবেশ বিরাজ করছে। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়, যখন মনে হয়, আমাদেরই পূর্বসূরী আকাবিরদের মুতালা'আর তো এই অবস্থা ছিল যে, রাতের পড়া-শুনার জন্য কুপির তেলের পিছনে প্রতি মাসে তাঁদের এই পরিমাণ অর্থ খরচ হত যে, খাবার-দাবারেও ঐ পরিমাণ খরচ হত না। অথচ আজ তাঁদেরই সন্তানরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েছে। তাঁরা এশার অজু দ্বারা ফজর নামায আদায় করতেন, আর আজ আমাদের ফজর নামাযেরও খবর থাকে না। তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা দৈনন্দিন কাজ-কর্ম আরম্ভ করতেন। আর আজ তাঁদের' উত্তরসূরীরা সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে প্রাত্যহিক কাজ আরম্ভ করে। তাঁরা জুম'আপূর্ব বক্তব্যের জন্য হাদীসের কিতাব নাড়াচাড়া করতেন। আজ তাঁদের সন্তানরা জুম'আর নামায পড়ানোর জন্য পত্রিকায় খুৎবা তালাশ করে।

একটু ভেবে দেখুন! আমরা কোথায় পৌঁছেছি। অতএব প্রয়োজন হল, আমাদের মধ্যে আমলের আগ্রহ সৃষ্টি করা। ইখলাছের সাথে ইলম অনুযায়ী আমল করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়

একটি সূক্ষ্ম কথা জেনে রাখুন, শয়তান আমাদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, একবারে যা শিখার শিখে নাও, যতটুকু ইলম অর্জন করার, অর্জন করে নাও। তারপরে এক সাথে আমল করে নিবে। যখনই এমন কথা মনে হবে, বুঝবে এটি শয়তানের কাজ। যারা এমন ধারণায় পতিত হয়, তাদের আমল করার আর তাওফীক হয় না। যে মনে করল, আগে পড়ে নেই, তার পরে আমল করব। তার আর কখনই আমলের

অভ্যাস হবে না। আর যে ছাত্র যতটুকু পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তদানুযায়ী আমলও করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইস্তেকামাত দান করবেন।

অতএব আমরা এ নিয়তেই পড়ব যে, একদিকে পড়ব, অপরদিকে তদানুযায়ী আমলও করব। এভাবে এক সময় আমাদের শিক্ষাও সমাপ্ত হবে, পাশাপাশি আমলের দিক দিয়েও আমরা পূর্ণতা লাভ করব।

হযরত শাইখুল হাদীস র. একটি কথা লিখেছেন, যে ছেলেটি ভবিষ্যতে বড় হবে, ছাত্রজীবনেই তার মধ্যে বড় হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। ছাত্রজীবনেই তার মধ্যে এ পরিমাণ তাকওয়া এবং সুন্নত অনুসরণের জযবা পরিলক্ষিত হয় যে, এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তার জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে।

অতএব যাই শিখুন, আমলের নিয়তে এবং জযবার সাথে শিখুন। যখন ইলম অনুযায়ী আমল করতে থাকবেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইলমকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন এবং এমন ইলমই কিয়ামতের দিন আপনাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামত দিবসে পিপাসার্ত উম্মত হাউযে কাউছারের আশপাশে সমবেত হবে। সেখানে ফিরিশতা নিয়োজিত থাকবেন, তারা পিয়ালা ভরে ভরে পিপাসার্ত উম্মতকে হাউযে কাউছারের পানি পান করাবেন। কিন্তু যখন উম্মতের উলামায়ে কিরাম হাউজে কাউছারের কাছে পৌঁছবেন, তখন স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হস্ত মুবারকে তাদেরকে জামে কাউছার পান করাবেন। (সুবহানাল্লাহ!)

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আমাদেরকে আলিমদের পদতলে স্থান দিন এবং যতদিন বেঁচে থাকি, ইলমের খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমীন!!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

اے اللہ!

تیری ایک نگاہ کی بات ہے ÷ میری زندگی کا سوال ہے
مجھے اپنی پستی کی شرم ہے ÷ تیری رفعتوں کا خیال ہے
مگر اپنے دل کا کیا کروں ÷ اسے پھر بھی شوق وصال ہے.

হে আল্লাহ!
তোমার দয়ার একটু পরশ
আমার জীবন সুধা,
তুমি আলীশান অসীম মহান
আমি ক্ষুদ্র সীমায় বাঁধা।
শত ব্যবধান জয় করেও
তোমার মিলন চাই,
মিলন বিনে এ অধমের
চাওয়ার কিছু নাই।

بسم الله الرحمن الرحيم

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।' -আল হাদীস

মানবতার নামে আল্লাহর পয়গাম

হেরা থেকে আসলেন নেমে
সকলের মাঝে তিনি
নিয়ে এলেন সঙ্গে করে
মহাবিপ্লবের বাণী।
আরব-আজম উঠল কেঁপে
জাগল অযুত প্রাণ
কি ছিল সে বাণীর মাঝে
জানেন আল্লাহ মহান

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

الر، كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

কুরআনে কারীম হল রহমতের চুম্বক

কুরআনে কারীম হল আল্লাহর কালাম; মানবতার নামে আল্লাহর পয়গাম। একে ইবাদত-গ্রন্থ বলা হয়নি, বলা হয়েছে হিদায়াত-গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি শুধু জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ইবাদত করাই শিক্ষা দেয়নি। বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত মানুষকে তার প্রতিটি কদমে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। সুতরাং এটি হচ্ছে হিদায়াত-গ্রন্থ।

এ গ্রন্থটি চোখ ভরে দেখাও ইবাদত, পাঠ করাও ইবাদত, পাঠ দানও ইবাদত। এ কিতাব শ্রবণ করাও ইবাদত। পড়ে শুনানও ইবাদত। এটি অনুধাবন করাও ইবাদত। অন্যকে বুঝানোও ইবাদত। সর্বোপরি এ কিতাব অনুসারে আমল করা হচ্ছে সব চেয়ে বড় ইবাদত।

এ কিতাবের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আশ্চর্যজনক ক্ষমতা রেখেছেন। এটি সরাসরি মানুষের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। এ কিতাব মানবজাতির জীবন-যাপনের মৌলিক নীতিমালাই শুধু নয়, মানবজীবনের জন্য আবে হায়াত তথা মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাও বটে।

পৃথিবীতে যেমন লোহাকে আকর্ষণ করার জন্য চুম্বক রয়েছে; চুম্বক যেখানেই থাকে, লোহাকে তার দিকে টানে। তদ্রূপ কুরআনে কারীমও আল্লাহ তা'আলার রহমতকে আকর্ষণ করে। এ জন্যই নির্দেশ হল,

وَإِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন নীরব থাক, মনোযোগসহ শ্রবণ কর, যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

বুঝা গেল যেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। কুরআন হল, আল্লাহর রহমত আকর্ষণ করার চুম্বক। এ কুরআন মানুষের অন্তরকেও তার দিকে টানে, আকৃষ্ট করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে এ বিস্ময়কর গ্রন্থটিই ছিল, আর এর দ্বারাই ঘটেছিল বিপ্লব, মহাবিপ্লব।

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ÷ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی ÷ عرب کی زمین جس نے ساری ہلادی

হেরা থেকে আসলেন নেমে
সকলের মাঝে তিনি

নিয়ে এলেন সঙ্গে করে
মহাবিপ্লবের বাণী।
আরব-আজম উঠল কেঁপে
জাগল অযুত প্রাণ
কি ছিল সে বাণীর মাঝে
জানেন আল্লাহ্ মহান

কাফিররা গোপনে কুরআন শ্রবণ করত

এ কুরআন গোটা আরব ভূখণ্ডকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এর দ্বারা মানুষের জীবনে বিপ্লব ঘটেছিল। কি কারণে এ সব হয়েছিল? আসলে এগুলো ছিল কুরআনের প্রভাব, তার অভূতপূর্ব ক্ষমতা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বড় বড় কাফিররা আসত।

قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ কুরআনে এমন আছর ছিল যে, কাফিররা বলতে বাধ্য হল

إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

'এতো দেখছি যাদু, যা আমাদেরকে প্রভাবিত করছে।'

অর্থাৎ তারা স্বীকার করত যে, এর মধ্যে বিস্ময়কর আছর রয়েছে। এ জন্যই তারা বলত

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْآنِ

'এ কুরআন শ্রবণ করো না।'

وَالْغَوْا فِيْهِ

'বরং সোরগোল কর। হয়ত তোমরা বিজয়ী হবে।'

অর্থাৎ কুরআন শুনতে তারা ভয় পেত, না জানি তার আছর আমাদেরকে পেয়ে বসে। এতদসত্ত্বেও রাত্রিবেলায় যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন কুরাইশের বড় বড় কাফির যারা তাঁর প্রাণের শত্রু ছিল, ঘরে স্থির থাকতে পারত না, গোপনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াত শুনতে পাগলের মত ছুটে আসত। এ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এমনই তাছির রেখেছেন।

অতএব প্রাণের ভাইয়েরা আমার! কুরআন বিশ্বাসীরা যদি এ কুরআন পাঠ করে এবং মনোযোগসহ তা শ্রবণ করে, তাহলে তার আছর কত শতগুণ বেড়ে যাবে? একটু ভেবে দেখুন, এ জন্য আমাদের মহব্বতের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা শিখতে হবে। আফসোস! আজ গুনাহের কারণে আমরা এর বরকত থেকে, এর স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়েছি।

কুরআন পাঠে স্বাদ অনুভব না হওয়ার কারণ

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, এক ব্যক্তির সর্দি লেগেছে। আপনি তাকে মিশকে আম্বর দিয়ে বললেন, ভাই বলুন তো! এ সুগন্ধিটি কেমন? সে কিছুই বুঝবে না। অথচ মিশকে আম্বরের মূল্যবান হওয়া সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটি সর্দির রোগী হওয়ার কারণে এর ঘ্রাণ অনুভব করতে অক্ষম। তদ্রূপ কুরআনে কারীমের চুম্বকীয় শক্তি সম্পর্কেও সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু যখন গুনাহের সর্দি লেগে যায়, তখন মানুষ এর তাছির থেকে বঞ্চিত থাকে। কুরআন তিলাওয়াত করে, কিন্তু স্বাদ পায় না। আপনি হয়ত এমন তিলাওয়াতকারীও দেখেছেন, যার সামনে দিয়ে কোন মানুষ যাওয়া মাত্র সে তিলাওয়াত বন্ধ করে অতিক্রম-কারীকে দেখতে থাকে। সে আল্লাহর কালাম পড়ছে, না কোন ইংরেজি বই বা উপন্যাস পড়ছে। কোন পার্থক্যই যেন নেই। এ অবস্থা কেন হল?

প্রিয় ভাইরা আমার! এর কারণ হল, আমাদের অন্তর কুরআনের বরকত থেকে বঞ্চিত। এর বরকত ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের অন্তরগুলো হারিয়ে ফেলেছে। যখন এ অন্তর কুরআনে কারীমের বরকত লাভ করা শুরু করবে, তখন (সুবহানাল্লাহ!) মানুষ ডুব দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করবে। তখন এর স্বাদ বদলে যাবে, অবস্থাও পাল্টে যাবে।

সাহাবায়ে কিরাম রা. রাতভর একটি মাত্র আয়াত বারবার পড়তেন আর তার স্বাদ আস্বাদন করতেন।

রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ

বর্ণিত আছে, হযরত ফাতিমা রা. এক রাতে ইশার নামায পড়ে দু' রাকাত নফলের নিয়ত করলেন। রাত ছিল লম্বা। শীতের রাত। কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করতে থাকলেন। কত সময় পেরিয়ে গেল খবর ছিল না। অবশেষে যখন সালাম ফিরালেন, দেখলেন রাত শেষ হয়ে প্রায় সকাল হয়ে গেছে। তখন হাত উঠালেন, আক্ষেপের সাথে এই দু'আ করলেন, হে

আল্লাহ! আমি তো মাত্র দু'রাকাত নফলের নিয়ত করেছিলাম। তোমার রাত এত ছোট যে, দু' রাকাত নফলেই তা ফুরিয়ে গেল।
দেখুন! তাদের রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ ছিল। অনুমান করুন, কুরআন তিলাওয়াতে কি পরিমাণ স্বাদ আর মজা তারা লাভ করতেন?

ক্রমাগত তীরবিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খা

প্রসিদ্ধ ঘটনা। দু'জন সাহাবীর উপর পাহারার দায়িত্ব অর্পিত হল। তাদেরকে বলা হল, তোমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পাহারা দাও। তারা যথাস্থানে পৌছলেন। তারপর ভাবলেন, দু'জন এক সাথে জাগ্রত থাকলে শেষ রাতে উভয়ের ঘুম এসে যেতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন পালাক্রমে একজন জেগে পাহারা দিবেন, অপরজন ঘুমাবেন। অত:পর জাগ্রত সাহাবী ভাবলেন, বসে থেকে লাভ কি? নামায পড়ি, কুরআন তিলাওয়াত করি, তিনি দু'রাকাত নফল নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ওদিকে সুযোগ পেয়ে শত্রু পক্ষ তীর নিক্ষেপ করল। একটি, দু'টি এভাবে তিনটি তীর এসে বিদ্ধ হল। রক্ত ঝরতে লাগল। এতো পরিমাণ রক্ত ঝরল যে, তিনি জ্ঞান হারানোর আশঙ্কা করলেন এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার ভয়ে দ্রুত নামায শেষ করে দিলেন। এরপর সঙ্গীকে জাগালেন এবং বললেন, আজ যদি দায়িত্ব পালনে অবহেলার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি তীরের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতাম। কিন্তু সূরা কাহাফ পূর্ণ না করে নামায শেষ করতাম না।
তাদের গায়ে তীর বিদ্ধ হত। আর আজ আমাদের সম্মুখ দিয়ে যদি মাছিও উড়ে যায় অথবা গায়ে একটি মশা বসে, তাহলে আমাদের নামায তামাশা হয়ে যায়। এ জন্যই আমরা কুরআনে কারীমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু একবার যদি স্বাদের সন্ধান পাই, তখন কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করার অবস্থা বদলে যাবে। (আল্লাহু আকবার কাবীরা!)

শাইখাইনের তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন পড়া

সাহাবায়ে কিরাম তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করে স্বাদ আর মজা লাভ করতেন। একবারের ঘটনা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর রাতে মসজিদে নববীতে আগমন করলেন। দেখলেন [illegible]ত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাহাজ্জুদ নামাযে মৃদু আওয়াজে কুরআন [illegible]াওয়াত করছেন। পাশেই সাইয়্যিদিনা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.ও

তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন উভয়ের নামায শেষ হল, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর! তুমি এমন ক্ষীণ কণ্ঠে কেন তিলাওয়াত করছিলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঐ সত্তাকে আমার তিলাওয়াত শুনাচ্ছিলাম যিনি অন্তর্জামী, আমার অন্তরের অন্তস্থলের কথাও জানেন।

অতএব উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করার প্রয়োজন মনে করিনি।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, উমর! তুমি এত উঁচু আওয়াজে কেন তিলাওয়াত করছিলে?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি ঘুমন্তদেরকে জাগাচ্ছিলাম। আর শয়তানকে ভাগাচ্ছিলাম। তারা ছিলেন আল্লাহর এমন সব বান্দা, যারা কুরআন তিলাওয়াতে অবর্ণনীয় স্বাদ অনুভব করতেন।

ফিরিশতাও আকাশ থেকে নেমে আসলেন

ছোট আঙ্গিনা, এক পাশে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট শিশু, তার নিকটেই বাঁধা রয়েছে একটি ঘোড়া, সাহাবী বলেন অপর পার্শ্বে আমি তাহাজ্জুদ পড়ছিলাম। মন চাচ্ছিল উঁচু আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করি, কিন্তু ঘোড়া লাফিয়ে উঠে। আশঙ্কা হয় ছোট্ট শিশুর না জানি কোন ক্ষতি হয়ে যায়। আবার স্বর নিচু করে ফেলি। মন অস্থির হয়ে উঠে। আওয়াজ আবার উঁচু হয়ে যায়। ভয় পেয়ে ঘোড়া লাফিয়ে উঠে। এভাবেই কেটে যায় রাত। সকালে দু'আর জন্য যখন হাত তুলি, দেখি আলোর মত কি যেন আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। অবাক হয়ে যাই, দিনের বেলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে আরয করি, হে আল্লাহর হাবীব! আমি রাত্রি বেলা দেখলাম, কিছু আলো আমার মাথার উপর থেকে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, বস্তুত: তারা ছিলেন আল্লাহর ফিরিশতা। কুরআন শ্রবণ করার জন্য তারা আরশ থেকে ফরশের উপর নেমে এসেছিলেন।

তুমি যদি কুরআনে কারীম উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে, তাহলে আজ মদীনার মানুষ স্বচক্ষে ফিরিশতা দেখতে পেত।

তোমার কান্নায় ফিরিশতাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে

একজন সাহাবী কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, আর কাঁদছিলেন। সে কি কান্না! যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত

হলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গত রাতে তোমার কান্নায় ফিরিশতাদের মধ্যেও ক্রন্দনরোল পড়ে গিয়েছিল।

তারা কেমন ছিলেন? কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কাঁদতে থাকতেন তাদের কান্না দেখে ফিরিশতাদের মধ্যেও কান্নার রোল পড়ে যেত।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন সুন্দর আওয়াজে একাগ্রচিত্তে এবং দরদ ভরে কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে, তখন আল্লাহ তা'আলার ফিরিশতা গণ তিলাওয়াতকারীর এত নিকটবর্তী হয়ে যান যে, ফিরিশতা তিলাওয়াতকারীর ঠোঁটে তার ঠোঁট এবং মুখে তার মুখ লাগিয়ে দেন এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার তিলাওয়াত এমন মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন যে, দুনিয়ার মানুষ কোন গায়িকার গানও এমন মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে না।

তার মুখ থেকে সুগন্ধ ছড়ায়

প্রসিদ্ধ ক্বারী ইমাম আসিম র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার মুখ থেকে সুগন্ধ ছড়াত। মসজিদে নববীতে তিনি সত্তর বছর ইমামতি করেছেন। তার অগণিত শিষ্য ছিল। তার মুখ থেকে সর্বদা সুবাস ছড়াত।

একদিন এক শিষ্য তাকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি কি আপনার মুখে কোন সুগন্ধি জাতীয় বস্তু রাখেন। তিনি বললেন, না। আমি তো সুগন্ধি জাতীয় বিশেষ কোন কিছু আমার মুখে রাখি না। শিষ্য বলল, হযরত! আপনার মুখ থেকে অনেক বেশী ঘ্রাণ বের হয়। ইমাম আসিম র. বললেন, এক রাতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত আমার নসীব হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আসিম! তুমি আল্লাহর কুরআন এমন মহব্বতের সাথে পড়, মনে চায় আমি তোমার মুখে চুম্বন করি। এই বলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মুখে চুম্বন করলেন। সেই থেকে আমার মুখ দিয়ে সৌরভ ছড়াতে থাকে।

যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, তার মুখে এই সুঘ্রাণ অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালাম কুরআনে কারীমের আশ্চর্যজনক তাছীর রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম রা. কুরআন পাঠ করতেন, শ্রবণ করতেন, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুর ঢল নামত, শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যেত। (আল্লাহু আকবার!)

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ.

'আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখে অশ্রুর ঢল দেখতে পাবেন। কারণ, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে।'

-মাইদাহ : ৮৩

কুরআন তিলাওয়াত শুনে তারা অঝোরে কাঁদতেন আর বলতেন-

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। আমাদের কি ওজর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের অন্তর্ভূক্ত করবেন।' -মাইদাহ

এমন বিনয়ের সাথে যখন তারা দু'আ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'আ কবুল হয়ে যেত। ইরশাদ হচ্ছে-

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا.

'অত:পর তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আর প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দিবেন যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।'

সত্যিই কুরআন একটি আশ্চর্য নেয়ামত। এ নেয়ামতের সঠিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা-ই নেই। এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কি কি নেয়ামত রেখেছেন তাও আমাদের অজানা।

অতএব এ কুরআন মহব্বত আর ভালবাসার সাথে তিলাওয়াত করুন, আগ্রহের সাথে পড়ুন। দেখবেন, এর তাসীর কি? স্বাদ কি? কুরআনের স্বাদ তো এমন যা কখনো শেষ হয় না, মন কখনো ভরে না।

এমন কিছু বস্তু যা দ্বারা মন কখনো ভরে না

উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কিছু জিনিস এমন রয়েছে যার দ্বারা মানুষের হৃদয় কখনো ভরে না। যেমন আকাশ। সারা জীবন মানুষ আকাশ দেখে, কিন্তু কখনো বলে না ভাই! আমার মন ভরে গেছে, আর দেখব না। প্রতিদিন আকাশের ঝলমলে তারকাগুলো দেখুন, আপনার কাছে নতুন মনে হবে। একেক দিন একেক রকম আনন্দ অনুভূত হবে।

পানি। পানি পান করে কখনো মন ভরে না। শত বছর বয়স হয়েছে, তারপরও এমন কোন মানুষ আপনি পাবেন না, যে বলবে, এখন আর পানি পান করার আগ্রহ হয় না। বিশেষ কোন খাবার থেকে তো মন উঠে যায়, কোন জুস খেতে আর মনে চায় না, কিন্তু পানি থেকে কখনই মন উঠে না। তদ্রূপ বাইতুল্লাহ শরীফ এমন এক নেয়ামত। এটি যে কতবড় নেয়ামত তা অনুধাবন করতে সক্ষম ঐ ব্যক্তি, যে একবার অন্তত বাইতুল্লাহ শরীফ দেখেছেন। এ ঘরটি দেখার দ্বারা অন্তরে যে কি প্রশান্তি অনুভূত হয়, (আল্লাহু আকবার!) কালো গেলাফে ঢাকা ঘরটিকে যতই দেখা হয়, তার সৌন্দর্য, স্বাদ যেন আরো বেড়ে যায়, প্রতিবারই মনে হয় আমি এই প্রথম দেখছি, দেখার স্বাদ ফুরায় না। কারণ এ যে আমার আল্লাহর ঘর। চোখও ফেরে না, মনও ভরে না।

তদ্রূপ একটি বস্তু হচ্ছে কুরআনে পাক তিলাওয়াত। কুরআন যতই তিলাওয়াত করা হয়, তার স্বাদ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। হাফিজ এবং ক্বারীদের জীবনী যখন আমরা পড়ি, তখন অবাক হই যে, তারা কত লক্ষ কোটি বার কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। এ কুরআন যতই তিলাওয়াত করুন, ততই আগ্রহ বাড়তে থাকবে। স্বাদ বাড়তে থাকবে, এ স্বাদ কখনই মিটবে না, কখনই কমবে না।

প্রাণের ভাইয়েরা আমার! এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, আমরা এ কিতাবটি পড়ব, আমল করব এবং দুনিয়া-আখিরাতে এর দ্বারা সফলকাম হব।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا

'আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের মাধ্যমে অনেককে সম্মানিত করেন' এ কুরআন পৃথিবীতে এসেছে আমাদেরকে সম্মানিত করার জন্য, ঘুমন্তকে জাগ্রত করার জন্য, অপদস্থকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করার জন্য।

রাখাল থেকে আমীরুল মু'মিনীন

সাইয়্যিদিনা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. তার শাসনামলে একবার মুজাহিদদের একটি দল নিয়ে ভর দুপুরে মক্কার কোন এক পাহাড়ে উঠছিলেন। প্রচন্ড রোদ ছিল, হঠাৎ তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সম্মুখে বিস্তৃত উপত্যকায় চোখ বুলাতে লাগলেন। পিছনে গোটা

সেনাদলও দাঁড়িয়ে। সকলেই ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। কোথাও ছায়ার চিহ্নও নেই। প্রখর রোদের উত্তাপ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নেই। সকলেই অস্থির।

আমীরুল মু'মিনীনকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি ভাল আছেন তো! এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে? তিনি বললেন, আমি পাহাড়ের পাদদেশে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেখানে আমি উট চরাতাম। ছোটবেলায় উট চরানোর কায়দা আমার জানা ছিল না। তাই আমার উটগুলো সন্ধ্যা বেলা খালি পেটে ঘরে ফিরত। এজন্য আমার পিতা খাত্তাব আমাকে বকা-বকি করতেন। বলতেন, ওমর! তুমি জীবনে কি করবে? তুমি তো উটও চরাতে পার না। ঐ সময়ের কথা আমি স্মরণ করছি। যখন আমি ওমরের উট চরানোর কায়দা-কানুন পর্যন্ত জানা ছিল না। আর আজ আমি দেখছি, ইসলাম এবং আল-কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমি ওমরকে আমীরুল মু'মিনীন বানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর এই মহান কিতাব মানুষকে এভাবেই উঁচুতে উঠান। আমরাও যদি এ কুরআন তিলাওয়াত করি এবং তদানুযায়ী আমল করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও পৃথিবীর বুকে সম্মান-মর্যাদা দান করবেন। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

'পড় তুমি কুরআন, তোমার রব করবেন তোমার ইকরাম।' তোমার রব তোমাকে ইয্যত দিবেন, সম্মান দিবেন, তোমার ভিতর-বাহিরকে সুন্দর করে দিবেন। এর নাম হচ্ছে কুরআন।

আমার শায়খ হযরত মাওলানা গোলাম হাবীব নাক্শবন্দী র. বলতেন

তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি পেরেশান!
তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি না-কাম!
তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি থাকবে গোলাম!
না, না, বলছে আমাদের এ কুরআন,
আমাকে বিশ্বাসকারীরা হচ্ছে মুসলমান।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

'পড় তুমি কুরআন, তোমার রব করবেন তোমার ইকরাম।'

আমরা যদি এ মহান কিতাবখানা পাঠ করি এবং তদানুযায়ী আমল করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে সম্মানিত করবেন।

পানি। পানি পান করে কখনো মন ভরে না। শত বছর বয়স হয়েছে, তারপরও এমন কোন মানুষ আপনি পাবেন না, যে বলবে, এখন আর পানি পান করার আগ্রহ হয় না। বিশেষ কোন খাবার থেকে তো মন উঠে যায়, কোন জুস খেতে আর মনে চায় না, কিন্তু পানি থেকে কখনই মন উঠে না। তদ্রূপ বাইতুল্লাহ শরীফ এমন এক নেয়ামত। এটি যে কতবড় নেয়ামত তা অনুধাবন করতে সক্ষম ঐ ব্যক্তি, যে একবার অন্তত বাইতুল্লাহ শরীফ দেখেছেন। এ ঘরটি দেখার দ্বারা অন্তরে যে কি প্রশান্তি অনুভূত হয়, (আল্লাহু আকবার!) কালো গেলাফে ঢাকা ঘরটিকে যতই দেখা হয়, তার সৌন্দর্য, স্বাদ যেন আরো বেড়ে যায়, প্রতিবারই মনে হয় আমি এই প্রথম দেখছি, দেখার স্বাদ ফুরায় না। কারণ এ যে আমার আল্লাহর ঘর। চোখও ফেরে না, মনও ভরে না।

তদ্রূপ একটি বস্তু হচ্ছে কুরআনে পাক তিলাওয়াত। কুরআন যতই তিলাওয়াত করা হয়, তার স্বাদ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। হাফিজ এবং ক্বারীদের জীবনী যখন আমরা পড়ি, তখন অবাক হই যে, তারা কত লক্ষ কোটি বার কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। এ কুরআন যতই তিলাওয়াত করুন, ততই আগ্রহ বাড়তে থাকবে। স্বাদ বাড়তে থাকবে, এ স্বাদ কখনই মিটবে না, কখনই কমবে না।

প্রাণের ভাইয়েরা আমার! এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, আমরা এ কিতাবটি পড়ব, আমল করব এবং দুনিয়া-আখিরাতে এর দ্বারা সফলকাম হব।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا

'আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের মাধ্যমে অনেককে সম্মানিত করেন' এ কুরআন পৃথিবীতে এসেছে আমাদেরকে সম্মানিত করার জন্য, ঘুমন্তকে জাগ্রত করার জন্য, অপদস্থকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করার জন্য।

রাখাল থেকে আমীরুল মু'মিনীন

সাইয়্যিদিনা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. তার শাসনামলে একবার মুজাহিদদের একটি দল নিয়ে ভর দুপুরে মক্কার কোন এক পাহাড়ে উঠছিলেন। প্রচন্ড রোদ ছিল, হঠাৎ তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সম্মুখে বিস্তৃত উপত্যকায় চোখ বুলাতে লাগলেন। পিছনে গোটা

সেনাদলও দাঁড়িয়ে। সকলেই ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। কোথাও ছায়ার চিহ্নও নেই। প্রখর রোদের উত্তাপ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নেই। সকলেই অস্থির।

আমীরুল মু'মিনীনকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি ভাল আছেন তো! এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে? তিনি বললেন, আমি পাহাড়ের পাদদেশে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেখানে আমি উট চরাতাম। ছোটবেলায় উট চরানোর কায়দা আমার জানা ছিল না। তাই আমার উটগুলো সন্ধ্যা বেলা খালি পেটে ঘরে ফিরত। এজন্য আমার পিতা খাত্তাব আমাকে বকা-বকি করতেন। বলতেন, ওমর! তুমি জীবনে কি করবে? তুমি তো উটও চরাতে পার না। ঐ সময়ের কথা আমি স্মরণ করছি। যখন আমি ওমরের উট চরানোর কায়দা-কানুন পর্যন্ত জানা ছিল না। আর আজ আমি দেখছি, ইসলাম এবং আল-কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমি ওমরকে আমীরুল মু'মিনীন বানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর এই মহান কিতাব মানুষকে এভাবেই উঁচুতে উঠান। আমরাও যদি এ কুরআন তিলাওয়াত করি এবং তদানুযায়ী আমল করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও পৃথিবীর বুকে সম্মান-মর্যাদা দান করবেন। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

'পড় তুমি কুরআন, তোমার রব করবেন তোমার ইকরাম।' তোমার রব তোমাকে ইয্যত দিবেন, সম্মান দিবেন, তোমার ভিতর-বাহিরকে সুন্দর করে দিবেন। এর নাম হচ্ছে কুরআন।

আমার শায়খ হযরত মাওলানা গোলাম হাবীব নাক্শবন্দী র. বলতেন

তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি পেরেশান!
তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি না-কাম!
তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি থাকবে গোলাম!
না, না, বলছে আমাদের এ কুরআন,
আমাকে বিশ্বাসকারীরা হচ্ছে মুসলমান।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

'পড় তুমি কুরআন, তোমার রব করবেন তোমার ইকরাম।'

আমরা যদি এ মহান কিতাবখানা পাঠ করি এবং তদানুযায়ী আমল করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে সম্মানিত করবেন।

সাহাবায়ে কিরাম রা. এ কিতাবকে তাদের বুকের সাথে লাগিয়েছিলেন। তাঁরা এত সাদাসিধে ছিলেন যে, তাদের সম্মুখে পাতলা রুটি রাখা হলে, তারা সেটাকে কাপড় মনে করে হাত মুছতে উদ্ধত হতেন। এত সাদাসিধে ছিলেন তারা।

وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا ÷ بن گئے دنیا کے تقدیر بدل نے والے

কর্পূরকে যারা নিমক ভেবে
বাড়িয়ে দিতেন হাত,
তাদের দাপটে কাঁপত পৃথিবী
সকল কাফির জাত।

অথচ ইতিহাসের পাতাগুলো তাদের সাফল্য গাঁথায় ভরে রয়েছে। তারা পৃথিবীর মানচিত্র পর্যন্ত বদলে দিয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সফলকাম করেছিলেন যে

لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ÷ حکم دیتا تھا تو دریا ان کو راستہ چھوڑ دیتا تھا

যত দুর্গ-বুর্জ হত চূর্ণ-বিচূর্ণ
তাদের তাকবীর ধ্বনিতে,
বিক্ষুব্ধ উর্মিমালা সম্বিত হারাত
তাদের ইশারাতে।

আমাদের পূর্বসূরীরা এ কুরআনে কারীমের মাধ্যমেই সম্মান লাভ করেছিলেন। আসুন, আমরা অঙ্গীকার করি আমাদের পরবর্তী জীবন এ কুরআনের উপর আমল করে কাটিয়ে দিব। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনকে, কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিব।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

'নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে ঐ ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অত:পর নামায আদায় করে।'

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

কথার ঝুড়ি ফেলে এবার
দিলের লাগাম ধর,
কামেল পীরের অধীন হয়ে
পিষ্ট তোমায় কর।
কিতাব-খাতা বইয়ের পাতা
সব জ্বালিয়ে দাও,
দিলের চাবি আল্লাহ্ তা'আলার
হাতে তুলে দাও।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

وقال تعالى : وَمَا سَوّٰاهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

وقال تعالى : وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرِ.

وقال تعالى : فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

وقال تعالى : وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

সাহচর্যের আছর

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ বিপরীতমুখী দু'টি বৈশিষ্ট্য রাখা হয়েছে। আদেশ করা হয়েছে যেন ভাল বৈশিষ্ট্যকেই প্রবল রাখা হয়। পৃথিবীর একজন অন্যতম ভাল মানুষও যদি মন্দ পরিবেশ কিংবা অসৎ সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে, তাহলে তারও নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। তদ্রূপ দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মানুষও যদি ভাল পরিবেশ, ভাল সঙ্গী পায়, তাহলে তারও ভাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আসলে মানুষ সাহচর্য দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আপনি দেখে থাকবেন, অনেক মানুষ ছোট শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করে শিশুর ভাষায় কথা বলে, অথচ বয়স্ক এ লোকটি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা জানে, কিন্তু শিশুর সাহচর্যের প্রভাবে সে শিশুর মত করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কথা বলে।

প্রিয় বন্ধুরা আমার! ছোট শিশুর সাহচর্যে যদি এই প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে কোন বড় আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্য মানুষের জীবনে কেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে?

দৃষ্টি দ্বারা চিকিৎসা

হাদীস শরীফে এসেছে,

الْعَيْنُ حَقٌّ

নযর লাগা বাস্তব সত্য।

একজন সাহাবী এর দ্বারা আক্রান্তও হয়েছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ নযরের আছর দূর করার পন্থাও বলে দিয়েছেন। ভাবনার বিষয় হল; যে দৃষ্টিতে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্ষোভ ইত্যাদি রয়েছে, ঐ দৃষ্টি যদি আছর করে, তাহলে যে দৃষ্টিতে মমতা, ভালবাসা, কল্যাণ-কামিতা, সহমর্মিতা, নিষ্ঠা ইত্যাদি রয়েছে, তা কেন আছর করবে না?

সুতরাং আল্লাহ ওয়ালাদের চোখও লেগে যায়। বস্তুত: মন্দ দৃষ্টির প্রভাব মন্দ হয়ে থাকে, আর নেক দৃষ্টির প্রভাব ভাল হয়ে থাকে। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমাদের উপর কোন বুজুর্গের নেক দৃষ্টি যেন পড়ে যায়।

তোমার চিকিৎসা দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে

বর্তমানে আলো দ্বারা চিকিৎসা হচ্ছে। টিবি, ক্যান্সার এমন আরো অনেক রোগের চিকিৎসা আলো দিয়ে করা হচ্ছে। এক্সরে মেশিনের যেমন আলো রয়েছে, আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতেও আলো রয়েছে। আমরা কেউ এক্সরে

তো দেখি না, কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নেই। তেমনই আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতেও নূর বা আলো রয়েছে, যা মানুষের অন্তরের অন্ধকারকে বিদূরিত করে। প্রমাণ হচ্ছে, মানুষের অন্তরে নেক আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শুষ্ক গাছে পানি দিলে যেমন কলি ধরে, ফুল ফোটে, গাফেল, উদাসী কোন মানুষ আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে বসা আরম্ভ করলে তাদের হৃদয় বাগানেও নেক আমলের ফুল ফোটা শুরু হয়ে যায়।

তাছফিয়া ও তাযকিয়া এর মধ্যে পার্থক্য

তাছাউ-উফ শাস্ত্রে দু'টি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা উলামায়ে কিরামও যার সঠিক মর্ম অনুধাবনে ভ্রান্তির শিকার হন।

১. তাছফিয়া

২. তাযকিয়া

তাছফিয়া সর্বদা অন্তরের হয়ে থাকে। আর তাযকিয়া বলা হয় নফস তথা প্রবৃত্তির পরিচ্ছন্নতাকে। এ দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি তা বুঝার জন্য এ উদাহরণটি দেখুন। যেমন একটি আয়না, যার উপর ধুলা-বালির আবরণ পড়ে আছে। ধুলার এ আবরণ পরিষ্কার করাকে তাছফিয়া বলে। আয়নার উপর জমে থাকা ময়লা যেমন আয়নার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। অদ্রূপ গুনাহের ময়লাও দিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না; বরং দিলের উপর একটি আবরণ তৈরি করে। প্রমাণ হচ্ছে কুরআনে কারীমের এ আয়াত-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'না বরং মন্দ কর্মের ফলে তাদের অন্তরের উপর মরিচা পড়ে গেছে।'

মরিচা তো ভিতরে প্রবেশ করে না, উপরেই থাকে। বুঝা গেল গুনাহের ময়লাও দিলের উপরে জমে থাকে, ভিতরে প্রবেশ করে না।

আর বর্ণিত আছে,

لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ

প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার বিশেষ উপকরণ রয়েছে, আর অন্তর পরিষ্কার করার উপকরণ হল আল্লাহর যিকির। এ যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের ময়লা পরিস্কার করাকেই তাছফিয়াতুল কলব বলা হয়।

পক্ষান্তরে কাপড় ময়লা হলে সাবান-পানির প্রয়োজন হয়। কাপড় পরিষ্কার [illegible] এই যে পদ্ধতি প্রথমে সাবান লাগানো, অত:পর পানি দ্বারা ধৌত [illegible] এরপর নিংড়ানো, একে তাযকিয়া বলে। এ পদ্ধতিতে কাপড়

পরিষ্কার করা হলে বলা হবে কাপড়ের তাযকিয়া হয়েছে। কেননা ময়লা কাপড়ের ভিতরে ঢুকে যায়, সাবান পানি দিয়ে তার ভিতর থেকে ময়লা বের করা হয়। তদ্রূপ মানুষের দিলের অভ্যন্তরেও সৃষ্টিগতভাবে ময়লা আবর্জনা রয়েছে, কু-মন্ত্রণাদানকারী নফস রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا

তার ভিতরে ভালও রয়েছে, মন্দও রয়েছে। এখন কর্তব্য হল, দিলের অভ্যন্তরীণ মন্দকে বের করে দেয়া। যেন দিলে শুধুমাত্র ভাল জিনিসগুলো থেকে যায়।

তাযকিয়ার মর্ম কথা এটাই। এ উদ্দেশ্যেই নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে মুআল্লিমে আ'যম তথা প্রধান শিক্ষক, মুবাল্লিগে আ'যম তথা প্রধান ধর্মপ্রচারক, এবং মুরশিদে আ'যম তথা প্রধান পথপ্রদর্শকরূপে আগমন করেছেন। তারা মানুষের তাযকিয়া করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. এর অন্তরগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

মোদ্দাকথা, তাছফিয়া হল দিলের উপর জমে থাকা গুনাহের ময়লা পরিষ্কার করা। আর তাযকিয়া হল দিলের অভ্যন্তরে থাকা গুনাহের উৎস মূল তথা মানুষের মন্দ স্বভাবগুলোর এছলাহ করা, যেন তার দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত-ই না হয়। এক কথায় গুনাহের মূল উৎপাটন করা।

তাযকিয়ার গুরুত্ব

তাযকিয়া এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে, হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর ঘর নির্মাণ শেষে দু'আ করলেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا

হে আল্লাহ! ঘর তো নির্মাণ করলাম, এখন এ ঘরকে আবাদকারী আপনিই প্রেরণ করুন। যেমন মাদরাসা তো প্রতিষ্ঠা করেছি, এখন পরিচালনাকারী একজন মুহতামিম পাঠিয়ে দিন। ইবাদত খানা তো তৈরি হয়েছে, এখন ইবাদত শিক্ষাদানকারী একজন রাসূল আপনি প্রেরণ করুন।

আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন। আর কেনইবা করবেন না, দু'আকারী হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ., তার সাহায্যকারী হলেন হযরত ইসমাঈল যবীহুল্লাহ আ.। যে ঘরটি তারা নির্মাণ করেছেন তার নাম হল বাইতুল্লাহ। যে সত্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি হলেন

আল্লাহ। আর যার জন্য দু'আ করলেন, তিনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, আমি আমার দাদা হযরত ইবরাহীম আ. এর দু'আর ফসল। যাহোক, হযরত ইবরাহীম আ. এর দু'আর ফলশ্রুতিতে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরার বুকে আগমন করলেন, কিন্তু দু'আকারী যে উদ্দেশ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করার দরখাস্ত করেছিলেন, সে উদ্দেশ্যগুলো ছিল এই-

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَوَيُزَكِّيْهِمْ

'তিনি তাদের সম্মুখে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের তাযকিয়া করবেন।' -আল-ইমরান

অর্থাৎ দু'আকারী তাযকিয়াকে চতুর্থ উদ্দেশ্য রূপে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন, তখন এ চার উদ্দেশ্যের কথাই বলেছেন, কিন্তু বর্ণনাধারায় ব্যতিক্রম করে তাযকিয়াকে দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করলেন।

যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে আমার খলীল ইবরাহীম! এ তাযকিয়া এত গুরুত্বপূর্ণ যে, একে চতুর্থ নম্বরে না রেখে দ্বিতীয় নম্বরেই রাখা উচিত। ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ.

'ঐ সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন।' এ উদ্দেশ্যে যে,

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

রাসূল তাদের সম্মুখে আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং তাদের তাযকিয়া করবেন।

দেখা গেল দু'আকারী হযরত ইবরাহীম আ. তাযকিয়াকে চতুর্থ স্থানে রেখেছেন। আর দু'আ কবুলকারী আল্লাহ তা'আলা তাযকিয়াকে দ্বিতীয় স্থানে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তাযকিয়ার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়।

তাযকিয়া ব্যতীত যেহেতু وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (ইলম ও হিকমত) কোন কাজেই আসে না। এ জন্য প্রথমে তাযকিয়ার কথা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, হে পাঠদানকারী শিক্ষকগণ! এবং শরীয়তের

বিধান বাস্তবায়নে সচেষ্টরা শুন! প্রথমে তোমাদেরকে তাযকিয়ার আগুনে দগ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধ হতে হবে। অত:পর তোমরা সফলকাম হবে। তোমাদের শ্রম সার্থক হবে। অন্যথায় ইখলাছ না থাকার কারণে তোমরা দ্বীনের নামে দুনিয়া করবে। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবে এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথেও প্রতারণা করবে। এ জন্য তাযকিয়ার আলোচনা আগে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাযকিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

তাযকিয়ার পদ্ধতি দু'টি

প্রথম পদ্ধতি

একটি পদ্ধতি তো হল, মানুষ কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক গড়বে, তার নির্দেশ অনুযায়ী ওযীফা ইত্যাদির উপর আমল করবে এবং তার দেখানো পদ্ধতিতে জীবন যাপন করবে। যেন অন্তরের আবর্জনাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। ভিতরকার রোগগুলো ভাল হয়ে যায়। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। স্থায়ী সফলতা লাভ করে। ইরশাদ হচ্ছে-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

'নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে ঐ ব্যক্তি যে তাযকিয়া করেছে।'

এটা তাযকিয়ার প্রথম পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

কোন মানুষ যদি প্রথম পদ্ধতিতে উল্লেখিত কাজগুলো না করে, বরং পাপাচারে লিপ্ত থাকে, আর এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু রহীম, কারীম তাই তার জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন। দুনিয়ায় তাযকিয়া না করা বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাযকিয়ার হসপিটাল বানিয়ে রেখেছেন। দুনিয়াতে অসুস্থ মানুষের জন্য যেমন হাসপাতাল থাকে। অর্থাৎ যারা তাদের গৃহে আপন সুস্থতার প্রতি যত্নবান ছিল না, তাদেরকে যেমন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হয়, তদ্রূপ যে সব লোক স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক করে নিজেদের তাযকিয়া করেনি। এখন তাকে তাযকিয়ার হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হবে। তার হাসপাতালের নাম হচ্ছে কবর-জাহান্নাম। সেখানেও তাযকিয়া হবে।

আমি সত্য কথা অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে বর্ণনা করছি। কুরআনে কারীমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, কিয়ামতের দিন কিছু লোকের

রোগ এত ভয়ানক হবে যে, তাযকিয়ার হাসপাতালেও তাদের চিকিৎস হবে না। যেমন ক্যান্সার বা এইড্স রোগ। দুনিয়ার হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোতে এর কোন চিকিৎসা নেই। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা আত্মার রোগীদের জন্য যে হাসপাতাল বানিয়েছেন, ঐ হাসপাতালে কুফর, শিরক এবং নিফাকের চিকিৎসা নেই। এগুলো দুনিয়ার এইড্স এবং ক্যান্সারের মত। এ আত্মিক রোগগুলো ব্যতীত সব রোগের চিকিৎসা জাহান্নাম নামক হাসপাতালে হয়ে যাবে।

ইরশাদ হয়েছে, তারা হচ্ছে ঐ সব লোক

لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ.

'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথাও বলবেন না এবং তাদের তাযকিয়াও করবেন না।'

দুনিয়ার নিয়ম

দুনিয়ার নিয়ম হল, যদি কারো দেশে কেউ আসতে চায়, তাহলে তারা শর্ত আরোপ করে যে, আপনি আপনার স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট দেখান। আফ্রিকানরা যে দেশেই যেতে চান, তাদের কাছে (Yellow fever) ইয়েলো ফিভার সার্টিফিকেট চাওয়া হয়। এটা তাদের অধিকার। তাদের উদ্দেশ্য হল, ভিন দেশী কোন রোগী যেন তার দেশে প্রবেশ না করে। আপনি যদি হজ্বে যেতে চান, তাহলে তারা কলেরা সার্টিফিকেট চাবে। যারাই হজ্বে যান, এ সব সার্টিফিকেট দেখিয়েই যান। যদি সার্টিফিকেটে রোগ ধরা পরে, তাহলে তারা বলে দেয় যে, আমাদের দেশে আসার অনুমতি আপনার নেই। আমাদের দেশে যদি আপনাকে আসতেই হয়, তাহলে এ সব রোগ থেকে সুস্থ হয়ে আসুন।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিছু নীতিমালা তৈরী করে দিয়েছেন। জান্নাত হল বিশেষ মানুষের আবাসস্থল। এখানে প্রবেশ করতে হলে তোমাদেরকে বেশ কিছু রোগ থেকে মুক্ত হয়ে আসতে হবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى

জান্নাত হচ্ছে প্রতিদান ঐ সব বান্দাদের জন্য যারা তাযকিয়া করেছেন, দিলকে ময়লা আবর্জনা মুক্ত করেছেন, পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছেন। এমন

লোকেরাই শুধু জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করবেন। আর যাদের তাযকিয়া হয়নি, তারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে না।

জান্নাতে যাওয়ার দু'টি পথ

প্রিয় বন্ধুরা আমার! বুঝা গেল জান্নাতে যাওয়ার পথ হল দু'টি। একটি পথ হল- দুনিয়ায় থাকাবস্থায় মানুষ সকল প্রকার গুনাহ থেকে তওবা করবে এবং নেক জীবন যাপন করে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। এটি হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।

আর যদি দুনিয়ার জীবনে গাফলতে ডুবে থাকে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে যাওয়ার পথে একটি হসপিটাল বানিয়ে রেখেছেন।

উদ্দেশ্য হল, তোমরা তো আমারই বান্দা। কালিমা পড়েছ। আমি তোমাদের জন্য আরেকটি সুযোগ রেখেছি। আর তা হল কবর থেকে বের হয়ে তোমরা জাহান্নামে যাবে। কিছু দিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করে রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার পর তোমাকে জাহান্নাম তথা হাসপাতাল থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে বিষয়টির ব্যাখ্যা হল এই– যখন কোন মানুষ অসুস্থ হয় এবং তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়, হাসপাতালে একটি ইমার্জেন্সী রুম আছে। রোগীকে সর্ব প্রথম এই ইমার্জেন্সী রুমে আনা হয়। সেখানে বিশেষ ডাক্তাররা রয়েছেন, তারা রোগী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। অর্থাৎ বড় ডাক্তার আসা পর্যন্ত তারা কিছু চিকিৎসা দেন। অনুরূপ কবর হচ্ছে মানুষের জন্য হাসপাতালের ইমার্জেন্সী রুম।

মানুষ যখন এখানে আসবে, আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। তারা এসে জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

مَنْ رَبُّكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ مَا دِيْنُكَ؟

'তোমার রবকে? তোমার ধর্ম কি? তুমি কোন নবীর অনুসারী?

যেমন হাসপাতালে ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন, আপনার কোষ্ঠ কাঠিন্য নেই তো? অমুক অমুক সমস্যা তো নেই? দু' তিনটি প্রশ্ন দ্বারাই তারা অনুমান করে নেন যে, তার আসল সমস্যাটা কি? তদ্রূপ কবরেও মাত্র তিনটি প্রশ্ন

করা হবে, যার দ্বারা তার অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে। যদি সে গুনাহগার হয়, তাহলে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়ে যাবে।

প্রথম ব্যবস্থাটি হচ্ছে কবর সংকীর্ণ হয়ে আসবে, তাকে প্রচন্ড চাপ দেয়া হবে। যেমন ব্যথার রোগীকে চাপ দেয়া হয়। কবরের চাপ কেমন হবে? বর্ণিত আছে যে, এ দিকের হাড় ওদিকে, ওদিকের হাড় এদিকে ঢুকে যাবে। অত:পর কবরকে জাহান্নামের একটি গহ্বরে পরিণত করা হবে। যেমন কিছু রোগী আছে যাদেরকে বিশেষ টেম্পারেচারে (তাপ নিয়ন্ত্রিত রুমে) রাখা হয়।

আর যদি সুস্থ হয় তথা নেককার হয় তাহলে তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেয়া হবে। যেমন সুস্থ লোকেরা ক্লিনিকে আসলে তাদেরকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়েটিং রুমে রাখা হয়। বিমান যাত্রীদেরকে সুসজ্জিত কক্ষ লাউঞ্জে বসানো হয়, বলা হয় তোমরা তো বিমানের যাত্রী; ফ্লাইট প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত তোমরা লাউঞ্জে অপেক্ষা কর। তদ্রূপ নেককারদের জন্য কবরকে লাউঞ্জ বানিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতের একটি বাগানে পরিণত করে দেয়া হবে। তারা কিছু দিন এখানে অবস্থান করবেন। অত:পর আসল ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

আর যদি লোকটি বে-নামাযী হয়ে থাকে, তাহলে তার কবরে একটি ভয়ংকর অজগর সাপ লেলিয়ে দেয়া হবে। হাদীস শরীফে এসেছে- এ অজগরটি তাকে অবিরাম দংশন করতে থাকবে, গোটা শরীরে তার বিষ ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে। হাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যন্ত্রণার কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না।

হসপিটালে যেমন ইঞ্জেকশন, স্যালাইন ইত্যাদির মাধ্যমে রোগীর দেহে ঔষধ পৌঁছানো হয়। কবরেও অজগর সাপ তাকে অবিরাম দংশন করে তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঔষধ পৌঁছে দিবে, বিষ ছড়িয়ে দিবে।

كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ.

'এভাবেই চিকিৎসা (শাস্তি) হবে। আর আখিরাতের চিকিৎসা তো বড়ই ভয়ানক।'

এরপর মহান (প্রধান) ডাক্তার আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। যেমন হাসপাতালে/ক্লিনিকে বড় ডাক্তার সকাল বেলা রোগীর বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে সিদ্ধান্ত দেন যে, তাকে

কোন বিভাগে যেতে হবে। কোন ওয়ার্ডে থাকতে হবে। নরমাল বেডে থাকবে, না আই. সি. ইউ তে যেতে হবে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমল নামা দেখাও। এটি হবে তার বিস্তারিত রিপোর্ট। পিছনের সব রিপোর্টসহ ফাইল বানানো থাকবে। সেই ফাইল আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে পেশ করা হবে।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا.

'আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি অপরাধী-দেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি; সবই এতে রয়েছে।' -কাহ্ফ ৪৯।

রোগীর ফাইলে কিছু ফটো লাগানো থাকে, এক্সেরে লাগানো থাকে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাও জমিনকে আদেশ দিবেন রিপোর্ট পেশ কর-

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا

'সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন।' -যিলযাল ৪-৫

ক্যামরা যেমন ছবি ধারণ করে, আল্লাহর জমিনও একটি ক্যামরা। যা আমাদের ছবিগুলো তুলে রেখেছে। কোথায় কোথায় গুনাহ করেছি, কি কি গুনাহ করেছি, জমিনও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে সব রিপোর্ট পেশ করে দিবে। কম্পিউটারে যেমন হার্ডডিস্ক রয়েছে, যেখানে সব ফাইল সংরক্ষিত থাকে। তদ্রূপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ

'আজ আমি তোমাদের মুখে তো তালা লাগিয়ে দিব।'

কথা বলার কোন প্রয়োজন হবে না, অন্তর নামক হার্ড ডিস্ক

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ

'যা মানুষের বক্ষে রয়েছে' তা বের করে আনা হবে।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

'কিয়ামতের দিন হবে এমন একটি দিন যেদিন সকল রহস্য উন্মোচন করে দেয়া হবে।'

আল্লাহ তা'আলা অন্তর নামক হার্ডডিস্কটি খুলে দিবেন। সব ফাইলগুলো সামনে রেখে বলবেন,

اِقْرَأْ كِتَابَكَ

'এটি হচ্ছে তোমার আমলনামা, তুমি নিজেই নিজের ফাইলগুলো পড়ে নাও।'

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

'আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।' -বনী ইসরাঈল ১৪

তখন বান্দা স্বীকার করবে, হ্যাঁ। আল্লাহ আমি এ সব অন্যায় কাজ করেছি। আমি আত্মার অনেক বড় রোগী। অত:পর তাকে পরকালের হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হবে। ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, তাকে জাহান্নাম নামক হাসপাতালে নিয়ে যাও। ফিরিশতারা তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবেন।

জাহান্নামীদের পোষাক

হাসপাতালে যখন কোন রোগীকে নেয়া হয়, তখন সে যেই হোক, হাসপাতালের পোষাক তাকে পড়তে হয়। তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে হাসপাতালের ইউনিফর্ম পরিয়ে দেয়া হয়। উন্নত হাসপাতালগুলোতে এই হচ্ছে রীতি।

আল্লাহ তা'আলাও জাহান্নামীদের জন্য ইউনিফর্ম বানিয়েছেন।

سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ

তাদেরকে গন্ধকের তৈরী পোষাক পরানো হবে। বড়ই দুর্গন্ধময় পোষাক। উলামায়ে কিরামগণ লিখেছেন, যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখি এক জায়গায় সমবেত হয়ে সকলে একসাথে মৃত্যুবরণ করে এবং সব লাশগুলো পচে গলে যায়। তা সত্ত্বেও এমন দুর্গন্ধ হবে না। যে পরিমাণ দুর্গন্ধ জাহান্নামীদের পোষাকের মধ্যে হবে।

হ্যাঁ জাহান্নামীদেরকে এমন ইউনিফর্মই পরানো হবে। দুনিয়াতে উন্নত আতর, উন্নত সুগন্ধি মানুষ তালাশ করে। পয়জন, ফ্রেজেস সেন্ট ব্যবহার করে, কিন্তু জাহান্নামে এমন পোষাক পরিধান করতে হবে, যার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসবে।

ভাইয়েরা আমার! একটি কুকুরও যদি মরে পরে থাকে, তাহলে ঐ পথ দিয়ে চলাচল করা সম্ভব হয় না। আর যেখানে এত লাশ পরে থাকবে, তার দুর্গন্ধ কি পরিমাণ হবে? জাহান্নামীদের পোষাকের দুর্গন্ধ হবে এর চেয়েও বেশী।

এরপর তাদেরকে বিভিন্ন বিভাগে প্রেরণ করা হবে। কেউ উপরের স্তরে যাবে, কেউ সর্বনিম্ন স্তরে যাবে।

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

'নি:সন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।' -মাইদাহ ১৪৫
মুনাফিক লোকেরা যারা উপরে এক ভিতরে আরেক, যারা দু'মুখো জীবন-যাপন করেছে।
তাদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে। আরে ভাই! চলো তোমাকে বিশেষ বিভাগে যেতে হবে। সেখানে তোমার জন্য উপযুক্ত মেহমানদারীর সুব্যবস্থা রয়েছে।
মোটকথা, গুনাহগারদেরকে শ্রেণীভেদে পৃথক পৃথক স্থানে রেখে শাস্তি দেয়া হবে।

জাহান্নামীর খাবার

ডাক্তার সাহেব রোগীদের জন্য সাধারণ খাবার নিষিদ্ধ করে দেন। হার্টের রোগী হলে তৈলাক্ত খাবার খেতে পারে না। যদি ডায়বেটিক রোগী হয়, তাহলে মিষ্টি জাতীয় খাবার নিষিদ্ধ থাকে। আলসার হলে ঝাল খাবার খাওয়া যায় না।
তদ্রূপ জাহান্নামেও সু-স্বাদু খাবার পরিবেশন করা হবে না। দুনিয়াতে যেমন রোগীদের জন্য বিশেষ খাবার তৈরী করা হয়, জাহান্নামীদের জন্যও স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। দুনিয়াতে যেমন বিভিন্ন প্রকার বড়ি দেয়া হয়, জাহান্নামের বড়ি হল যাক্কুম।

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْأَثِيْمِ

'যাক্কুম বৃক্ষ হচ্ছে পাপিষ্ঠদের খাদ্য।'

يُغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ

যাক্কুম ফলটি হবে কন্টকময় এবং ভয়ানক তিক্ত। মুখের কাছেও নেয়ার মত না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষুধার আতিশয্যে যখন জাহান্নামীরা এগুলোই মুখে পুরবে তখন অবস্থা এই হবে যে, গিলাও যাচ্ছে না, আবার মুখ থেকে বের করাও যাচ্ছে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন!!
কাঁটাদার যাক্কুম খেয়ে তারা পিপাসায় ছটফট করতে থাকবে। চিৎকার করে বলতে থাকবে, পানি পানি।

জাহান্নামীদের পানীয়

তখন জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পানীয় দেয়া হবে। সু-স্বাদু পানি তো এরা দুনিয়াতে পান করেছে। এখন তারা অসুস্থ, রোগী। দুনিয়াতে সর্দি-কাশির রোগীকে সিরাপ দেয়া হয়, যার মধ্যে কিছু তিক্ত সিরাপও রয়েছে। ছোট্ট শিশুদেরকে পান করালে তারা মুখ বিকৃত করে ফেলে। মহিলাদের অবস্থা তো হল তারা রোগ নিয়ে থাকতে রাজি, কিন্তু তিক্ত সিরাপ খেতে রাজি নয়। যখন কারো রক্ত দূষিত হয়ে যায়, তখন তা পরিষ্কার করার জন্য অত্যন্ত তিক্ত সিরাপ দেয়া হয়। জাহান্নামীদেরকেও তিক্ত সরবত দেয়া হবে। যার নাম হবে গিসলীন। গিসলীন সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, জাহান্নামীদের শরীর থেকে যে রক্ত, পূঁজ নির্গত হবে এগুলোকে পাত্রের মধ্যে জমা করে পিপাসার্ত জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ، لَا يَأْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ

'এবং কোন খাদ্য নেই, ক্ষত-নি:সৃত পুঁজ ব্যতীত। গুনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।' -মা'আরিজ ৩৬-৩৭।

তাদেরকে বলা হবে নাও, তিক্ত সরবত পান কর। এগুলোই তোমাদের পানীয়।

একটু ভেবে দেখুন! পূঁজ কি দুর্গন্ধময় জিনিস? নাকের কাছেও নেয়া যায় না, তাকানোও যায় না। তা সত্ত্বেও এগুলোই পান করতে হবে। ফিরিশতা-রা এগুলো পান করতে তাদেরকে বাধ্য করবেন।

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

কিছু লোক এমন রয়েছে যারা যাকাত আদায় করে না। দুনিয়াতে শরীরের বিভিন্ন প্রকার ব্যথার চিকিৎসা গরম পানি দিয়ে করা হয়। যেমন হট ব্যাগ, ব্যথার স্থানে রেখে দেয়া হয়, তদ্রূপ যারা যাকাত দিত না জাহান্নামে তাদেরকেও তাপ দেয়া হবে।

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ এমন লোকদের সব সম্পদ জাহান্নামের আগুনে গলানো হবে।

فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُم

অত:পর সেগুলো দ্বারা তাদের কপালে, وَجُنُوْبُهُمْ তাদের পার্শ্বে, وَظُهُوْرُهُمْ তাদের পিঠে দাগ দেয়া হবে। ইরশাদ হবে

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ

এই হচ্ছে তোমাদের সম্পদ যা তোমরা সঞ্চয় করেছিলে। এখন মজা বুঝ।

বে-পর্দা মহিলাদের শাস্তি

হাদীস শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামে কিছু মহিলা দেখলেন যাদের দেহ এত বড় ছিল যে, তাদের মাথার একেকটি চুল বিরাট বিরাট বৃক্ষের মত। চুলগুলো মাথা থেকে একটি একটি করে উপড়ে ফেলা হচ্ছে। এতে মহিলাগুলোর বর্ণনাতীত কষ্ট হচ্ছে। এ সব মহিলারা কারা, যারা বে-পর্দা মার্কেটে ঘুরাফিরা করত। বেগানা পুরুষদের সামনে পর্দা ছাড়াই আসত। যে কারণে তাদেরকে এমন ভয়ানক শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

মুখ সংযত রাখুন

কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যের মনে কষ্ট দেয়, আবার বলে, আমি তার কলিজা জ্বালিয়ে দিয়েছি। অমুককে কষ্ট দেয়ার জন্য অমুক কাজটি করেছি। এ শ্রেণীর লোকদের জন্যও জাহান্নামে পৃথক একটি স্তর রয়েছে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ اللُّمَزَةِ

ওয়াইল হচ্ছে ঐ শ্রেণীর লোকদের জন্য, যারা পরনিন্দা করত, চোগলখুরী করত। দু' প্রকার রোগ।

এক. মানুষের দোষ ত্রুটি তালাশ করা।

দুই. কারো কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হলে তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।

এই রোগগুলোতে যারা আক্রান্ত, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। জাহান্নামে তাদেরকে স্তম্ভ বা খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন তাদেরকে ঘিরে ধরবে। ইরশাদ হয়েছে-

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ.

'এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে।' -হুমাযা ৬-৭

অর্থাৎ ঐ আগুন শরীর ভেদ করে সরাসরি অন্তর জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে এবং তাকে বলা হবে, তুমি মানুষকে কষ্ট দিতে। আজ অগ্নি দ্বারা তোমার অন্তরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে চিৎকার করবে। হাদীস শরীফে এসেছে, জাহান্নামীরা এত কাঁদবে, এত চিৎকার করবে যে, দূর থেকে মনে হবে কুকুরের দল চিৎকার করছে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের আগুনে এমনভাবে সিদ্ধ হবে, যেমন দুনিয়াতে ফুটন্ত পানির মধ্যে তরি-তরকারি সিদ্ধ করা হয়।

অপকর্মকারীদের শাস্তি

জাহান্নামে আরো একটি স্তর রয়েছে যেখানে অপরাধীকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে থাকবে একটি গহ্বর। গহ্বরের দরজা খুলে পাপিষ্ঠকে ধাক্কা দিয়ে তার মধ্যে ফেলে পিছন থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। বর্ণিত আছে, গর্তের মধ্যে থাকবে বিচ্ছু আর বিচ্ছু। বিচ্ছুগুলো এত বড় হবে যে, তাদের কাঁটার একেকটি গুচ্ছ দুনিয়ার মালসামগ্রীতে বোঝাই উটের সমান হবে। বিচ্ছু গুলো পাপিষ্ঠ বান্দাকে এমন ভাবে ঘিরে ধরবে যেমন মৌমাছি মৌচাককে ঘিরে ধরে এবং সবগুলো বিচ্ছু এক যোগে তাকে দংশন করতে থাকবে।

দুনিয়াতে যেমন রোগীর শিরায় শিরায় ইনজেকশন দেয়া হয়, জাহান্নামেও অপরাধীকে বিচ্ছুর কাঁটা দ্বারা ইনজেকশন দেয়া হবে। এসব অপরাধীরা দুনিয়াতে অশ্লীল কাজ করত, ব্যভিচার করত। তার দেহের প্রতিটি অংশই যেহেতু অন্যায়ভাবে গুনাহের স্বাদ আস্বাদন করত। তাই এখন শরীরের প্রতিটি অংশে প্রতিটি শিরায় উপশিরায় ঔষধ সরবারহ করা হচ্ছে।

মোটকথা, তাযকিয়ার পথ হল দু'টি। একটি হল তওবার দ্বারা সব গুনাহ দুনিয়াতেই মাফ করিয়ে অন্তরকে সাফ সুতরা করে নেয়া। আর দ্বিতীয়টি হল, যদি দুনিয়াতে তওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেয়া না হয়, তাহলে জাহান্নামে যন্ত্রণাদায়ক ভয়ংকর শাস্তি ভোগ করে শুদ্ধ হয়ে জান্নাতের উপযুক্ত হওয়া।

আপনিই বলুন, দুনিয়াতে একটি বিচ্ছুর কামড়ও সহ্য হয় না। যখন হাজার বিচ্ছু এক সঙ্গে দংশন করবে, তখন মানুষের অবস্থা কি হবে?

চিন্তার বিষয়

অতএব এখনই সিদ্ধান্ত নিন। উল্লেখিত দু'টি পথের মধ্যে কোনটি সহজ। অবশ্যই অন্তর জবাব দিবে দুনিয়াতেই আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে থেকে অত্যন্ত সহজে জীবনের সমস্ত গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে নেয়া এবং নেককার অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া। হ্যাঁ, জান্নাত লাভের এটাই সহজ পথ।

প্রিয় বন্ধুরা আমার! পরকালের তাযকিয়া বড়ই কঠিন এবং যন্ত্রণা- দায়ক। মনে রাখবেন তাযকিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাযকিয়া ব্যতীত কোন বান্দাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

وَذَالِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى

'জান্নাত হচ্ছে প্রতিদান ঐ সব লোকের, যারা তাযকিয়া করেছে, পরিচ্ছন্নতা লাভ করেছে।'

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ.

'তোমাদের মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে, তাযকিয়া করে সে নিজের জন্যই করে।'

প্রতিপালকের উপর তার কোন ইহসান বা অনুগ্রহ নেই। এর দ্বারা সে নিজেই রক্ষা পাবে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে।

অতএব আমাদের উচিত তাযকিয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া। এমন যেন না হয় যে, তাযকিয়ার পূর্বেই আমাদের মৃত্যু এসে গেল। অত:পর তাযকিয়ার জন্য আখিরাতের হাসপাতালে আমাদেরকে ভর্তি হতে হল। দুনিয়াতেই, পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভের চেষ্টা করুন, নিজেকে প্রস্তুত করুন সকল প্রকার আত্মিক রোগগুলো দূর করুন। মনে রাখবেন মানুষের আত্মিক রোগ দৈহিক রোগের চেয়েও বেশী জটিল এবং ধ্বংসাত্মক।

উম্মুল মু'মিনীনদেরকে পর্দার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে নবীপত্নীগণ! (তোমরা পর্দা কর।) পর পুরুষের সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলার সময় কোমল কণ্ঠে কথা বলো না।

فَيَطْمَعُ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

'তাহলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা লালায়িত হবে।'

বুঝা গেল, পর নারীকে দেখে অথবা তার কণ্ঠ শুনে লালায়িত হওয়া অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার আলামত।

অতএব একটু ভেবে দেখুন। আমরা যখন মসজিদ থেকে বের হই, তখন আমাদের চোখগুলো কি করে? কোন বেগানা মহিলার দিকে ধাবিত হয়? না হয় না। এর দ্বারাই বুঝা যাবে আমাদের মধ্যে রোগ আছে, কি নেই?

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমাদের অন্তর সাক্ষী যে, আমাদের চোখগুলো শিকারী কুকুরের ন্যায় মহিলাদের দিকে ছুটে যায়। কুকুরের অভ্যাস হল, যখন সে পথ চলে তখন আবর্জনা দেখলেই মুখ লাগায়। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় আমাদের লোলুপ দৃষ্টি নির্বিচারে চারদিক চষে বেড়ায়। এটা কিসের লক্ষণ? এটা হচ্ছে রোগের লক্ষণ।

কিন্তু আমরা সতর্ক হচ্ছি না, এর চিকিৎসার কোন উদ্যোগ নিচ্ছি না। আমাদের কর্তব্য হল, এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সুন্নত মুতাবিক জীবন-যাপন আরম্ভ করা, কোন আল্লাহওয়ালা থেকে যিকিরের সবক নেয়া যেন দুনিয়াতেই সমস্ত আত্মিক রোগগুলো দূর হয়ে যায়, পূর্ণ সুস্থতা লাভ হয়।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আত্মিক রোগসমূহ থেকে নামায দ্বারা, যিকির দ্বারা আরোগ্য লাভ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে-

ذِكْرُ اللّٰهِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ

'আল্লাহর যিকির অন্তরের চিকিৎসা, আত্মিক রোগের প্রতিকার।'

কুরআনে কারীম দ্বারাও শিফা লাভ হয়। ইরশাদ হয়েছে-

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

'এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহকে রোগমুক্ত করে।' -তাওবা : ১৪

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ.

'যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।' -শু'আরা ৮০

شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ.

'এবং অন্তরের রোগের নিরাময়' -ইউনুস : ৫৭

وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। -বনী ইসরাঈল ৮২

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ.

'আপনি বলুন, এটি মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক এবং রোগ নিরাময়কারী।' (সুবহানাল্লাহ!) কুরআনে পাক হচ্ছে আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের প্রেসকিপশন যা আমাদের নাগালেই রয়েছে, কিন্তু আফসোস যে, আমরা তা পাঠ করে উপকৃত হচ্ছি না।

তওবায় বিলম্ব কেন?

সুতরাং আমাদের উচিত মৃত্যুর পূর্বেই তওবা করা। আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্যজনক এক নেয়ামত হল এই তওবা। তওবা এমন এক মহৌষধ, যে বান্দা এ ঔষধটি ব্যবহার করবে, তার সমস্ত রোগ এক মুহূর্তে ভাল হয়ে যাবে। এ জন্যই মস্ত বড় কাফির এবং মুশরিকও যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে এবং কালিমা পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দা হয়ে যায়, তাহলে–

اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

অতীতের সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সে নতুন জীবন লাভ করবে। চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমরা কেমন রোগী। আমাদের অবস্থা তো হল, আমরা আমাদের রোগ সম্পর্কে অবগত, এর পরিণতিও আমরা জানি এবং রোগ মুক্তির মহৌষধ তওবাও আমাদের হাতেই তা সত্ত্বেও আমরা এ তওবার মাধ্যমে নিজের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়ে নিচ্ছি না। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হল সময়ের মূল্যায়ন করা। অপেক্ষায় না থাকা যে, অমুক সময় হলে আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করব। আল্লাহ তা'আলা কেমন আশ্চর্যজনক ভাবে ইরশাদ করেন-

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ.

'যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?' -হাদীদ ১৬

ভাইয়েরা আমার! আমরা কখন নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দিব, কবে আমাদের অনুভূতি জাগ্রত হবে, কত দিন আর চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকব? যদি এভাবেই চলতে থাকি তাহলে কিয়ামতের দিন আমরা অন্ধ

হয়ে উত্থিত হব। সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং এখনই সময় জাগ্রত হওয়ার, তওবা করার।

হযরত মুফতী শফী' সাহেব র. একটি আশ্চর্য কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হল,

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِه

'যেই গুনাহ করবে, তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবেই।'

কারো ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নেই। মুফতী শফী' সাহেব র. বলেন, হ্যাঁ গুনাহগারকে শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তবে শাস্তির পদ্ধতি হল দু'টি।

এক. দুনিয়াতেই অগ্নিদগ্ধ হওয়া।

দুই. আখিরাতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া।

আখিরাতে আগুনে দগ্ধ হাওয়ার বিষয় তো স্পষ্ট, অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়া, আর দুনিয়ার আগুনে দগ্ধ হওয়ার অর্থ কি? মুফতী সাহেব র. বলেন, দুনিয়ার আগুন হচ্ছে অনুশোচনার আগুন, লজ্জার আগুন অর্থাৎ এটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আগুন। তিনি বলেন, যে বান্দা কোন গুনাহ করে অনুশোচনায় দগ্ধ হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে চরম লজ্জিত হবে, اَلنَّدْمُ تَوْبَةٌ এ অনুশোচনা তার জন্য তওবায় পরিণত হবে। এই অনুশোচনার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। জাহান্নামের অগ্নি থেকে তাকে রক্ষা করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাস্তা উন্মুক্ত রেখেছেন। আমরা যদি মহৌষধটি ব্যবহার করি, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাই, আল্লাহ তা'আলা বড়ই করুণাময়, দয়াশীল। যখন কোন বান্দা সত্যিকার অর্থে তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

ক্ষমার এক আশ্চর্য ঘটনা

এখন একটি ঘটনা শুনুন এবং অন্তর দিয়ে শুনুন। কিছু লোক এমন রয়েছে যাদেরকে দেখলে তো মনে হয় খুব শুনছে, কিন্তু বাস্তবে তারা কিছুই শুনে না।

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُوَ لَا يُبْصِرُوْنَ

'হে প্রিয়নবী! আপনার কাছে তো মনে হয় এসব কাফির আপনাকে দেখছে, কিন্তু বাস্তবে তারা আপনাকে দেখে না।'

কেননা তাদের দৃষ্টিশক্তিই নেই। সুতরাং কিছু লোক মনে হয় শ্রবণ করছে কিন্তু তাদের অবস্থা হল এক কান দিয়ে শুনে, আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। তাদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। এজন্য বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

হযরত হাসান বসরী র. এর যুগ। তার অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এক ছাত্রীর ঘটনা, যিনি নিয়মিত তার মজলিসে উপস্থিত হতেন। অত্যন্ত নেককার, ইবাদতগুজার ছিলেন। তার একটি পুত্র সন্তান ছিল। স্বামী ছিলেন ভাল ব্যবসায়ী। কিন্তু ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস তিনি যৌবনকালেই বিধবা হয়ে যান। তার স্বামী অকালে মৃত্যুবরণ করেন। দিশেহারা এই ছাত্রী ভাবলেন এখন আমি কি করব? যদি আবার বিবাহ করি তাহলে স্বামী তো পাব, কিন্তু আমার সন্তানের কি হবে? সে তো নষ্ট হয়ে যাবে। নতুন স্বামী আমার সন্তানের সাথে কি ভাল আচরণ করবে? এখন সে যৌবনে পা দিচ্ছে, একে মানুষ করতে হবে। এ সন্তানই আমার ভরসা। এ সব চিন্তা করে অবশেষে ছাত্রীটি তার মনের আবেগকে চাপা দিলেন, নিজের চাহিদাকে উৎসর্গ করলেন। নতুন সংসারের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। এমন মহিলা সম্পর্কে হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, যে বিধবা আবার বিবাহ না করে আপন সন্তানের লালন-পালন এবং সংরক্ষণে এভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে একাকীত্বের পুরো সময়টায় আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন। কেননা বাস্তবে সে জিহাদই করে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে।

সুতরাং ঐ ছাত্রীটি তার সন্তানের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। কিন্তু ছেলেটি ঘরের বাইরে চোখের আড়ালে চলে গেলে মা আর তার খোঁজ খবর রাখতে পারতেন না। এ দিকে ছেলেটির হাতে ধন-সম্পদের কোন অভাব ছিল না। উঠতি বয়স ছিল। যৌবনের এ নাজুক সময়টি ক্লোরোফর্ম পদার্থের ন্যায় হয়ে থাকে। অসুস্থ ব্যক্তির নাকে এই পদার্থটি দেয়া মাত্র সে অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন সূর্য কখন উঠল, আর কখন ডুবল কোন খবরই তার থাকে না। যৌবনকালটাও ঠিক এমনই, উন্মাদনা ফুর্তি আর আবেগ উচ্ছ্বাসে গা ভাসিয়ে দেওয়া যুবকদের কোন খবরই থাকে না, এক অন্য রকম উত্তেজনায় তারা ডুবে থাকে।

সুতরাং ঐ ছেলেটিও অসৎ সঙ্গে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে অন্ধকার জগতের

দিকে পা বাড়াল, নেশায় হারিয়ে গেল। মা অনেক বুঝালেন, কিন্তু কোন ফলই হল না।

মা তাকে হযরত হাসান বসরী র. এর খেদমতে নিয়ে আসতেন। হযরত তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বুঝাতেন, কিন্তু নেক কাজের প্রতি তার কোন আকর্ষণই সৃষ্টি হত না। ঘরের বাইরে সময় কাটাতে আরম্ভ করল, মাঝে মধ্যে মার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে মা তাকে বুঝাতেন এবং হযরত হাসান বসরী র. এর কাছে নিয়ে আসতেন। হযরতও তাকে সাধ্য মত বুঝাতেন, দু'আ করতেন। এ সব কিছুই বৃথা যেত। এমনকি এক পর্যায়ে হযরত হাসান বসরী র. এর মনে হল যে, হয়ত এর অন্তরে মোহর লেগে গেছে।

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

'এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর অন্তরকে মোহর মেরে দেন।'

হ্যাঁ কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে পাথরের চেয়েও কঠিন করে দেন।

হযরতও ছেলেটির ব্যাপারে এ আশংকাই করলেন যে, হয়ত তার অন্তর পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু মা তো মা-ই। পৃথিবীর বুকে একমাত্র মা-ই এমন যিনি ভাল সন্তানকেও ভালবাসেন, মন্দটাকেও ভালবাসেন। তার চোখে সন্তান সন্তানই থাকে। ভাল-মন্দের কোন তফাত হয় না। কোন অবস্থাতেই মা আপন সন্তানকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। পিতা বলে দেন, ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। কিন্তু মা-র পক্ষে তা কখনই সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এক আশ্চর্য মহব্বত রেখে দিয়েছেন। সুতরাং মা তার ছেলে সম্পর্কে নিরাশ হন না। তাকে আদর করেন, খাবার তৈরি করে দেন, তার জন্য অপেক্ষায় থাকেন, ঘরে আসলে দরজা খুলে দেন, আবার তাকে বুঝান। প্রিয় বৎস! ফিরে আস, নেককার হয়ে যাও, নিজেকে বদলে দাও।

এখন আল্লাহ তা'আলার শান লক্ষ্য করুন। বছরের পর বছর অপকর্মে লিপ্ত থেকে স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে, ধন-দৌলত ধ্বংস করেছে, শরীরে নানান প্রকার রোগ বাসা বেঁধেছে, এমনকি ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন এ সব রোগের কোন চিকিৎসা আমাদের সাস্থ্য বিজ্ঞানে নেই। এখন বসা থেকে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। বিছানায় পড়ে গেছে। এমন দুর্বল হয়েছে

যে, পরকালের সফর সম্মুখে মনে হচ্ছে। পার্শ্বে বসে মা তাকে বুঝাচ্ছেন। প্রিয় বৎস! তুমি তোমার জীবনের যে অবস্থা করেছ, তাতো করেছ এখনও সময় আছে, ক্ষমা চাও, তওবা কর। আল্লাহ তা'আলা তওবা গ্রহণ করবেন, ক্ষমা করে দিবেন।

এতকিছুর পরও মা আদর এবং স্নেহের সাথে বুঝাচ্ছেন, এটা তার অন্তরে আঘাত হানল এবং তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। বলতে লাগল, মা! আমি তওবা কিভাবে করব? আমি তো অনেক বড় বড় গুনাহ করেছি।

মা বললেন, বেটা! হযরতকে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি।

ছেলে বলল, মা! আমি তো হযরতের কাছে যেতে পারব না। আমার শক্তি নেই। আপনিও আমাকে কোলে করে নিয়ে যেতে অক্ষম। এখন আমি হযরতের কাছে কিভাবে পৌছব। মা! আপনি একাই হযরত হাসান বসরী র. এর কাছে যান এবং হযরতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।

মা বললেন, ঠিক আছে বেটা। আমি হযরতের কাছে যাচ্ছি।

ছেলে বলছে, মা! আপনি ফিরে আসার আগেই যদি আমি দুনিয়া থেকে চলে যাই, তাহলে আপনি হযরতকে বলবেন, তিনি যেন আমার জানাযার নামায পড়ান।

অত:পর মা হযরত হাসান বসরী র. এর কাছে ছুটে গেলেন। হযরত মাত্র খাবার শেষ করেছেন। ক্লান্ত ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার মজলিসে উপস্থিত হতে হবে, এ জন্য সামান্য বিশ্রাম করতে চাচ্ছিলেন। এমন সময় মা দরজায় কড়া নাড়লেন।

হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কে?

মা বললেন, হযরত! আমি আপনার শাগরিদ। আমার ছেলেটি জীবন সায়াহ্নে উপনীত। সে তওবা করতে চায়। আপনি মেহেরবানী করে সঙ্গে চলুন। আমার সন্তানকে তওবা করিয়ে দিন।

হযরত ভাবলেন, ছেলেটি তাকে ধোঁকা দিতে চায়, সময় নষ্ট করতে চায়। এতদিন মন্দ পথ থেকে ফিরে আসল না। শত চেষ্টাতেও কোন কাজ হল না, এখন কিসের তওবা করবে? তাই বললেন, আমি আমার সময় নষ্ট করতে পারব না। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

মা বললেন, হযরত! সে একথাও বলেছে যে, আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার জানাযার নামায যেন হযরত পড়ান।

হযরত বললেন, আমি তার জানাযার নামাযও পড়াব না। সে তো কখনো নামাযই পড়েনি। এমন কিছু বুজুর্গও ছিলেন, যারা বে-নামাযীর জানাযার নামায পড়াতেন না। তারা বলতেন,

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ.

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করল, সে কাফির হয়ে গেল।'

শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা র. (তার উপর আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন) তিনি সুযোগ রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এমন ব্যক্তি কাফিরের মত কাজ তো করেছে, কিন্তু কাফির হয়ে যায়নি।

তাই হযরত হাসান বসরী র. বললেন, সে তো কখনো নামায-ই পড়েনি, অতএব আমি তার জানাযাও পড়াব না। মহিলাটি যেহেতু হযরতের শাগরিদ ছিলেন। নিশ্চুপ রইলেন এবং বুকভরা ব্যথা নিয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। একদিকে অসুস্থ মুমূর্ষু সন্তানের জন্য ব্যথা, অপরদিকে হযরতের এই প্রত্যাখ্যান, তার ব্যথাকে যেন শতগুণ বাড়িয়ে দিল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে আসলেন। ছেলেটি যখন মাকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখল, তখন তার মন আরো গলে গেল। বলতে লাগল, মা! আপনি এভাবে কেন কাঁদছেন?

মা বললেন, বেটা! একদিকে তোমার এ অবস্থা, অন্যদিকে হযরত তোমার কাছে আসতে অস্বীকার করেছেন। তুমি এমন খারাপ কেন হলে? হযরত তোমার জানাযা পড়াতেও রাজী হলেন না। এ কথা শুনে ছেলের অন্তরে আঘাত লাগল, চরম আঘাত।

ছেলেটি বলল, মা! শ্বাস নিতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে আপনি আমার একটি অসিয়ত শুনুন।

মা বললেন, কি অসিয়ত বাবা!

আশ্চর্য অসিয়ত

ছেলেটি বলল, মা আমার অসিয়ত হচ্ছে, আমার চোখ দু'টি যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সর্বপ্রথম আপনি আপনার ওড়না আমার গলায় পেঁচিয়ে আমাকে কুকুরের ন্যায় বাড়ির আঙ্গিনায় একবার এদিকে একবার ওদিকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবেন। মৃত কুকুরকে যেমন করা হয়, আমাকেও তাই করবেন।

মা বললেন, বাবা! এমন করব কেন?

ছেলেটি বলল, মা! এ জন্য যে, দুনিয়াবাসী যেন বুঝতে সক্ষম হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করবে, পিতা-মাতার অবাধ্য হবে, তার পরিণতি এমনই হয়। ছেলেটি আরো বলল, মা! আমাকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করবেন না।

মা বললেন, কেন বেটা?

ছেলে বলল, মা! আমাকে এ বারান্দাতেই দাফন করবেন। আমার গুনাহের কারণে কবরস্থানের অন্যান্য মৃতদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

যুবকটি যখন ভগ্ন হৃদয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এসব কথা বলছিল, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এ কথাগুলো পছন্দ হল। অত:পর ছেলেটির ইন্তেকাল হয়ে গেল। প্রাণবায়ু উড়ে গেল। মা তার চোখ দুটো বন্ধ করে দিচ্ছিলেন, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, مَنْ دَقَّ الْبَابَ؟ কড়া কে নাড়ছেন?

উত্তর এল, আমি হাসান বসরী।

মা বললেন, হযরত! আপনি কি করে এলেন?

হযরত বললেন, দেখ! আমি তোমাকে নিরাশ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন নসীব হল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হাসান বসরী! তুমি আমার কেমন ওলী যে, আমার একজন ওলীর জানাযা পড়াতে অস্বীকার করলে? তৎক্ষণাৎ আমি বুঝে ফেললাম, তোমার ছেলের তওবা কবুল হয়ে গেছে। তোমার সন্তানের জানাযা পড়ানোর জন্য হাসান বসরী তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে।

আয় আল্লাহ! যখন আপনি এতই দয়ালু যে, মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যদি কোন বান্দা লজ্জিত হয়, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, তাহলে আপনি তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

আল্লাহ! হে আমাদের মালিক! আজ আমরা আপনার ঘরে বসে রয়েছি। আমরা আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহ! আমরা অপরাধী, আমরা স্বীকার করছি যে, আমরা গুনাহগার।

আল্লাহ! মিথ্যা বলার কোনই সুযোগ নেই। আমাদের বাস্তব অবস্থা আপনার কাছে পরিষ্কার, আপনি দয়া করুন, মেহেরবানী করুন, আমাদের সমস্ত

গুনাহ আপনি মাফ করে দিন।

আল্লাহ! আমরা তো সূর্যের তাপও বরদাশত করতে পারি না, জাহান্নামের উত্তাপ কি করে সহ্য করব?

আয় পরওয়ারদিগারে আলম! আমাদের তওবা আপনি কবুল করুন। অবশিষ্ট জীবন ঈমান, ইসলাম এবং আপনার পথে উৎসর্গ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ.

وقال تعالى : وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

'মানুষ কি মনে করে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, শুধু এতটুকু কথার উপর যে, আমরা ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।'

দুনিয়া রং তামাশার জায়গা নয়

বিচার সালিশ নয় তো শুধু
হাশর দিনের বালা,
সইতে হবে এ ধরাতেও
পাপের অমোঘ জ্বালা।

যখন ফরিয়াদ করেছি প্রভু!
দেখ আমার হাল,
জবাব এসেছে বান্দা আমার!
পড়ো নামায়ে আ'মাল।

দুনিয়া ভ্রমন স্থল নয় পরীক্ষার স্থল

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে আপন কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাদেরকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষার স্থল। এটি রং তামাশা বা আরাম-আয়েশ কিংবা ভোগ বিলাসের স্থান নয়। কিন্তু আফসোস আমরা একে ভোগ বিলাসের জায়গা বানিয়ে ফেলেছি।

এখানে প্রত্যেককেই বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কাউকে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কারো থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। এখানে কেউ পুত্রের কাফনের কাপড় কিনতে বাজারে যাচ্ছে তো আরেকজন ছেলের বিয়ের সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মার্কেট চষে বেড়াচ্ছে। এক যুবক তার স্ত্রীকে বৌ সাজিয়ে ঘরে তুলছে, অপর যুবক স্ত্রীর জানাযা কাঁধে করে কবর স্থানে ছুটছে। এখানে কেউ ব্যবসায় লাভবান হচ্ছে, আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেউ সুস্থ কেউ অসুস্থ।

মোটকথা বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কারণ এ পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। এখানের অবস্থা পরিবর্তনশীল।

تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

আমি দিনগুলোকে মানুষের মাঝে অদল-বদল করতে থাকি। যখন বান্দাকে দান করি, তখন দেখি সে শুকর আদায় করে কি না, আর যখন কারো থেকে ছিনিয়ে নেই তখন দেখি সে ধৈর্য ধারণ করে কি না। ধৈর্যশীল বান্দাও জান্নাতে যাবে, শুকর গুজার বান্দাও জান্নাতে যাবে। মু'মিনের সর্বাবস্থাই উত্তম, সর্বাবস্থাই আনন্দের। এটি এক মৌলিক শিক্ষা যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার।

অস্থিরতা এবং পেরেশানীর মধ্যে পার্থক্য

আজ আপনি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ঘুরে দেখুন। দেখবেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা এবং অবস্থান নিয়ে অসন্তুষ্ট। নানা প্রকার অভাব অভিযোগে জর্জরিত। তাদের সকলকেই আপনি অত্যন্ত পেরেশান দেখবেন যদিও তাদের সকলের পেরেশানী এক জাতীয় নয়। পশ্চিমাদের পেরেশানীর কারণ হচ্ছে ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকা, ঈমান না থাকার কারণে তাদের অন্তর অস্থির-পেরেশান। আর আমাদের এ উপমহাদেশের লোকজন পেরেশান সুযোগ সুবিধার স্বল্পতার কারণে। পেরেশান সকলেই, কিন্তু

সকলের পেরেশানী এক নয়। এখানে দু'টি শব্দ মনে গেঁথে নিন। একটি হচ্ছে পেরেশানী, অপরটি অস্থিরতা। শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ঈমানদার বান্দা দু:খ বেদনা এবং কষ্টদায়ক অবস্থার সম্মুখীন হলে পেরেশান হয়, কিন্তু অস্থির হয় না। যার সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে তার অস্থির হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ জন্য মু'মিন কখনই অস্থির হয় না। তার অন্তরে সর্বদা এ বিশ্বাস থাকে যে, এসব অবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই এসেছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থা এভাবে পরিবর্তন করে থাকেন। আমার অবস্থাও আল্লাহ বদলে দিবেন।

সুখ-দু:খ কেন?

মানব জীবনে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার উদ্ভব হওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। কখনো কখনো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অবস্থা পরিবর্তন করেন। নেককারদেরও এবং গুনাহগারদেরও। নেককার লোকদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে দেন, আর পাপিষ্ঠ-মন্দ লোকদের জন্য সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে দেন। আবার কখনো গুনাহের কারণে মানুষকে শাস্তি স্বরূপ বিপদাপদে চরম অশান্তিতে নিক্ষেপ করেন।

جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ ÷ حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ

যখন ফরিয়াদ করেছি প্রভু!
দেখ আমার হাল,
জবাব এসেছে বান্দা আমার!
পড়ো নামারে আ'মাল।

মোটকথা মানুষের বর্তমান অবস্থার পিছনে বিভিন্ন প্রকার কারণ থাকে। কখনো শাস্তি, কখনো পরীক্ষা। এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা যায় যে, বান্দার পেরেশানির পিছনে মূল কারণটি কি শাস্তি না পরীক্ষা?

উদ্ভূত পরিস্থিতি পরীক্ষা হওয়ার লক্ষণ

মূলত বিষয় হল দুটি। কোন পেরেশানীর সম্মুখীন হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দার মনোযোগ-মনোনিবেশ যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ পূর্বে নামাযের ব্যাপারে অলসতা করত, এখন তাকবীরে উলার সাথে নামায

পড়ে এমনকি তাহাজ্জুদও আরম্ভ করে দেয়, তিলাওয়াতও করে, সময়মত ওযীফাও পাঠ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সামগ্রিকভাবে তার এবাদত-বন্দেগী বেড়ে যায়। এখন সে মন ভরে দু'আ করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গুনাহের জন্য বেশি বেশি ক্ষমা চায়।

বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর বান্দার অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে এটি পরীক্ষায় পতিত হওয়ার প্রথম লক্ষণ। আর দ্বিতীয় লক্ষণ হল সে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারনে পেরেশান হলেও নিরাশ হয় না। আল্লাহ তা'আলার কাছে অবস্থা পরিবর্তনের আশা করে। সুড়ঙ্গের ওপারে আলোর আভা দেখতে পায়। সে মনে করে, আমি তো বিপদে আজ পেরেশান, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাকে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দিবেন।

মোটকথা যখন অন্তরের মধ্যে পরিবর্তনের আশা থাকে, আল্লাহর প্রতি মনোযোগ মনোনিবেশ বেড়ে যায়, তখন বুঝতে হবে এ বিপদ পরীক্ষা স্বরূপ এসেছে। দুনিয়াতে কিছু লোক এমনো রয়েছে যারা শ্রম ও সাধনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের উচ্চস্থান লাভে সক্ষম হয় না। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দাকে ছোট খাট বিপদে পতিত করেন। যখন সে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা এর উসিলায় তাকে নৈকট্যের উঁচু স্থানে উন্নীত করেন।

অতএব কোন মু'মিন বান্দা যখন দেখবে, তার চতুর্দিকে বিপদ আর বিপদ।

حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ.

এমনকি বিস্তৃত এ পৃথিবী তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে, এমন অবস্থার মধ্যেও অন্তর তার প্রশান্ত এবং আশান্বিত, তখন বুঝতে হবে যে, এ পরিস্থিতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য উপহার, এ কারণেই আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গগণ প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা কখনই পেরেশান হতেন না। বরং এমন পরিস্থিতিতে তাদের অন্তর গেয়ে উঠত-

تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے ÷ کہ وہ تری دی ہوئی چیز ہے

তোমার দেয়া কাঁটাও প্রভু
আমার কাছে ফুল,
তুমি আমার মাহবুব যে তাই
সবই তোমার অতুল।

এক বুজুর্গের ইলহাম

হযরত মালিক ইবনে দীনার র. অথবা হযরত দাউদ তায়ী র. বলেন, একবার আল্লাহ তা'আলা ইলহাম করলেন তথা আমার মনে একথার উদ্রেক করলেন যে, হে দাউদ! যদি কখনো আহারের সময় নষ্ট তরকারি তোমার সম্মুখে আসে, তখন সেদিকে তুমি ভ্রুক্ষেপ কর না। বরং এ কথা মনে কর যে, আল্লাহ তা'আলা যখন রিযিক বন্টন করেছেন, তখন আমার কথা তাঁর স্মরণে ছিল।

আল্লাহ তা'আলা চান যে, আমার বান্দাকে আমি যে রিযিক দিয়েছি, তার উপর সে যেন সন্তুষ্ট থাকে। পিতা যখন ঘরে কোন খাবার নিয়ে আসেন এবং সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেন, বন্টনের মধ্যে কিছু কম বেশী তো হয়ই। এখন যে সন্তান অন্যদের তুলনায় কম পেয়েও পিতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, পিতা এমন সন্তানকেই সর্বাধিক ভালবাসেন। তিনি মনে করেন আমার এ সন্তানটি অন্যদের তুলনায় মন্দটি পেয়েও আমার প্রতি খুশী। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাও এমন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েও তার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

অনুরূপ যে পিতার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে, যে রূপসী নয়, মেধাবীও নয়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্কও নয়। এমন কন্যাকে যদি কোন সুন্দর, স্বচ্ছল, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বিয়ে করে, তাহলে পিতা এ ছেলেটির প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। মনে মনে হলেও তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। তিনি ভাবেন এ ছেলেটি কত মহত্বের পরিচয় দিয়েছে। আমার এমন কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ কঠিন পরিস্থিতিতেও যখন কোন বান্দা আপন প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলাও এমন বান্দাকে ভালবাসেন। আমার কত প্রিয় বান্দা এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও সে আমার প্রতি খুশী। এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া স্বল্প রিযিকের উপরই সন্তুষ্ট থাকবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার স্বল্প আমলের উপরেই খুশী হয়ে যাবেন।

তাই মু'মিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। অবস্থার মধ্যে কিছু তারতম্য তো হয়-ই। এতে মু'মিনের কিছু যায় আসে না।

পরিস্থিতি শান্তি হওয়ার আলামত

আর যদি মানুষ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যে, পরিবারে অথবা সার্বিক সুস্থতায় পেরেশানি দেখা দেয় এবং এসব পেরেশানির কারণে তার আমলের সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসে যেমন পূর্বে নামায মসজিদে গিয়ে পড়ত, এখন ঘরে পড়তে হয়, নফল পড়ার অভ্যাস ছিল এখন শুধু ফরয আর সুন্নত পড়ে, ধীরে ধীরে ওযীফার কথাও ভুলে যাচ্ছে, তাহাজ্জুদের তাওফীক আর আগের মত হয় না। মন সর্বদা পেরেশান আর অস্থির থাকে, আমল ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তাহলে বুঝতে হবে সে শাস্তিতে পতিত হয়েছে। এটি উদ্ভূত পরিস্থিতি শাস্তি হওয়ার প্রথম আলামত।

আর দ্বিতীয় আলামত হচ্ছে এমন বান্দার অন্তর নিরাশায় ছেয়ে যায়। সে চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, বর্তমানে যাকে ডিপ্রেশন বলা হয়। সর্বদা একটা আতংক লেগেই থাকে। কখন জানি কি হয়ে যায়। এ দু'টি আলামত হচ্ছে উদ্ভূত পরিস্থিতি শাস্তি স্বরূপ হওয়ার। কোন মু'মিনের অবস্থা এমন হলে তাকে সতর্ক হতে হবে যে, আমার কোন গুনাহের কারণে, কোন অন্যায়ের কারণে আমার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ শাস্তি নেমে এসেছে।

আমাদের বড়রা বলেছেন, পরিস্থিতি যাই হোক। পরীক্ষা স্বরূপ হোক, আর শাস্তি স্বরূপ হোক, সর্বাবস্থায় বেশি বেশি ইস্তেগফার করার দ্বারা বান্দা উপকৃত হবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে অব্যাহতভাবে প্রার্থনা করবে, কাঁদবে। কোন কোন বান্দার কান্নাও আল্লাহ তা'আলার কাছে ভাল লাগে। আল্লাহ তা'আলা চান এ বান্দা যেন বিনীত হয়, ক্রন্দন করে। তার ক্রন্দন বিনয় নম্র অবস্থা আমার কাছে বড় ভাল লাগে। তাই আল্লাহ তা'আলা এমন অবস্থা দ্বারা বান্দাকে আক্রান্ত করেন।

বুঝা গেল মানুষের অবস্থা পরিবর্তনশীল, কিন্তু মু'মিন কোন অবস্থাতেই অস্থির এবং বে-চাইন হয় না।

মু'মিনের জন্য ঈমান দ্বারা সবচেয়ে বড় লাভ হল, এর বদৌলতে সে কখনই অস্থির হয় না। যেমন একজন মানুষ কাচের ঘরে বসে আছে। ঘরের বাইরে চলছে তুফান। সে বসে বসে দেখছে, গাছের পাতাগুলো নড়ছে, গাছগুলো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। কাচের ঘরে বসে থাকার কারণে এর কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। আল্লাহওয়ালাদের অবস্থাও ঠিক

এমনই হয়ে থাকে। তাদের চতুষ্পার্শ্বে বিরূপ পরিস্থিতির তুফান চলতে থাকে, কিন্তু তাদের চিত্ত থাকে শত ভাগ শান্ত, স্থির।

মানুষ দেখলে মনে করে, লোকটি বড় পেরেশান, কিন্তু বাস্তবে তাদের অন্তরে পেরেশানির ছিটেফোটাও থাকে না। অপার্থিব এক প্রশান্তিতে সে ডুবে থাকে।

طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف ÷ دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے

সংকল্প মোর পাহাড়সম
তুফান দূরে থাকে,
কাপুরুষ ভাবে কিশতি আমার
পড়েছে দূর্বিপাকে।

দুনিয়াদাররা মনে করে নৌকা বুঝি ডুবে যাচ্ছে, আরে ঝড় ঝঞ্ঝায় আমার কিশতি ডুবে যাবে? প্রশ্নই আসে না, তুফান তো আমায় সমীহ করে, আমার সংকল্পকে ঘিরে তওয়াফ করে।

মোটকথা বাহ্যিক অবস্থা বিরূপ মনে হলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এর বিনিময়ে তারা অপরিসীম রহমত লাভ করেন। এ কারণে মু'মিন বান্দা সাময়িকভাবে পেরেশান তো হয়, কিন্তু কখনই অস্থির বে-চাইন হয় না। বরং এই ভেবে তারা আনন্দিত হন যে, এ পরিস্থিতি আমার আল্লাহ-ই আমার জন্য প্রেরণ করেছেন। এটি প্রেমাস্পদের তোহফা।

হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টিকারী একটি হাদীসে কুদসী

"রেযা বিল কাযা" তথা যে বান্দা তার ভাগ্য নিয়ে খুশী, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি খুশী থাকেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন লৌহে মাহফূয সৃষ্টি করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা কলমকে আদেশ করলেন, লিখ, তখন কলম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে লিখা আরম্ভ করে। সর্বপ্রথম

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلِیْ

লিখা হয়। এরপর লিখা হয়

مَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِیْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلَائِیْ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلٰى نِعَمَائِیْ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِیْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কাযা তথা ফায়সালাকে মেনে নেয় না, আমার প্রেরিত বিপদে ধৈর্যধারণ করে না, আমার দেয়া নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া

আদায় করে না সে যেন আমি ব্যতীত অন্য কোন রব তালাশ করে নেয়। সুতরাং মু'মিনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল, সে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। সর্বাবস্থায় তার মালিকের প্রতি খুশী থাকে। সে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার গোলামরূপে তার দরবারে হাজির থাকে। কোন অবস্থাতেই তার আমলে ত্রুটি আসে না। বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বুঝার পদ্ধতি

বনী ইসরাঈলের একজন লোক হযরত মূসা আ.কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি করে বুঝব যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি খুশী না বেজার। হযরত মূসা আ. তূর পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পরওয়ারদিগার! লোকেরা প্রশ্ন করছে আমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি কি করে বুঝব? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মূসা! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, যদি তারা আমার প্রতি আন্তরিকভাবে খুশী থাকে, তাহলে আমিও তাদের প্রতি খুশী থাকি। আর যদি তাদের অন্তরে আমার ব্যাপারে অভিযোগ থাকে, তাহলে আমিও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকি। (সুবহানাল্লাহ!) কত সহজ পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন। এখন আমরা আমাদের অন্তরের প্রতি লক্ষ করি, যদি আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের অন্তর সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে বুঝব আল্লাহও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর যদি আমাদের অন্তরে কোন অভাব অভিযোগ থাকে, যেমন আমার সন্তান কেন অকালে মৃত্যুবরণ করল? ব্যবসায়িক অবস্থা আমার ভাল নয় কেন? যেখানেই হাত দেই সোনা মাটি হয়ে যায়, এ ধরনের অভাব অভিযোগ দ্বারা যদি আমাদের অন্তর ছেয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তাঁর পক্ষ থেকেও আমি জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হব যে, বল তুমি আমার নেয়ামতের হক কি আদায় করেছ?

আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা

একজন বুজুর্গ বড় আশ্চর্যজনক কথা বলতেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, হে আমার বান্দা! তুমি মানুষকে জানিয়ে দাও যে, তারা যখন বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়, খারাব অবস্থায় পতিত হয়, তখন সাথে সাথে বন্ধুদের মজলিসে বসে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করে, অথচ তাদের আমলনামা যখন গুনাহে পরিপূর্ণ হয়ে আমার নিকট আসে, তখন আমি ফিরিশতাদের মাহফিলে তাদের ব্যাপারে কোন

অভিযোগ করি না। কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তব। আমরা আল্লাহ তা'আলার এতো নেয়ামত ভোগ করি যে, আমাদের দাঁতগুলো পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে যায়, কিন্তু তার শোকর আদায় করে আমাদের যবান তো সামান্যও ক্ষয় হয় না।

অতএব মু'মিনের কর্তব্য হল, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করা যে, আমি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার প্রতি রাজি খুশী থাকব। অত:পর কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিও তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ.

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবর কারীদের।' -বাকারা ১৫৫

মানুষ যখন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে ধৈর্যধারণ করবে, তখন সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে।

বিপদাপদে মু'মিনের কর্মপন্থা

دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد ÷ اگر باشد بنی آدم نہ باشد.

এ ধরাতে নাইরে কেহ
ভাবনা চিন্তাহীন,
থাকেও যদি নয় তো সে ভাই
মানুষ কিংবা জ্বিন।

এ পৃথিবীতে কেউ চিন্তামুক্ত নয়। যদি থাকেও তাহলে সে মানুষ নয়। সুতরাং প্রত্যেকের জীবনেই বিপদাপদ আসে, দুশ্চিন্তা আসে, কিন্তু যারা আল্লাহওয়ালা তারা এমন পরিস্থিতিতে কোন প্রকার অভিযোগ করেন না, দু:খ কষ্টের কথা লুকিয়ে রাখেন। আমরা যেমন বলে বেড়াই এমন হয়ে গেছে, অমুক ঘটনা ঘটে গেছে, এমন হল না কেন? আসলে এগুলোই হচ্ছে স্বীয় প্রতিপালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

সত্যিকার মু'মিন কখনই মানুষের সামনে এমন কথা উচ্চারণও করতে পারে না। বরং দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে। সব দু:খ-কষ্টের কথা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে পেশ করে। এমন দু'রাকাত নামাযকে সালাতুল হাজাত বলা হয়। বস্তুত: এটি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলার একটি মাধ্যম বা পদ্ধতি।

মু'মিন সালাতুল হাজাত পড়ে। সাহাবায়ে কিরাম রা. এর আমলও এমনই ছিল এবং আমাদের বড়রাও তাই করতেন। যখন কোন বিপদে পড়তেন সঙ্গে সঙ্গে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা থেকে চেয়ে নেয়ার পদ্ধতি। যা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

একটু ভেবে দেখুন, ঈমানের বদৌলতে আমাদের জীবন কত সহজ, কত সুন্দর। পশ্চিমা বিশ্বে বর্তমানে বিলাস সামগ্রীর কোন অভাব নেই, তা সত্ত্বেও তারা দু:খী। তারা বলে 'লাইফ ইস্ ভেরি ডিফিকাল্ট' জীবন বড়ই কঠিন। তাদের মনে শান্তি নেই। কারণ তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত।

আর মু'মিন (সুবহানাল্লাহ!) কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছে, স্বীয় মালিকের প্রতি খুশী এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে।

যেদিকে মাওলা সেদিকে শাহ দৌলা

একজন বুজুর্গ ছিলেন, নাম ছিল শাহ দৌলা। তার বসতির কাছেই একটি বাঁধ ছিল। বর্ষাকালে পুরো এলাকা ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকায় সেখানকার মানুষ এ বাঁধটি নির্মাণ করেছিল। একবার বর্ষাকালে পানি অত্যধিক বেশি হল, এক পর্যায়ে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার আশংকা দেখা দিল। তখন এলাকার সব মানুষ দিশাহারা হয়ে ঐ বুজুর্গের কাছে ছুটে এলো। তারা বলল, হযরত! দু'আ করুন। বাঁধ যেন ভেঙ্গে না পড়ে। বুজুর্গ লোকটি কোদাল হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং যে স্থান দিয়ে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার আশংকা ছিল, তা দেখলেন। অত:পর কোদাল দিয়ে সেখানকার মাটি সরাতে আরম্ভ করে দিলেন। লোকেরা আতংকিত হয়ে উঠল। বলল, হযরত! আমরা তো আপনাকে এ জন্য এনেছি যে, আপনি দু'আ করবেন যেন আমাদের বাঁধ রক্ষা পায়। আপনি দেখি উল্টো করছেন।

বুজুর্গ লোকটি বলতে লাগলেন,

جدھر مولی ادھر شاہ دولہ۔

যেদিকে মাওলা সেদিকে শাহ দৌলা

যদি আমার রবের ইচ্ছা এটাই হয় যে, বাঁধ ভেঙ্গে সব মানুষ পানিতে তলিয়ে যাক, তাহলে আমি নিজেই কেন বাঁধটি ভেঙ্গে দিব না? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তার এই বিনয় বড় পছন্দ হল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে

পানি কমতে আরম্ভ করল। যেখান থেকে বন্যার সূচনা হয়েছিল, পানি আবার সেখানেই ফিরে গেল।

আল্লাহ ওয়ালারা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সম্মুখে আপাদ- মস্তক সমর্পিত ও সন্তুষ্ট থাকেন। সর্বদা তাদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে-

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰه

আমি আমার সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে সমর্পণ করছি। অতএব আমাদেরও উচিত, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أَلَيْسَ اللّٰه بِكَافٍ عَبْدَهُ

আল্লাহ তা'আলা কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি আল্লাহর দরজা ভুলবে তাকে উদভ্রান্তের ন্যায় হাজারো দরজার কড়া নাড়তে হবে।

অতএব কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের একটি কথাই বলা উচিত-

حَسْبُنَا اللّٰه وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি উত্তম কার্জ নির্বাহক। কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।'

কষ্ট লাঘবের পরীক্ষিত আমল

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কাফিরদের আচরণে ব্যথিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কত আদরের সাথে ইরশাদ করলেন-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ
إِنَّ اللّٰه مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

'আপনি সবর করুন। আপনার সবর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়; তাদের জন্য দু:খ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং সৎকর্ম করে।'

-নাহল ১২৭-১২৮

আপনি কঠিন কোন বিপদের সময় এ আয়াতটি কয়েকবার তিলাওয়াত করে দেখুন। এটি পরীক্ষিত আমল।

বড় বড় বিপদ এবং পেরেশানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আয়াত

তিলাওয়াত করার বদৌলতে দূর করে দেন, অন্তর শীতল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার কালামের মধ্যে আশ্চর্যজনক আছর রয়েছে। বিপদগ্রস্ত, চিন্তিত বান্দাকে খুশী করার জন্য এ আয়াতটি হচ্ছে টনিক। এর উপর আপনি নিজেও আমল করুন।

যখনই কোন পেরেশানী আসে, আয়াতটি তিলাওয়াত করুন, দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা মনের অবস্থা কিভাবে পরিবর্তন করে দেন।

বিপদাপদ কেন আসে?

মানুষের জীবনে যে বিপদাপদ আসে, এর কারণ হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিভিন্ন মুবারক নাম রয়েছে, কখনো একটি মুবারক নামের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়, আবার কখনো অন্য আরেকটি মুবারক নামের আছর প্রকাশিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলাই অবস্থাকে সংকীর্ণ করেন এবং তিনিই আবার খুলে দেন। অর্থাৎ কখনো আল্লাহ তা'আলার নাম قَابِض (কাবিয) এর প্রভাবে চারদিক থেকে দু:সংবাদ আসতে থাকে, হতাশা ঘিরে ধরে, কঠিন পরিস্থিতি সম্মুখে আসে। আবার কখনো بَاسِط (বাসিত) নামের আছর প্রকাশিত হয়। তখন চতুর্দিক থেকে সু:সংবাদ আসা আরম্ভ করে, ভুল পদক্ষেপেও সঠিক ফলাফল বয়ে আনে।

মোটকথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিভিন্ন বরকতময় নাম বান্দার অন্তরকে প্রভাবিত করে এবং তার অবস্থাকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সকল প্রকার অবস্থা তথা সুখ-দু:খ, বিপদাপদ সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে।

বন্ধুরা আমার! প্রেমাস্পদ যা কিছুই প্রেরণ করেন, প্রেমিকের কাছে তাই প্রিয় হয়, কাঙ্ক্ষিত হয়।

এ জন্যই বিপদাপদের মুহূর্তে আমাদের পেরেশান না হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

নবী কারীম সা. এর দূরদর্শিতা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূরদর্শিতা কেমন ছিল? চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে তিনি যেন আমাদের বর্তমান অবস্থাকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং আমাদেরকে সবক দিয়ে গেছেন যে, সকাল-সন্ধ্যা তোমরা পড়বে,

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا

আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনিই আমার প্রতিপালক। একজন বুজুর্গ আশ্চর্যজনক একটি কথা বলতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক, এ সম্মান-ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং এ গর্ব-ই আমার জন্য যথেষ্ট যে, আমি আপনার বান্দা।

আল্লাহ ওয়ালারা সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি এভাবেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এ জন্য পেরেশানী, দুশ্চিন্তা তাদের কাছ থেকে পালাত। তাদের জীবন হত শান্তির, স্থিরতার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ইস্‌তিকামাত তথা দৃঢ়তার সাথে শরীয়তের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

কবি গালিব অনেক বড় কবি ছিলেন। কোন আল্লাহওয়ালার সাহচর্য পেলে তার জীবন ভিন্ন রকমের হত। তিনি একটি কবিতা লিখেছেন।

কবিতাটি বড় আশ্চর্যজনক ছিল। যার বিষয়বস্তু হল প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য বা তার বিরহ এগুলো প্রেমিকের কাছে কোন বিষয় নয় তার কাছে মূখ্য হল প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি। এ সম্পর্কেই কবি গালিব বলেছিলেন।

نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے ÷ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

বিরহ জ্বালা নয়তো ভাল
মিলন ভাল নয়,
বন্ধু আমায় যেমন রাখেন
সেটাই মধুময়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর আপাদমস্তক সমর্পিত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!!

কিন্তু আমরা দু'আ করব, আয় আল্লাহ! আমরা দুর্বল, পরীক্ষা দেয়ার মত যোগ্যতা আমাদের নেই। আমরা কখনই বিপদাপদ কামনা করব না; বরং সর্বদা ক্ষমা চাইব। আল্লাহ! আমরা দুর্বল পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই। হে আমার মালিক! আমার সঙ্গে ক্ষমার আচরণ করুন, দয়ার আচরণ করুন। এতদসত্ত্বেও যদি বিপদাপদ এসে যায়, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির সম্মুখে আপাদমস্তক সমর্পিত থাকব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার নৈকট্যের উচ্চস্থান দান করুন। আমীন!!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

'জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারাই
অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।' -রা'দ ২৮

যিকিরের প্রভাব

ধনে জনে প্রাসাদ লনে
শান্তি কোথাও পাবে না,
ধরার পিঠে যিকির হল
শান্তি-সুখের ঠিকানা।

কি যে সুখ জড়িয়ে আছে
প্রভু তোমার নামে,
কাঁটার বিছানায়ও ঘুম এসে যায়
শান্তি ও আরামে।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً.

وقال تعالى : وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

যিকির শব্দের ব্যাখ্যা

যিকির শব্দটি আরবী, উর্দু উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে।.

১. এটি কুরআনের নাম। ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

এখানে শব্দটির অর্থ হবে উপদেশনামা। 'নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশ-নামাটি অবতীর্ণ করেছি এবং আমি-ই এটি সংরক্ষণ করব।'

২. কিয়ামত দিবস। এ অর্থেও শব্দটি কুরআনে পাকে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. তৃতীয় অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ। ইরশাদ হয়েছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ পাঠ কর।'

অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে-

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

'আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ এবং নারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাত এবং অনেক বড় পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

আল্লাহ তা'আলার স্মরণ আশ্চর্য নেয়ামত

গাছের চারার জন্য পানি যেমন, মানুষের আত্মিক জীবনের জন্য আল্লাহর যিকির ঠিক তেমনি। যত দিন পর্যন্ত গাছের চারাটি পানি দ্বারা সিক্ত হবে, ততদিন পর্যন্ত সবুজ সতেজ থাকবে। তদ্রূপ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে, আধ্যাত্মিকভাবে সে জীবন্ত-প্রাণবন্ত থাকবে। পানির অভাবে গাছের চারা শুকিয়ে যায়, মরে যায়। যিকির না করার কারণেও মানুষ আত্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করে।

আপনি দেখে থাকবেন, অনেক সময় বাহ্যিক ভাবে একজন মানুষকে সচল মনে হলেও ভিতর থেকে সে মৃত হয়। তার মধ্যে মানুষত্ব বলে কিছুই থাকে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হচ্ছে এমন একটি আমল, যা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে কারীমে এর অনেক উপকারিতা উল্লেখিত হয়েছে।

যিকিরের ফায়দা

এক. ইরশাদ হয়েছে-

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার স্মরণের উপর মানুষের আত্মিক প্রশান্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি যিকির করে, তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے ÷ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کی یاد کرنے سے

ধনে জনে প্রাসাদ লনে
শান্তি কোথাও পাবে না,
ধরার পিঠে যিকির হল
শান্তি-সুখের ঠিকানা।

আর যারা যিকির করে না, তাদের অবস্থা বড়ই করুন। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না। টেবলেট খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে, তা সত্ত্বেও ঘুম আসে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, (সুবহানাল্লাহ!) হাজার পেরেশানী আর বিপদাপদের মধ্যেও নাক ডেকে ঘুমায়। সুখে-শান্তিতে জীবন কাটায়।

کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ ÷ نیند کانٹوں پے بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ

কি যে সুখ জড়িয়ে আছে
প্রভু তোমার নামে,
কাঁটার বিছানায়ও ঘুম এসে যায়
শান্তি ও আরামে।

সত্যি আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রশান্তি রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার-পরিজন চতুর্দিকের পেরেশানীর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার যিকিরের মাধ্যমে অন্তরে এক আশ্চর্য শীতলতা অনুভূত হয়।

দুই. যিকিরের দ্বিতীয় উপকারিতা হল, যে বান্দা যিকির করে, সে আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এসে যায়।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْنَ فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ.

'নিশ্চয় যারা মুত্তাকী তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।' -আ'রাফ ২০১

অর্থাৎ শয়তান বান্দাকে প্ররোচনা দেয়, তার উপর হামলা করে, কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মগ্ন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে হিফাযত করেন। বুঝা গেল শয়তানের প্ররোচনা এবং আক্রমণ থেকে বাঁচার বড় উপায় হল, আল্লাহ তা'আলার যিকির। যিকির ব্যতীত কোন মানুষ শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে পারে না। এ জন্যই যে সব যুবকরা বলে, শয়তান আমাদের মস্তিষ্ককে কব্জা করে ফেলেছে। আসলে যিকিরের প্রতি তাদের কোন মনোযোগই নেই। মনে রাখবেন কল্পনা- প্রসূত সব ময়লা-আবর্জনা যিকিরের মাধ্যমে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

বন্ধুরা আমার! যুদ্ধের একটি নিয়ম হচ্ছে পরাজিত শত্রুকে (যত দ্রুত সম্ভব) নিরস্ত্র করা। শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার পর তার পক্ষ থেকে আক্রমণের আর কোন আশংকা থাকে না। এজন্যই সুযোগ পাওয়া মাত্র শত্রুকে নিরস্ত্র করা হয়। তদ্রূপ শয়তানও যখন মানুষের উপর আক্রমণ করে, তখন সর্বপ্রথম কাজ এই করে যে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে তাকে গাফিল করে দেয়।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ.

'শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অত:পর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।'

-মুজাদালাহ ১৯

অর্থাৎ তাদের উপর শয়তান চড়াও হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। অতএব শয়তান সর্বপ্রথম মানুষকে গাফেল করে দেয়। কেননা উদাসীনতাই হল সকল প্রকার গুনাহের উৎস। এজন্যই উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকা এবং গাফেল লোকদের সাহচর্য পরিহার করা আবশ্যক।

যিকিরের গুরুত্ব

যিকির এমন বড় ও মহৎ একটি আমল যে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকেও এর উপদেশ দিয়েছেন।

দেখুন, মহানের উপদেশও মহান হয়ে থাকে। এখানে উপদেশদাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আর যাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তারা হলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.। যাদের মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং বুঝা গেল উপদেশটি কত বড় এবং মহৎ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন যে, দু'জন ব্যক্তিত্বকে নবুওয়াত দানে ধন্য করলেন এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করলেন। প্রেরণের সময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা এবং উপদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন-

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيَاتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ.

'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।' -ত্ব-হা ৪২

হযরত মূসা আ. এবং হযরত হারুন আ.কে বলা হচ্ছে আপনি এবং আপনার ভাই আমার নিদর্শনাবলী এবং মু'জিযা নিয়ে যান, কিন্তু আমার যিকির থেকে উদাসীন হবেন না। আল্লাহ তা'আলা যখন স্বয়ং পয়গম্বরকে বলেন যে, আপনারা আমার স্মরণ থেকে গাফেল হবেন না। এর দ্বারাই যিকিরের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝা গেল যে, যিকির হচ্ছে দাওয়াত তথা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করার প্রথম কাজ। আর দাওয়াতের চূড়ান্ত পর্যায় তো হচ্ছে এ পথে জীবন উৎসর্গ করে দেয়া।

চিন্তা করুন, যুদ্ধের সময় যখন শরীর থেকে রক্তের বন্যা বয়, জীবন থাকে চরম হুমকির মুখে, এক সেকেন্ডেরও ভরসা নেই, এমন নাজুক মুহূর্তে মানুষ জ্ঞানশূন্য থাকে, কিন্তু বলা হচ্ছে এ পরিস্থিতিতেও আমার স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া চলবে না।

ইরশাদ হচ্ছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا

হে ঈমানদারগণ! হে বিশ্বাসীরা! যখন তোমরা কাফিরদের কোন দলের মুখোমুখী হও, তখন অটল থেক

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

এবং বেশী বেশী যিকির কর আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর,

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে।

اُذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا এ বাক্যটি যদি মাঝখানে না রেখে সরাসরি এভাবে বলা হত

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক যেন তোমরা সফলকাম হও।'

তাহলেও বাক্য পূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু এমন করা হয়নি। বরং যিকিরের বিষয়টিকে মাঝখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা বুঝানোর জন্য যে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যখন মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তখনো আমার স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া চলবে না। যখন তোমরা আমার স্মরণ থেকে উদাসীন হবে না তখন আমার সাহায্য লাভ করবে এবং সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে।

দেখা যাচ্ছে দাওয়াতের (আল্লাহর দিকে আহ্বান) এর সূচনাতেও যিকিরের আদেশ সমাপ্তিতেও যিকিরের আদেশ, এর দ্বারা বুঝা গেল মানুষ যিকিরের মাধ্যমেই সাফল্য লাভ করবে। যিকির ব্যতীত সে মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছতে পারবে না।

যোগ্যতা ধীরে ধীরে তৈরী হয়

শিশু জন্ম লাভ করার পর প্রথম দিনই যদি তাকে গরুর দুধ দেয়া হয় তাহলে সে হজম করতে পারবে না, পেট নষ্ট হয়ে যাবে। কেন?

কারণ তার পেটে এতটুকু যোগ্যতা এখনো তৈরি হয়নি যে, গরুর দুধ হজম করবে। এখন হয় তাকে মায়ের দুধ দিতে হবে অথবা পানি মিশিয়ে বকরীর দুধ দিতে হবে। শিশুটি এ দুধ পান করবে। অত:পর ধীরে ধীরে সে উপযুক্ত হবে, পানি ব্যতীত সরাসরি বকরীর দুধ তাকে দেয়া যাবে, এরপর সে আরো বড় হবে, যোগ্যতা আরো বাড়বে এভাবে এক সময় শিশুটি গরুর দুধ পর্যন্ত হজম করে ফেলবে। শুধু তাই নয় হজম শক্তি বৃদ্ধি পেতে পেতে একদিন মহিষের দুধও সে অনায়াসে হজম করে ফেলবে। এ দৃষ্টান্তটি মাথায় রাখুন। তারপর ভাবুন-

প্রত্যেক আমলের-ই একটি নূর রয়েছে। যিকিরেরও নূর আছে। তদ্রূপ কুরআনে কারীমেরও একটি নূর আছে। এ নূরগুলোকে আমাদের অন্তর কিভাবে ধারণ করবে? এর জন্যও অন্তরের উপযুক্ততা প্রয়োজন। যদি অন্তর উপযুক্ত না হয়, তাহলে এসব নূর সে ধারণ করতে পারবে না। স্বয়ং

কুরআনে কারীম থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। (সুবহানাল্লাহ!) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়।'

বুঝা গেল যেখানে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা রহমতের বৃষ্টি বর্ষন করেন, হ্যাঁ, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এখন একটু চিন্তা করুন, যে হাফিজ সাহেব এবং ক্বারী সাহেব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিফজ পড়ান, যাদের ডানে-বামে, সামনে পিছনে অনেক শিশুরা নিষ্পাপ মুখে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে, সেখানে আল্লাহ তা'আলার কি পরিমাণ রহমত বর্ষিত হয়?

এমন পরিবেশে জীবনের দীর্ঘ একটি সময় অতিবাহিতকারী ব্যক্তির অন্তর কেমন পরিষ্কার হওয়ার কথা? কিন্তু আমরা শুনেছি এবং বন্ধুরাও আমাদেরকে বলেছেন যে, দিলের কাঙ্খিত ঐ অবস্থা নাকি হয় না। এমন পরিবেশে থেকেও দৃষ্টির মধ্যে ময়লা থেকে যায়। কু-দৃষ্টি থেকে অনেকে মুক্ত হতে পারে না। এর কারণ কি?

রহমত বর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই এবং এ পরিবেশে অতিবাহিত সময়কালও সংক্ষিপ্ত নয়। অন্তর তো একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। হাফিজে কুরআন হওয়া সত্ত্বেও পর-নারীকে এমনভাবে দেখে, যেন শিকারী কুকুর শিকারকে দেখছে।

এর কারণটা কি? কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়নি, আবর্জনামুক্ত হয়নি, অন্ধকার এখনো কাটেনি, কিন্তু কেন? উলামায়ে কিরাম বলেছেন, ব্যাপার হল তার অন্তর কুরআনের নূরকে ধারণ করার মত যোগ্য এখনো হয়নি। এটি তৈলাক্ত পাত্রের ন্যায় পড়ে রয়েছে, বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টির কোন পানি সে ধরে রাখতে পারছে না।

প্রিয় ভাইয়েরা! যোগ্যতা তৈরির পন্থা হল, বেশী বেশী যিকির করা। যিকিরের নূর অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বকরীর দুধের ন্যায়। যা ছোট্ট শিশুরাও হজম

করতে পারে। তদ্রূপ সাধারণ মানুষও যিকিরের নূর ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। এমনকি গাফেল থেকে গাফেল অন্তরও যিকিরের নূর ধারণ করতে সক্ষম। যিকিরের নূর যেহেতু হাল্কা, তাই যিকির করতে করতে এক সময় আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হবে। তখন আল্লাহর কালাম কুরআনের নূরও ধারন করতে পারবে। মনে রাখবেন কুরআনের নূর হল ভারী। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

'নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করব গুরুভার বাণী।'

অতএব যে কেউ কুরআনের নূর ধারণ করতে পারে না, এর জন্য যোগ্যতা প্রয়োজন। যখন যোগ্যতা হয় তখন অন্তর কুরআনের নূরও ধারণ করা আরম্ভ করে। তখন অবস্থা এই হয় যে, তীরের পর তীর বিদ্ধ হচ্ছে, শরীর থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছে এমন পরিস্থিতিতে নামায শেষ করার পর কণ্ঠ থেকে আক্ষেপ ঝড়ে পড়ছে, যদি দায়িত্ব পালনে অবহেলার আশঙ্কা না হত, তাহলে সূরা কাহাফ শেষ না করে আমি আজ নামায সমাপ্ত করতাম না। এমন অবস্থাই হয়ে যায়। তখন কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে রাতের পর রাত কেটে যায়, এমনকি রাতভর একটি মাত্র আয়াত বার বার পড়ে এক অপার্থিব স্বাদ লাভ করে।

বুঝা গেল কুরআনের নূর ধারণ করার যোগ্যতা তৈরী হয় আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের যিকির দ্বারা। এ জন্যই আমাদের মাশায়েখরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে, ভাই! যিকির কর। যিকির দ্বারা যোগ্যতা তৈরী হবে, দিল পরিষ্কার হবে। এরপর নামাযের নূর, কুরআনে কারীমের নূর, সকল প্রকার নূরই অন্তর ধারণ করতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।'

এর অর্থ কি?

এর অর্থ হল, তোমরা আমাকে দু'আর মাধ্যমে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে দানের মাধ্যমে স্মরণ করব। তোমরা দু'আ করবে, আর আমি দান করব।

যখন কোন ছেলের চাকরীর ব্যাপারে অফিসারকে বলা হয়, জনাব! ছেলেটির কথা স্মরণে রাখবেন, এর অর্থ কি? এর অর্থ তো এই নয় যে, আপনি ছেলেটির নাম জপবেন; বরং অর্থ হল, আপনি যখন সিদ্ধান্ত দিবেন, তখন আমার ছেলের পক্ষে একটি ভাল সিদ্ধান্ত দিবেন।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করার অর্থ হল, যখন তুমি আমাকে স্মরণ করবে, আমার হুকুম-আহকামগুলো পালন করবে, তখন আমি সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় তোমার পক্ষে রহমত এবং বরকতের সিদ্ধান্ত দিব। এ জন্য ইরশাদ হয়েছে-

فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ.

'যদি বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি।'

وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍمِنْهُ.

'আর যদি বান্দা আমাকে মজলিসে বসে স্মরণ করে, তাহলে আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিস তথা ফিরিশতাদের মজলিসে তাকে স্মরণ করি।

অতএব আমাদের উচিত বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। এর দ্বারা আমরা প্রভূত কল্যাণ লাভে সক্ষম হব।

যিকির না করার শাস্তি

এমন ভাবার কোনই অবকাশ নেই যে, যিকির একটি মুস্তাহাব আমল। করলে ভাল, না করলে ক্ষতি নেই। মনে রাখবেন, যিকির না করলে শাস্তিও রয়েছে। হ্যাঁ, স্বয়ং কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমূখ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে দু:শহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।'

মুফাসসিরীনে কিরাম এখানে আপন রবের যিকির দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নেননি। সকলেই বলেছেন এর অর্থ হল, আল্লাহর স্মরণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অবহেলা করবে, তাকে দু:শহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং যিকির কোন নফল আমল নয়। করলাম তো ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। এর সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে। যদি অবহেলা করা হয়, তাহলে কঠিন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

অতএব আমাদের কর্তব্য হল, আমরা যিকিরকে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বানিয়ে নিব। এর অনেক বরকত রয়েছে। আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। মানুষের জন্য গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়। শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। বান্দার কাছে আল্লাহ তা'আলার মূল দাবীই হল, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ।

মনোযোগের সাথে উপস্থিতি

সর্বোত্তম আমল হচ্ছে নামায। এ নামাযের উদ্দেশ্যও হল, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ। ইরশাদ হয়েছে-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

তোমরা নামায কায়েম কর, আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে। এজন্যই যে নামাযে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থাকে না, সে নামায নামায নয়।
বর্ণিত আছে,

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

'মনোযোগ ব্যতীত নামাযই শুদ্ধ হয় না।'

এমন নামাযের দ্বারা হাযেরী তথা উপস্থিতি সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ মসজিদে উপস্থিত হওয়া এতটুকু হয়। হুযুরী তথা অন্তকরণের উপস্থিতি যা কাম্য তা কিন্তু হয় না। এ জন্যই কিয়ামতের একটি নিদর্শন বলা হয়েছে, মসজিদ নামাযীদের দ্বারা ভরপুর থাকবে, কিন্তু তাদের অন্তর হবে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে খালী। আফসোস এ নেয়ামত আজ আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, এ জন্য উচিত হল বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলার যিকির করা।

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর।'

এখানে বেশী বেশী যিকিরের আদেশ করা হয়েছে।
মনে রাখবেন দু'টি আমল এমন রয়েছে। কুরআনে কারীমে যার কোন সীমা উল্লেখ করা হয়নি। একটি হল যিকির। এছাড়া অন্য সব আমলের সীমা নির্ধারিত আছে।

অধিক যিকির কাকে বলে?

যিকরে কাছীর এর তাফসীর হল,

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ.

যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শয়নাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, তারা হল অধিক যিকিরকারী। মানুষের অবস্থা হল এই তিনটি। হয়তো সে দাঁড়িয়ে থাকে, না হয় বসে থাকে আর না হয় শুয়ে থাকে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, এ তিনো অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চান আমরা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করি। এজন্যই অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আমার প্রিয় এবং পছন্দনীয় বান্দারা সর্বদা আমার স্মরণে ডুবে থাকে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ 'কিছু যুবক এমন আছে, ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল করে না।'

گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار ÷ لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا.

শোকে সন্তাপে জীবনের কোন বাঁকে
অসহায় আমি
ভুলিনি তোমায় ভুলবো না কভু
হে অন্তর্যামী!

সর্বদা অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোযোগী থাকা চাই। এ জন্যই আকাবিররা বেশী বেশী যিকির করার পরামর্শ দিয়েছেন।

যিকিরের বরকত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. তাঁর ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি তখন হযরত শাইখুল হিন্দ র. এর কাছে জালালাইন শরীফ পড়ি। একদিন রাতে তাকরার করতে বসলাম। তাকরারের সময় এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, যা কোনভাবেই সমাধান হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টা করলাম, টীকাও দেখলাম, অন্য ভাইদের সাহায্যও চাইলাম, তা সত্ত্বেও বিষয়টি পরিষ্কার হল না। আমি যেহেতু তাকরার করাতাম, তাই সঙ্গীরা বলল, কালকে সবক আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই

হযরত শাইখুল হিন্দ র. এর কাছে বিষয়টি জেনে নিও। যেন পিছনের সবক সম্পর্কে আমাদের কোন সমস্যা না থাকে এবং পরবর্তী সবক বুঝার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়। আমি দায়িত্বটি গ্রহণ করলাম। অত:পর ফযর নামাযের সময় হওয়া মাত্র আমি কিতাব নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে গেলাম। কিন্তু নামায শেষ করে যখন দাঁড়ালাম ততক্ষণে হযরত শাইখুল হিন্দ র. নিজ কামরায় চলে গেছেন। যেখানে তিনি ফযর থেকে ইশরাক পর্যন্ত একাকীত্বে সময় কাটান। দ্রুত দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আমি তা বন্ধ পেলাম। আমার কষ্ট হল, নিজেকে গাল-মন্দ করলাম যে, তুমি অলসতা করেছ, এখন হযরত কামরায় চলে গেছেন। ইশরাক পড়ে তারপর বের হবেন, তখন পিছনের সবক জিজ্ঞাসা করার আর কোন সুযোগ হয়ত থাকবে না। আমি ভাবলাম, আমার এ অলসতার কারণে এখন নফসকে শাস্তি দিতে হবে। তখন ছিল শীতকাল। আমি মনকে বললাম, ঘরের বাইরে এখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর, যেন হযরত কামরা থেকে বের হওয়া মাত্র বিষয়টি জিজ্ঞেস করে নেয়া যায় এবং আগামী সবকের পূর্বে বিষয়টির সমাধান হয়। সুতরাং কামরার বাইরে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার শরীরে কাপন শুরু হল। প্রচন্ড শীতে আমি কাঁপতে লাগলাম, এমন সময় কামরার ভিতর থেকে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ যিকিরের আওয়াজ এল। হযরত যিকির করছিলেন। আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল এই যে, হযরত শাইখুল হিন্দ র. কামরার ভিতরে যিকির করছিলেন, আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তার স্বাদ পাচ্ছিলাম। এমন স্বাদ যে, শীতের কোন অনুভূতি আমার আর থাকল না।

অত:পর যখন হযরত দরজা খুললেন। হযরতকে দেখে আমার বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না যে, এমন প্রচন্ড শীতের মৌসুমে হযরতের কপাল বেয়ে ঘাম ঝড়ছে। চিন্তা করলাম কেমন যিকির তিনি করেছেন।

হযরত আমাকে দেখে বললেন, আশরাফ আলী! তুমি এখানে? আমি বললাম, হযরত! একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। প্রশ্নটির উত্তর আপনার কাছে জানতে চাই। হযরত বললেন, কোথায় তোমার প্রশ্ন? আমি কিতাব খুলে দেখিয়ে দিলাম। হযরত সেখানেই দাঁড়িয়ে তাকরীর আরম্ভ করলেন। হযরত যখন তাকরীর আরম্ভ করলেন, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, শব্দগুলোও অপরিচিত, অর্থও আমার অজানা, হযরত এমন কথা বলছিলেন

যে, আমি কিছুই বুঝলাম না। কথা শেষ করে হযরত জিজ্ঞেস করলেন, আশরাফ আলী! কিছু বুঝলে? আমি মনে মনে বললাম, হযরত! মেহেরবানী করে আরো একটু সহজ করে বলুন, যেন আমার বুঝে আসে। মুখে বললাম, হযরত! আমার বুঝে আসেনি। একথা শুনে হযরত আবার তাকরীর আরম্ভ করলেন।

এই বার শব্দগুলো পরিচিত মনে হচ্ছিল, কিন্তু এর মর্ম এবারও আমার বোধগম্যের উর্ধ্বে ছিল। বক্তব্য শেষ করে হযরত আবার জিজ্ঞেস করলেন, বুঝলে? আমি বললাম, হযরত! পুরোপুরি বুঝা সম্ভব হয়নি। তখন হযরত বললেন, আচ্ছা আশরাফ আলী! আমার এই মুহূর্তের কথাগুলো তোমার বোধগম্যের অনেক উর্ধ্বে, অন্য কোন সময়ে এ বিষয়টি আমাকে জিজ্ঞেস করে নিও। এ কথা বলে হযরত চলে গেলেন।

হযরত থানভী র. বলেন, আমাদের মাশায়েখরা যিকিরের অনেক বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং যিকিরের কারণে তাদের অন্তরে উলূম ও মা'আরিফের এমন ঝর্ণা প্রবাহিত হত যে, একটি বিষয়কেই তারা বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করতেন। যা কখনো কখনো ছাত্রদের বোধগম্যেরও উর্ধ্বের হত।

এই ছিল যিকিরের বরকত। আর আজ এ যিকিরকেই আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকি। এর প্রতি কোন মনোযোগ-ই দেই না। আমাদের ধারণা যিকির একটি নফল কাজ। অথচ বাস্তবে তা নয়, এর পিছনে অনেক হিকমত লুক্কায়িত রয়েছে। কথা যখন এসেই গেল, তখন বিষয়টি পূর্ণ ব্যাখ্যার সাথেই বলছি, মনোযোগের সাথে শুনুন। বিষয়টি বুঝার রয়েছে।

ইলম এবং ইস্তেহযারের মধ্যে পার্থক্য

একটি হল ইলম আরেকটি হল ইস্তেহযার। এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। ইলম হল একটি বিষয় আর কোন বিষয় সর্বদা অন্তরে মুস্তাহযার তথা উপস্থিত থাকা আরেকটি বিষয়। যেমন সব মু'মিনই জানে যেখানে তিনজন থাকে, সেখানে চতুর্থ হলেন আল্লাহ। যেখানে চারজন রয়েছে সেখানে পঞ্চম হলেন আল্লাহ।

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।'

মানুষ তত্ত্বগতভাবে এ কথা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা সঙ্গে আছেন, কিন্তু

এ বিশ্বাসটি মনের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকা সব মু'মিনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। সকলের মধ্যেই যদি এ বিশ্বাসটি সর্বদা জাগ্রত থাকত, তাহলে গুনাহ কি করে সংঘটিত হয়? গুনাহ তো মু'মিনের দ্বারা এ জন্যই সংঘটিত হয় যে, সে মাঝে মধ্যে ভুলে যায় যে একজন দেখছেন। ছোট-বড় সকলেই বিশ্বাসগত বিচারে এ কথা জানে, কিন্তু এর স্মরণ প্রত্যেকের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকে না।

এর কারণ হল, যখন আমরা পরস্পরে মিলেমিশে জীবন যাপন করি, তখন আমাদের দৃষ্টি উপায়-উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। দৃষ্টি যখন উপায়-উপকরণ পর্যন্ত থেমে যায়, তখন চিন্তা-চেতনা উপায়-উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর যখন মানুষ একাকীত্বে সময় কাটায়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ডুবে থাকে, তখন মানুষের দৃষ্টি সকল প্রকার উপায়-উপকরণকে পিছনে ফেলে সরাসরি উপায়-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ হয়। এ কারণেই কিছু সময় একাকীত্বে কাটানো প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক। আলিম উলামাদের জন্য অন্যান্যদের তুলনায় বেশী জরুরী।

মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব

মানুষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে করুন আপনি কোন ফার্মেসী অথবা ক্লিনিকে বসে আছেন। এমন সময় আপনি বললেন, আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে। তখন ডাক্তার সর্বপ্রথম যে কথাটি আপনাকে বলবে, তা হল আপনি প্যারাসিটামল টেবলেট খেয়ে নিন। আপনি সেখানে বসেই টেবলেটটি খাবেন। কেননা সেখানের পরিবেশ এটাই। কিন্তু যদি আপনি আলিম-উলামাদের কোন মজলিসে অথবা মসজিদে বসা অবস্থায় বলেন, ভাই! আমার প্রচন্ড মাথা ব্যথা হচ্ছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে কোন মুসল্লী আপনাকে বলবে, আরে ভাই! ইমাম সাহেবের কাছে যান, তাকে ফুঁ দিতে বলুন। এ পরিবেশে মনোযোগ মানুষের ফূঁ এর দিকে যায়। কেন? কারণ, মানুষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মানুষ যে পরিবেশে সময় কাটায় ঐ পরিবেশের আছর তার মধ্যে দেখা যায়। আমরা যদি দিন-রাত উপায়-উপকরণের মধ্যেই সময় কাটিয়ে দেই, তাহলে উপায়-উপকরণ দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়ে যাব। আমাদের চিন্তা-চেতনাও এমনই হবে, কিন্তু যদি দুনিয়ার সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

একাকীত্বে আল্লাহ তা'আলার স্মরণে কিছু সময় অতিবাহিত করি, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণ তার প্রতি মনোযোগ আমাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করবে।

নবী-রাসূলদের বিভিন্ন অবস্থা

হযরত মারইয়াম আ. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দনীয় এক বান্দী। তিনি একাকীত্বে জীবন-যাপন করছেন। আল্লাহর প্রতি মনোযোগ মনোনিবেশের এমন এক পর্যায়ে উপনীত হলেন যে, বসে বসে অমৌসুমী ফল খাচ্ছেন। অন্য দিকে দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত আল্লাহর নবী হযরত যাকারিয়া আ. যিনি সাধারণ মানুষের সাথে উঠা-বসা করছেন, দাওয়াত দিচ্ছেন, উপায়- উপকরণের অধীনে জীবন-যাপন করছেন। আসবাব তথা উপায়-উপকরণের অধীনে জীবন কাটালে মানুষেন চিন্তা-চেতনাও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এটি এক স্বভাবজাত বিষয়। অতএব তিনি যখন দাওয়াতের কাজ সম্পন্ন করে ঘরে ফিরলেন,

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

'এবং হযরত মারইয়াম আ. এর সামনে অমৌসুমী ফল পেলেন।'

উপায়-উপকরণের এ পৃথিবীতে বিষয়টি বুঝে আসার মত নয়। তাই জিজ্ঞেস করলেন-

يَا مَرْيَمُ اَنَّا لَكِ هذا

'মারইয়াম! তুমি এ অমৌসুমী ফল কোথায় পেলে?'

হযরত মারইয়াম আ. একাকীত্বে জীবন যাপন করছিলেন, আল্লাহর প্রতি মনোযোগ মনোনিবেশের এক বিশেষ অবস্থা তার উপর বিরাজ করছিল, তাই সরাসরি বলে দিলেন,

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'আল্লাহ তা'আলা যাকে চান বে-হিসাব রিযিক দান করেন।'

হযরত মারইয়া আ. এর এ কথা শুনে হযরত যাকারিয়া আ. যেন জেগে উঠলেন। ভাবলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং উপায়-উকরণের স্রষ্টা।

তিনি এমন করতেই পারেন। তৎক্ষণাৎ তার হৃদয় জুড়ে আবেগের ঢেউ উঠল, দু'আ আরম্ভ করলেন, আয় আল্লাহ! আপনি যদি মারইয়ামকে অমৌসুমী ফল দান করতে পারেন, তাহলে আমাকেও বার্ধক্যে সন্তান দিতে পারেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ

'ঐ মুহূর্তেই হযরত যাকারিয়া আ. স্বীয় প্রতি-পালকের নিকট দু'আ করলেন।'

আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুলও করলেন। কেননা সঠিক সময়ে যে কথা বলা হয়, তা কখনই ব্যর্থ হয় না। তিনি সময় মতো দু'আ করেছিলেন এ জন্য সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল হয়ে যায়।

অত:পর একজন ফিরিশতা তাকে জানালেন যে, আপনাকে পুত্র সন্তান দেয়া হবে।

অপরদিকে হযরত মারইয়াম আ. যিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দী, পূত পবিত্র জীবন যাপনকারীনী, আল্লাহ তা'আলার প্রতি এত বেশী মনোযোগী যে, বসে বসে অমৌসুমী ফল খান।

এই মারইয়াম আ.-ই যখন একাকীত্বের ঐ জীবন থেকে বের হয়ে লোকালয়ে আসলেন। পারিবারিক জীবনে ফিরলেন। তখন একাকীত্বের ঐ বৈশিষ্ট্য আর তার মধ্যে থাকল না। তিনিও উপায়-উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ

'এ কিতাবে হযরত মারইয়াম আ. এর কথা স্মরণ করুন।'

اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

'যখন তিনি গোসল করার উদ্দেশ্যে ঘরের পূর্ব দিকে গেলেন।'

একটি জায়গা বেছে নিলেন, পর্দা টানালেন। গোসলের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا

'এমন সময় আমি হযরত জিবরাঈল আ.কে তার নিকট প্রেরণ করলাম।'

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

'জিবরাঈল আ. পূর্ণ যুবক বেশে তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন।'

হযরত মারইয়াম আ. বর্তমান যুগের বিকৃতমনা কোন নারী তো ছিলেন না

যে, জনশূন্য স্থানে পর পুরুষকে দেখে আনন্দিত হবেন। তিনি তো ছিলেন পূত পবিত্র রমণী। জন মানবহীন স্থানে পর পুরুষকে দেখা মাত্র ঘাবড়ে গেলেন। বলতে লাগলেন-

اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.

'আমি রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার থেকে, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও!'

হযরত জিবরাঈল আ. যখন দেখলেন হযরত মারইয়াম আ. ভয় পেয়ে গেছেন, তখন ভাবলেন দেরি না করে পরিচয় বলে মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেয়া উচিত। তাই বললেন-

اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.

'আমি আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত, যেন আপনাকে একটি পরিশুদ্ধ পুত্র দান করা হয়।'

এ কথা শুনে হযরত মারইয়াম আ. এর আতঙ্ক আরো বেড়ে গেল। ভাবলেন এটা তো আরো বড় বিপদ। আমি একজন কুমারী মেয়ে, আমার ইবাদত বন্দেগীর কথা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ, আমার সৎকর্মের আলোচনা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এখন এ কুমারীত্বের মধ্যে আমার গর্ভে সন্তান হবে? বলতে লাগলেন-

اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ.

'আমার সন্তান কি করে হবে কোন মানুষ তো আমাকে স্পর্শও করেনি?'

وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا

'আর আমি ব্যভিচারিনীও নই।'

হযরত মারইয়াম আ. এর জানা ছিল যে, উপায়-উপকরণের অধীনে সন্তা লাভের পদ্ধতি হল দু'টি।

এক. বিবাহ।

দুই. ব্যভিচার।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এ দু'টির কোনটিই এখানে নেই।

ভেবে দেখুন, চিন্তা আসবাব তথা উপায়-উপকরণ কেন্দ্রিক হচ্ছে। যে ব্যক্তি অমৌসুমী ফল খেতেন, জিজ্ঞেস করলে সোজা বলে দিতেন আল্লাহ দিয়েছেন, যখন পারিবারিক পরিবেশে আসলেন, তখন তার চিন্তাও আসবাব কেন্দ্রিক হয়ে গেল। বলতে লাগলেন-

اَنَّا يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا.

'আমার কিভাবে পুত্র সন্তান হবে? অথচ আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ করেনি, আর আমি ব্যভিচারিনীও নই।'

সন্তান হওয়ার কোন কারণই তো এখানে নেই, তাহলে পুত্র কি করে হবে? বিস্ময়ের সাথে এ প্রশ্ন যখন করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল আ.ও জানিয়ে দিলেন, জুলফিধারী কোন ফকীর নয়, সন্তান তো স্বয়ং আল্লাহই দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন

قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ

মনে রাখবেন كَذٰلِكِ এ সম্বোধন হযরত মারইয়াম আ. এর পূত-পবিত্রতার পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের সাক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এমন কন্যা প্রত্যেককেই দান করুন, যার পবিত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং ফিরিশতা বলছেন,

قال كذالك

হে মারইয়াম! তুমি যা বলছ, তা শতভাগ সত্য। তোমাকে কোন পর পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে অথবা অবৈধ পন্থায় স্পর্শও করেনি। তোমার জীবন পূত পবিত্র জীবন। কিন্তু বাস্তবতা হল, পুত্র স্বয়ং আল্লাহই দান করবেন।

قال ربك هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

'তোমার প্রতিপালকের কথা হল, এটি আমার জন্য একদম সহজ ব্যাপার।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে পুত্র সন্তান দান করলেন।

হযরত মারইয়াম আ. এর এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, যখন তিনি একাকীত্বে জীবন যাপন করছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোযোগ-মনোনিবেশ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, অমৌসুমী ফল দিব্যি বসে বসে খাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন পারিবারিক জীবনে ফিরে আসলেন, তখন তার চিন্তা-চেতনাও আসবাব তথা উপায়-উপকরণ কেন্দ্রিক হয়ে গেল। তখন তার মনেও সংশয় জাগল, আমার গর্ভে সন্তান কি করে হবে?

এ জন্যই বিশেষ করে আলিম-উলামাদেরকে প্রতিদিন কিছু সময় একাকীত্বে কাটানো জরুরী। যেন তাদের আল্লাহর প্রতি মনোযোগ মনোনিবেশের অবস্থা সতেজ থাকে। তাদের মধ্যেও যদি এই অবস্থা না থাকে, তাহলে এসব ঘটনা শুনে ফায়দা কি?

অতএব আমাদের কর্তব্য হল দিনের একটি অংশকে আমরা এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিব। আমাদের বড়রা এমন-ই করতেন। এ সময়টি

ফজর থেকে ইশরাক পর্যন্ত, আসর থেকে মাগরিব অথবা ইশার পরে কিংবা তাহাজ্জুদের পরেও হতে পারে। সুবিধামত একটি সময় নির্বাচন করে একাকীত্বে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা চাই। যিকির করা চাই। তারপর যিকিরের প্রভাব স্বচক্ষে দেখার তাওফীক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বেশী বেশী যিকির করার, তাকে স্মরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

যিকিরের প্রকার

যিকির দু'রকম। হযরত মুফতী শফী সাহেব র. মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে এ বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআনে কারীমের আয়াত-

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ.

এ পর্যন্ত উল্লেখ করে হযরত মুফতী সাহেব র. লিখেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করছেন, তোমরা যিকির কর, নিজ নিজ অন্তরে, চিন্তায়, ধ্যানে কাকুতি-মিনতির সাথে, অনুচ্চ স্বরে আল্লাহকে স্মরণ কর। হযরত বলেন, এ পদ্ধতিকে যিকরে ক্বলবী বলে। তারপর বলেন,

وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

এবং কথার দ্বারাও অর্থাৎ চিৎকার করে নয়; বরং স্বাভাবিক উঁচু আওয়াজেও আল্লাহকে স্মরণ কর।

অনেক জায়গায় নামাযের পর চিৎকার করে যিকির করতে দেখা যায়, অথচ এর কোন প্রয়োজন নেই; বরং স্বাভাবিক আওয়াজে যেভাবে আমাদের মাশায়েখগণ যিকির করতেন, ঠিক সেভাবে যিকির করবে। একে যিকরে লিসানী বলে।

মোটকথা আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে হযরত মুফতী শফী সাহেব র. বলেন, এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যিকিরের এক প্রকার হল, যিকরে ক্বলবী, আরেক প্রকার হচ্ছে যিকরে লিসানী। উভয়টি বৈধ। স্বয়ং কুরআনে কারীমে এর প্রমাণ রয়েছে। আর একাধিক হাদীসেও বিষয়টির বৈধতা পাওয়া যায়।

যিকরে ক্বলবী কাকে বলে?

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, যিকরে ক্বলবী কাকে বলে? দেখুন, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا

'আপনি এমন লোকের অনুসরণ করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি।'

বুঝা গেল অন্তর যাকের তথা যিকিরকারীও হয়, গাফেল তথা যিকিরশূন্যও হয়। কারণ অন্তর যদি যিকির নাই করে, তাহলে অন্তরকে গাফেল করে দেয়ার অর্থ কি? এটা তো সাধারণ একটি কথা যে, কোন মা যখন তার প্রবাসী সন্তানকে চিঠি লিখেন, তখন মা চিঠিতে কি লিখেন? নিশ্চয়ই এরূপ লিখেন না যে, আমার মুখ তোমাকে অনেক স্মরণ করছে, বেটা! আমার চোখ তোমাকে অনেক স্মরণ করছে, আমার মস্তিষ্ক তোমার কথা অনেক মনে করছে; বরং সব সময় এভাবে লিখে থাকেন যে, বেটা! আমার অন্তর তোমার কথা অনেক স্মরণ করছে।

বুঝা গেল স্মরণ করা মানুষের আত্মার আমল, দিলের কাজ। যবান দ্বারা তার প্রকাশ ঘটে। এ জন্যই যিকিরের পদ্ধতি দু'টি। হয় মনে মনে যিকির করবে, আর যদি যবান দ্বারাও প্রকাশ করতে চায়, তাহলে যিকরে লিসানীও করবে। উভয়টি বৈধ।

মূলত স্মরণ হচ্ছে অন্তরের আমল। যদি অন্তরেই স্মরণ না থাকে, তাহলে স্মরণ অন্য কোথাও থাকে না। বুঝা গেল যিকরে ক্বলবী বলা হয়, আল্লাহ তা'আলাকে মনে মনে স্মরণ করা। আমাদের মাশায়েখগণ উভয় পদ্ধতিতেই যিকির করেছেন।

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র.

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. দিল্লীতে অবস্থানরত নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার এক বুজুর্গের হাতে শৈশবকালেই বাইআত গ্রহণ করেন এবং মাত্র সতের বছর বয়সে খিলাফত লাভ করেন। সাথে সাথে নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার বরকত লাভের সুসংবাদও প্রাপ্ত হন। কিন্তু হযরতের শায়খ দ্রুত ইন্তেকাল করার কারণে হযরত বলেন, আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম বয়স অল্প, এ বয়সে কোন বড় বুজুর্গের তত্ত্বাবধান ব্যতীত কি করে থাকি? এ জন্য হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝাঞ্ঝানবী র. এর হাতে পুনরায় বাইআত গ্রহণ করি। হযরত নূর মুহাম্মদ ঝাঞ্ঝানবী র. ছিলেন চিশতিয়া সিলসিলার বড় বুজুর্গ।

এভাবে হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র.কে আল্লাহ তায়ালা দুই

সমুদ্রের মোহনা বানিয়ে দিয়ে ছিলেন, নকশবন্দিয়্যা এবং চিশতিয়া উভয় সিলসিলার ফয়েয বরকত তিনি লাভ করেন। আমাদের দেওবন্দী আকবিরীনদের মধ্যে এ ফয়েয দু'টি পথে এসেছে।

এক. হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র. এর মাধ্যমে (নকশবন্দীয়্যা সিলসিলার ঐতিহ্য হল ইত্তিবায়ে সুন্নত আর চিশতীয়া সিলসিলার ঐতিহ্য হল ইশক। হযরত হাজী সাহেব র. এর মধ্যে উভয় সিলসিলার বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। সন্দেহ নেই যে, ইশক এবং ইত্তিবায়ে সুন্নতের সম্মিলন অত্যন্ত দুরূহ একটি বিষয়)।

وصل کالطف یہی ہے کہ رہے ہوش بجا ÷ دل بھی قابو میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو

চেতন মনে দীদার হওয়া
এটাই মিলন সুখ,
প্রিয়ার সকাশে হুশ না হারালে
থাকে না কোন দু:খ।

হ্যাঁ, আমাদের দেওবন্দী আকাবিরদের মধ্যে এক দিকে ইশকও ছিল, অপরদিকে সুন্নত অনুসরণের জজবাও ছিল।

در کف جام شریعت در کف سندان عشق ÷ ہر ہوسناک نداند جام وسنداں باختن

এক হাতে তার কাঁচের থালা
পাথর অন্য হাতে,
মস্ত জটিল খেলারে ভাই
সন্দেহ নেই তাতে।

শরীয়ত-তরীকতের সমন্বয় অত্যন্ত জটিল হলেও আলহামদুলিল্লাহ হাজী সাহেব র. এর মাধ্যমে এ দু'টি নেয়ামত আমরা লাভ করেছি।

দুই. আর দ্বিতীয় মাধ্যমটি হল হাদীস। দেওবন্দী উলামায়ে কিরাম হাদীসের যে ফয়েয লাভ করেছেন তা হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. ও শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দিদী র. এর মাধ্যমে। ইলমের ফয়েযও এ দু'টি পথে এসেছে।

মোটকথা, আমাদের উস্তাদগণের মধ্যে প্রত্যেকেই একদিকে হাদীসের উস্তাদ অপরদিকে নকশবন্দী সিলসিলারও ধারক ছিলেন। এজন্যই আকাবিরদের মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব আমাদেরও অধিক পরিমাণে যিকির করা উচিত।

যিকরে ক্বলবীর পদ্ধতি

যিকরে ক্বলবীর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। এ জন্যই এ ক্ষেত্রে যুবক-বৃদ্ধের কোন ভেদাভেদ নেই। এ পদ্ধতিতে যিকির করতে থাকলে এক পর্যায়ে যিকির অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

একটি কথা স্মরণে রাখা চাই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যে, মানুষ একই সাথে দু'টি কাজ করতে পারে। এক দিকে পানাহার, বন্ধুদের সাথে গল্পও চালিয়ে যেতে পারে। আবার পাশাপাশি দেমাগকে অন্য কোন চিন্তায় ব্যস্তও রাখতে পারে।

এর একটি উদাহরণ হল অফিসে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্বামী কোন কারণে স্ত্রীকে ধমক দিলেন। স্ত্রীর কোন ভুলের কারণে তিনি ধমকটি দিয়েছেন। এখন স্ত্রী সারা দিন সাংসারিক সব কাজ-কর্ম তো করবে, কিন্তু তার মাথায় সর্বদা স্বামীর ঐ ধমকের কথাগুলো ঘুরপাক খেতে থাকবে যে, স্বামী তাকে কি কারণে কি বলে ধমক দিয়েছেন।

বুঝা গেল দুনিয়ার কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও মানুষের মন অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে। এর নামই হচ্ছে যিকরে ক্বালবী। অর্থাৎ মনের জল্পনা কল্পনা যদি পার্থিব বস্তু সংশ্লিষ্ট না হয়ে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাত সম্পর্কিত হয়, তাহলে একেই বলা হবে আল্লাহর স্মরণ। এর নামই হচ্ছে যিকরে ক্বলবী এবং এটি অত্যন্ত সহজ। আল্লাহ ওয়ালারা এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হন না। এমনকি বলা হয়

دست بکار دل بیار

অর্থাৎ 'হাত কাজে ব্যস্ত আর দিল আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ডুবন্ত।'

আমাদের নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার বুজুর্গরা বলেন, তোমরা সাধনার দ্বারা এ অবস্থাটি অর্জন কর যে, হাত পা কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকবে আর অন্তর আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ডুবে থাকবে। যখন এ অবস্থা অর্জিত হবে তখন মানুষের গোটা জীবন আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অতিবাহিত হবে। এখন আমরা অল্প সময়ের জন্য এই পদ্ধতিতে যিকির (মুরাকাবা) করব।

এর পদ্ধতি হল, আমরা পার্থিব সবকিছু থেকে মনকে পৃথক করে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হব। দুনিয়ার সব কিছু থেকে মনকে আলাদা করার জন্য চোখ বন্ধ করে অন্তরকে মনোযোগী করে বসতে হয়। যদিও চোখ বন্ধ করা আবশ্যকীয় নয়। কেননা বুজুর্গদের চোখ খোলা থাকত, এ

অবস্থাতেই তারা যিকিরে কালবী অব্যাহত রাখতেন। কিন্তু যারা প্রাথমিক পর্যায়ের, শিখানোর স্বার্থে তাদেরকে বলা হয় ভাই! একাগ্রতা আনার জন্য একটু চোখ বন্ধ করে বসুন।

এ পদ্ধতিতে যিকির দাঁড়ানো অবস্থায়ও হতে পারে, শয়ন অবস্থায়ও হতে পারে। অনুশীলনের জন্য শুধু চোখ বন্ধ করতে বলা হয় যে, ভাই! চোখ দুটো বন্ধ করুন, মাথা নত করে অন্তরের দিকে মনোযোগী হোন। বরং আমাদের মাশায়েখরা এ কথাও বলেন যে, কোন কাপড় থাকলে মাথার উপর দিয়ে নিন। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কাপড় দ্বারা অনেক সময় মাথা ঢেকে নিতেন।

যিকিরকারী এ কাপড়কে নিজের কাফন কল্পনা করবে অর্থাৎ মনে মনে ভাববে আজ যেভাবে আমি কাপড়ে আবৃত রয়েছি একদিন এভাবেই আমাকে কাফনের কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া হবে। চোখ বন্ধ করার সময় এ কথা মনে করবে যে, আজ স্ব ইচ্ছায় চোখ দু'টি বন্ধ করছি, এক সময় এমন আসবে যখন ইচ্ছা ব্যতীতই চোখ বন্ধ হয়ে যাবে।

যিকিরে কলবীর সময় দুনিয়ার সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে একটি মাত্র চিন্তাই রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলার রহমত আসছে, আমার অন্তরে প্রবেশ করছে, আমার অন্তরের কালিমা দূর হচ্ছে এবং আমার অন্তর বলছে আল্লাহ! আল্লাহ!! আল্লাহ!!! আর আমি আমার অন্তরের যিকির শুনছি। অর্থাৎ মুরাকাবায় বসে আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। কিছুক্ষণ পর পর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা, শরীরে ঝাঁকি দেয়া এমন কোন কিছুই করবে না; বরং নিশ্চুপ নীরব হয়ে বসে থাকবে। কারো স্মরণে মগ্ন অবস্থায় মানুষ যেমন বসে থাকে। মনে করবে যেন আমি আল্লাহর স্মরণে হারিয়ে গেছি।

মোটকথা, মুরাকাবা তথা যিকরে ক্বলবীর পদ্ধতি হল, দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে মাথাকে খালি করে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে এমনভাবে বসবে যে, মনে মনে ভাববে আল্লাহর রহমত আসছে, আমার অন্তরে প্রবেশ করছে, অন্তরের মলিনতা দূর হচ্ছে এবং আমার অন্তর আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছে, আর আমি তা শুনছি।

প্রাথমিক অবস্থায় দিল থেকে যিকিরের কোন আওয়াজ আসবে না। মনে হবে দিল একটি পাথর, কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ

আমি বান্দার সাথে ঐ আচরণ-ই করি বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে।

অতএব আপনি যখন প্রতিদিন এ বিশ্বাস নিয়ে বসবেন যে, আমার অন্তর আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছে তো একদিন সত্যিই দিল আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা আরম্ভ করে দিবে।

যিকরে ক্বলবীর একটি উপমা

যিকরে ক্বলবীর একটি উদাহরণ হল লাউড স্পীকার। যার মাধ্যমে আমরা ধ্বনি শুনতে পাই। আচ্ছা এর মধ্যে কি জীবন্ত কোন কিছু থাকে? না। এর মধ্যে একটি পর্দা থাকে, পর্দাটি চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে আলোড়িত হয়। এভাবেই লাউড স্পীকার থেকে ধ্বনি বের হয়।

অতএব একটি নির্জীব বস্তু যদি আলোড়িত হওয়ার কারণে ধ্বনি দিতে পারে, তাহলে জীবন্ত বস্তু কেন পারবে না? শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি বান্দার সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। দিলের যিকির শুধু যিকিরকারীই শুনতে পায়, অন্য কেউ শুনতে পায় না। যদি সকলেই অন্তরের যিকির শুনতে পেত তাহলে আমরা সকলেই যিকিরকারী হয়ে যেতাম। আমরা আল্লাহওয়ালাদের অন্তরের যিকির স্বকর্ণে শুনে নিতাম। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিষয়টিকে গোপন রেখেছেন।

میان عاشق و معشوق رمزیست ÷ کراماں کاتبین را ہم خبر نیست

প্রেমিক যুগলের ভাব বিনিময়
আজব রহস্যে ঘেরা,
পায় না খবর ডানে-বামের
ফিরিশতা হলেও তারা।

হ্যাঁ আশিক মা'শুকের মধ্যে এমন কিছু ইশারা ইঙ্গিতও চলে যা অন্য কেউ তো দূরের কথা দুই কাঁধের ফিরিশতাও জানে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্তরের যিকিরকে লুক্কায়িত রেখেছেন। হাদীস শরীফে একে যিকরে খফী, যিকরে সিররী, যিকরে খামেল, যিকরে ক্বলবী তথা গোপন যিকির, অন্তরের যিকির ইত্যাদি নামে অখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া র.ও একে যিকরে খফী বা গোপন যিকির

বলেছেন। ফাযায়েলে যিকির পড়ুন, সেখানে এক জায়গায় হযরত লিখেছেন যে, যে যিকির হিফাযতকারী ফিরিশতারা পর্যন্ত শ্রবণ করতে সক্ষম নন, তাকে যিকরে খফী বা সিররী বলা হয়। এ যিকির সম্পর্কে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিই অবগত যিনি যিকির করছেন অথবা যার জন্য যিকির করা হচ্ছে, মধ্যখানে ফিরিশতারও অনুপ্রবেশ থাকে না।

কিছু সময়ের এ যিকির মানুষকে সকল প্রকার উপায়-উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বয়ং উপায়-উপকরণের স্রষ্টার সাথে জুড়ে দেয়। এ জন্যই এ একাকীত্ব খুবই জরুরী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার স্মরণের তাওফীক দান করুন। আমাদের অন্তরগুলোকে তার স্মরণে সদা জাগ্রত রাখুন। অন্তর জগত বড় আশ্চর্য জগত। এর যিকিরও বড়ই আশ্চর্যজনক।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।' -আল হাদীস

কুরআনের স্বাদ

মু'মিনের কথা বলব যে কি
তার নিত্য নতুন শান,
চলনে বলনে প্রতিটি কদমে
সে যে আল্লাহর নিশান।
অজানা একটি তথ্য শুন
ও হে আদম সন্তান!
মু'মিন দেখতে ক্বারী হলেও
বাস্তবে সে কুরআন।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا.

وقال الله تعالى في مقام آخر: الر كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

وقال الله تعالى في مقام آخر: اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهٗ، او كما قال عليه الصلوة والسلام.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

কুরআনে কারীম হল আল্লাহর কালাম। মানবতার নামে আল্লাহর পয়গাম। একে ইবাদত গ্রন্থ বলা হয়নি, বলা হয়েছে হিদায়াত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি শুধু জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ইবাদত করাই শিক্ষা দেয়নি। বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত মানুষকে তার প্রতিটি কদমে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। সুতরাং এটি হচ্ছে হিদায়াত গ্রন্থ।

এ গ্রন্থটি চোখ ভরে দেখাও ইবাদত। পাঠ করাও ইবাদত। এর পাঠ দানও ইবাদত। এ কিতাব শ্রবণ করাও ইবাদত। মানুষকে শুনানও ইবাদত। এটি অনুধাবন করাও ইবাদত। অন্যকে বুঝানোও ইবাদত। সর্বোপরি এ কিতাব অনুসারে আমল করা হচ্ছে সব চেয়ে বড় ইবাদত।

এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আশ্চর্যজনক ক্ষমতা রেখেছেন। এই বাণী সরাসরি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। এটি মানব জাতির জীবন যাপনের মৌলিক নীতিমালাই শুধু নয় মানব জীবনের জন্য আবে হায়াত তথা মৃত সঞ্জীবনী সুধাও বটে।

পৃথিবীতে যেমন লোহাকে আকর্ষণ করার জন্য চুম্বক রয়েছে, চুম্বক যেখানেই থাকবে, লোহাকে তার দিকে টানবে। তদ্রূপ কুরআনে কারীমও আল্লাহ তা'আলার রহমতকে আকর্ষণ করে। এ জন্যই নির্দেশ হল,

وَاِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

'যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন নীরব থাক, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।'

অতএব যেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। কুরআন হল আল্লাহর রহমত আকর্ষণ করার চুম্বক। এ কুরআন মানুষের অন্তরকেও তার দিকে আকৃষ্ট করে। এর মাধ্যমে অন্তর আলোকিত হয়, মানুষের অন্তরের সকল প্রকার অন্ধকার দূর হয়ে যায়, আত্মিক সকল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়। ইরশাদ হয়েছে-

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ.

'এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহকে রোগমুক্ত করবে।' -তাওবা : ১৪

আরো ইরশাদ হয়েছে-

شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ.

'অন্তরের রোগের নিরাময়' -ইউনুস : ৫৭

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত।' -বনী ইসরাঈল ৮২

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ.

'আপনি বলুন, এটি মু'মিনদের জন্য হিদায়াত এবং শিফা।'

(সুবহানাল্লাহ!) কুরআন হচ্ছে আত্মিক রোগ থেকে মুক্তি লাভের প্রেসকিপশন। কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং এর বিধানাবলী পালন করুন। বিসমিল্লাহ এর ب থেকে আরম্ভ করে সূরা নাসের والنَّاسِ এর س পর্যন্ত পড়ুন। মাথার চুল থেকে আমল শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত আমল করুন। তাহলে কুরআন যেমন সম্মানিত গ্রন্থ তদ্রূপ যে বান্দা তার জীবনকে কুরআনের দিক নির্দেশনামত গড়বে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকেও সম্মানিত করবেন।

কুরআন যাকে সম্মানিত করেছে

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী র., হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. দুনিয়াব্যাপী এতো গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মান কেন পেলেন? এ কুরআনের বদৌলতে। তাদের জীবন সম্পূর্ণ কুরআন মুতাবিক ছিল। তারা কুরআনের ছায়ায় জীবন যাপন করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তারা মাকবুল হয়েছেন। আকাশ ছোঁয়া সম্মান-মর্যাদা লাভ করেছেন।

আজ পৃথিবীর দূর-প্রান্ত থেকে তাদের জন্মভূমিকে এক নযর দেখার জন্য মানুষ ভিড় করে। আমেরিকার লোকেরাও আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাদের জন্মভূমিকে একবার এসে দেখবে। এ সব কি কারণে? এ কুরআনের বদৌলতে। প্রত্যেক যুগেই যারা কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে এ ভাবেই উজ্জ্বল করেছেন, সম্মানিত করেছেন। আমাদের হাতে সম্মান লাভের গ্যারান্টি এ কুরআন আজো বিদ্যমান।

অন্তর এ স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ

কুরআনের উপকারিতা থেকে, এর স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত, কিন্তু কেন? উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, এক ব্যক্তির সর্দি লেগেছে। আপনি তাকে

মিশকে আম্বর দিয়ে বললেন, ভাই বলুন তো! এ সুগন্ধিটি কেমন? সে কিছুই বুঝবে না। অথচ মিশ্‌কে আম্বর সুগন্ধিটি মূল্যবান হওয়া সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটি সর্দির রোগি হওয়ার কারণে এর সুগন্ধি অনুভবে অক্ষম। তদ্রূপ কুরআনে কারীমের স্বাদ সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন গুনাহের সর্দি লেগে যায়, তখন মানুষ এর স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। কুরআন তিলাওয়াত করে, কিন্তু তার স্বাদ পায় না।

যদি কেউ কুরআনের স্বাদ লাভ করতে চায়, তাহলে সে যেন গুনাহ ছেড়ে দেয়। তারপরে দেখে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

ফিরিশতা ব্যতীত কেউ এ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। অর্থাৎ এ কুরআন একমাত্র ঐ ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারবে, যে পবিত্রতা অর্জন করেছে। এর বাহ্যিক একটি অর্থ তো হল, যে ব্যক্তি তার বাহিরকে পবিত্র করেছে সে স্পর্শ করবে।

দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হল, যে ব্যক্তি গুনাহের দ্বারা অপবিত্র হয়ে আছে পাপাচার এবং গাফলতের মধ্যে জীবন-যাপন করছে সে কুরআনের স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞই থাকবে। কুরআনের স্বাদ পেতে হলে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হতে হবে। কুরআনের স্বাদ কি? সাহাবায়ে কিরাম রা.কে জিজ্ঞেস করুন, সারা রাত তাহাজ্জুদ নামাযে তারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হযরত ফাতিমা রা. দু'রাকাত নফল নামাযের নিয়ত করেছিলেন, কুরআন পড়তে থাকলেন, এক পর্যায়ে দেখলেন যে, ফযরের আযানের সময় হয়ে গেছে। তখন দু'আ করলেন এবং ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন আয় আল্লাহ! আমি তো মাত্র দু'রাকাত নফলের নিয়ত করেছিলাম। তোমার রাত কত ছোট, দু' রাকাত নফল পড়তেই তা শেষ হয়ে গেল।

তাদের অভিযোগ ছিল রাত ছোট হওয়ার। কুরআন তিলাওয়াত করে করে তারা সমস্ত রাত কাটিয়ে দিতেন। কুরআন তিলাওয়াতে এমন স্বাদ-ই তারা পেতেন (সুবহানাল্লাহ!) তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য অনুগ্রহ ছিল। তাহাজ্জুদ নামাযের সময় যদি কেউ মদীনা মুনাওয়ারার অলিতে গলিতে ঘুরতো তাহলে প্রতিটি ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেত। মধু পোকা যে রকম গুণ গুণ আওয়াজ করে, প্রতিটি ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের তেমনই গুণ গুণ আওয়াজ ভেসে আসত।

আল্লাহ তা'আলা যে সাহাবীর তিলাওয়াত শুনার আগ্রহ করেছেন

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। (সুবহানাল্লাহ!) তিনি আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করছিলেন এমন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একদম নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

নবীজী সা. : ইবনে কা'ব! কুরআন তিলাওয়াত কর।

উবাই ইবনে কা'ব : আয় আল্লাহর রাসূল! এ কুরআন আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আপনার সম্মুখে তিলাওয়াত করব?

নবীজী সা. : হ্যাঁ, আমাকে এমন আদেশ-ই করা হয়েছে।

উবাই ইবনে কা'ব রা. বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। বুঝে ফেললেন, এ আদেশ উপর থেকে হয়েছে।

উবাই ইবনে কা'ব : آاللّٰه سَمَّانِيْ؟ হে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন?

নবীজী সা. : نَعَمْ اللّٰه سَمَّاكَ. হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তোমার নাম উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, ইবনে কা'বকে বল, সে যেন কুরআন তিলাওয়াত করে। হে আমার হাবীব! আপনিও তার তিলাওয়াত শুনুন। আর আমি স্বয়ং তার তিলাওয়াত শুনব।

কেমন মহব্বত আর ভালবাসার সাথে তারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনার আগ্রহ স্বয়ং রহমানুর রহীম প্রকাশ করেছেন।

তোমার কান্না ফিরিশতাকেও কাঁদিয়েছে

একজন সাহাবী তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করে কেঁদে ফেললেন। অত:পর যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কুরআন তিলাওয়াত করা এবং ক্রন্দন করা ফিরিশতাকেও ক্রন্দনে বাধ্য করেছে। (সুবহানাল্লাহ!) তাঁরা কেমন ছিলেন। তাদের কান্না দেখে ফিরিশতারাও কাঁদতেন। কুরআন তিলাওয়াতে তারা এমন আশ্চর্য স্বাদ আর মজা অনুভব করতেন যে, তীর বিদ্ধ হচ্ছেন তারপরও নামায ছেড়ে দিচ্ছেন না, উপরন্তু সঙ্গী সাহাবীকে বলছেন, আজ যদি দায়িত্ব

পালনে অবহেলার আশঙ্কা না হত তাহলে আমি তীরের পর তীর বিদ্ধ হতাম, তারপরও সূরা কাহাফ শেষ না করে নামায শেষ করতাম না।
তীর বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকাঙ্ক্ষা হত যে, সূরা কাহাফ শেষ করি। আর আমাদের অবস্থা তো হল নামাযরত অবস্থায় সম্মুখ দিয়ে একটি মাছি উড়ে গেলেও আমাদের নামাযের মনোযোগ খতম হয়ে যায়।
বুঝা গেল কুরআন তিলাওয়াতের ভিন্ন স্বাদ আর মজা রয়েছে।

কুরআন শ্রবণে নাস্তিকের কান্না

প্রসিদ্ধ ক্বারী আবদুল বাসিত র. এর নাম হয়ত আপনারাও শুনেছেন। একবার এ অধম আমেরিকা সফরে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ক্বারী আবদুল বাসিত র.ও ছিলেন। তিনি কুরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন। আর এ অধম কোথাও ইংরেজিতে, কোথাও উর্দূতে সমাবেশ যেমন হত বয়ান করতাম।
আপনারা ভালই জানেন, ক্বারী আবদুল বাসিত র. কেমন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, ক্বারী সাহেব! আপনি এতো সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত করেন, আপনি কি কুরআনে পাকের কোন মু'জিযা দেখেছেন? ক্বারী সাহেব বললেন, হ্যাঁ আমি অনেক মু'জিযা দেখেছি।
লোকেরা বলল, আমাদেরকেও কিছু শুনান।
তখন ক্বারী সাহেব বললেন, একবার আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট কোন কাজে রাশিয়া গেলেন। রাশিয়ার বড় কর্মকর্তারা মিটিং শেষে তাকে বলল, তোমরা কেন মুসলমান হয়ে আছো? ইসলাম ছেড়ে দাও, আমাদের মত হয়ে যাও, আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। তোমরাও উন্নত জাতিতে পরিণত হবে। আমাদের প্রেসিডেন্ট তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। দু'তিন বছর পর প্রেসিডেন্টকে আবার রাশিয়া সফর করতে হল।
ক্বারী সাহেব বলেন, তখন আমাকে জানালো হল যে, প্রেসিডেন্ট চান আমিও যেন তার সফরসঙ্গী হই। আমি অবাক হলাম। কারণ আমার প্রয়োজন তো কোন আরব দেশ অথবা পাকিস্তান, হিন্দুস্তান যেখানে মুসলমানরা বসবাস করে এমন কোন দেশ সফরের সময় হওয়ার কথা।

রাশিয়া তো কাফিরের দেশ। তারা সকলেই নাস্তিক। দ্বীন ধর্ম কিছুই মানে না। সেখানে আমার প্রয়োজন হল কেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি প্রস্তুত হলাম এবং প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্ট মহোদয় রাশিয়ার কর্ম-কর্তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার পর বললেন, আমার এ বন্ধু আপনাদেরকে কিছু পড়ে শুনাবেন। তারা কিছুই বুঝল না। কি পড়া হবে? আমি ইঙ্গিত পেতেই তিলাওয়াত শুরু করে দিলাম এবং পড়লাম

طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى.

'ত্ব-হা, আপনার উপর কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি যে, আপনি কষ্টে পতিত হবেন, বরং এমন সব লোকের উপদেশের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে যারা আল্লাহকে ভয় করে।'

ক্বারী সাহেব র. বলেন, আমি দু' রুকু তিলাওয়াত করলাম এবং এ আয়াতগুলোও তিলাওয়াত করলাম-

اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ.

'আমি-ই আল্লাহ, আমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তোমরা আমার-ই ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায পড়।'

এ আয়াতগুলো শ্রবণ করে এক সময় হযরত উমর রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ক্বারী সাহেব র. বলেন, দু' রুকু তিলাওয়াত করে যখন আমি মাথা উঠালাম, তখন কুরআনে পাকের মু'জিযা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করলাম যে, সম্মুখে উপবিষ্ট নাস্তিকদের মধ্যে চারজন অঝোরে ক্রন্দন করছে।

ক্বারী সাহেব বলেন, তাদের কান্না দেখে সকলেই বিস্মিত হল। আমাদের প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কেন কাঁদছেন? তারা বলল, এ লোক কি পড়ছেন? আমরা তো কিছুই বুঝিনি, কিন্তু তার পড়ার মধ্যে এমন প্রভাব ছিল যে, আমাদের অন্তরগুলো মোমের মত বিগলিত হয়ে যায় এবং চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে।

ক্বারী সাহেব বলেন, আমি কুরআনে পাকের এ মু'জিযা স্বচক্ষে দেখেছি। যারা কুরআনকে বিশ্বাস করে না, কুরআনকে চিনে না, কুরআনে পাক তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হলেও কুরআন তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। তাদের অন্তরকেও নাড়িয়ে দেয়।

কুরআন মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে

বন্ধুরা আমার! সমুদ্রের পথ কখনো কেউ তৈরি করে দিয়েছি কি? সমুদ্র নিজেই নিজের পথ করে নেয়। এ কুরআনে কারীমও আল্লাহ তা'আলার রহমতের ঐ সমুদ্র যা মানুষের অন্তরে নিজেই নিজের পথ করে নেয়। এ কুরআন এ জন্য প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমরা পৃথিবীর বুকে সম্মান লাভ করতে পারি।

দেখুন! কুরআনে কারীমের কভার পৃষ্ঠা (Cover) যেখানে কিছুই লিখা থাকে না, মাসআলা হল আয়াত লিখা পৃষ্ঠা যেমন অজু ছাড়া স্পর্শ করা যায় না, তদ্রূপ কুরআনের আয়াতশূন্য ঐ কভার পৃষ্ঠাও অজু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে আরে ভাই! কভার পৃষ্ঠার উপর তো কিছু লিখা নেই, কভার কেন স্পর্শ করা যাবে না? মুফতি সাহেবগণ এর জবাব দেন যে, যদিও কভার পৃষ্ঠার উপর কিছুই লিখা নেই, কিন্তু এ কভার পৃষ্ঠা সিলাই করে কুরআনে কারীমের সাথে একেবারে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, কুরআনের অংশ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, কুরআনে কারীমের অংশ হওয়ার কারণে এ কভার পৃষ্ঠার সম্মান বেড়ে গেছে। অপবিত্র মানুষ এখন আর একে স্পর্শ করতে পারবে না।

আমার বন্ধুরা! মূল্যহীন একটি কাগজের কভার কুরআনের সাথে লেগে যাওয়ার কারণে, কুরআনের অংশ হওয়ার কারণে যদি এত মূল্যবান হয়ে যায়, তাহলে মানুষ যদি কুরআনকে তার সীনার সাথে লাগিয়ে নেয়, কুরআনকে তার জীবনের অংশ বানায়, তাহলে তার ইজ্জত, সম্মান কেন বৃদ্ধি পাবে না?

অতএব এ কুরআন আমাদেরকে সম্মানিত করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

কি করে আমীরুল মু'মিনীন হলেন?

কথা শেষ করতে চাই। সাইয়্যিদিনা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. তার শাসনামলে একবার মুজাহিদদের একটি দল নিয়ে মক্কার কোন এক পাহাড়ে উঠছিলেন। প্রচন্ড রোদ ছিল, তিনি হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সম্মুখে বিস্তৃত উপত্যকায় চোখ বুলাতে লাগলেন। গোটা সৈন্যদলও পিছনে দাঁড়িয়ে। ঘামে ভিজে যাচ্ছেন। কোথাও ছায়ার চিহ্নও নেই। প্রখর রোদের উত্তাপ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নেই। সকলেই অস্থির।

আমীরুল মু'মিনীনকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি ভাল আছেন তো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে? তিনি বললেন, আমি পাহাড়ের পাদদেশে দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেখানে আমি উট চরাতাম। ছোট বেলায় উট চরানোর কায়দা আমার জানা ছিল না। তাই আমার উটগুলো খালি পেটে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরত। আমার পিতা খাত্তাব আমাকে বকা-ঝকি করতেন। বলতেন, ওমর! তুমি জীবনে কি করবে? তুমি তো উটও চরাতে পার না। ঐ সময়ের কথা আমি স্মরণ করছি। যখন আমি ওমরের উট চরানোর নিয়ম পর্যন্ত জানা ছিল না। আর আজ আমি দেখছি, ইসলাম এবং আল-কুরআনের বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমি ওমরকে আমীরুল মু'মিনীন বানিয়ে দিয়েছেন।

এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا

আল্লাহ তা'আলা এ কুরআনের বদৌলতে মানুষকে সম্মান-মর্যাদা দান করেন। আমরাও যদি এ কুরআন তিলাওয়াত করি এবং তদনুযায়ী আমল করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও পৃথিবীর বুকে সম্মান-মর্যাদা দান করবেন। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

'পড় তুমি কুরআন, তোমার রব করবেন তোমার ইকরাম।' তোমার রব তোমাকে ইয্যত দিবেন, সম্মান দিবেন, তোমার ভিতর-বাহিরকে সুন্দর করে দিবেন। এর নাম হচ্ছে কুরআন।

আমার শায়খ হযরত মাওলানা গোলাম হাবীব নাক্শবন্দী র. বলতেন

তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি পেরেশান!
তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি না-কাম!
তোমার হাতে কুরআন, আর তুমি থাকবে গোলাম!
না, না, বলছে আমাদের এ কুরআন,
আমাকে বিশ্বাসকারীরা হচ্ছে মুসলমান।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

'পড় তুমি কুরআন, তোমার রব করবেন তোমার ইকরাম।'

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

'রহমান কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বাকশক্তি দিয়েছেন।'

মোটকথা, কুরআন আমাদেরকে সম্মানিত করার জন্য আগমন করেছে। আমরা একে সিনার সাথে লাগাই। সাহাবায়ে কিরাম রা. এ কুরআনকে তাদের সিনার সাথে লাগিয়েছিলেন। ফলে এ কুরআন তাদের জীবনকে বদলে দিয়েছিল।

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ÷ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی ÷ عرب کی زمین جس نے ساری ہلادی

হেরা থেকে আসলেন নেমে
সকলের মাঝে তিনি
নিয়ে এলেন সঙ্গে করে
মহা বিপ্লবের বাণী।
আরব-আজম উঠল কেঁপে
জাগল অযুত প্রাণ
কি ছিল সেই বাণীর মাঝে
জানেন আল্লাহ মহান।

এ কুরআন গোটা আরব ভূখন্ডকে আলোড়িত করেছিল। তাদের জীবনকে বদলে দিয়েছিল। তারা কুরআনকে বুকে ধারণ করে যেখানেই পা রেখেছেন, সফলতা তাদের পদচুম্বন করেছে।

بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسری سے دبے ÷ چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے

কোন সে বলে ছুটত রাখাল
পাহাড় সাগর চিরে,
যত শক্তি ধরের দন্ত নখর
ভাংতো নির্দয়ে।

جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا ÷ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے

কর্পূরকে যারা নিমক ভেবে
বাড়িয়ে দিতেন হাত,

তাদের দাপটে কাঁপত পৃথিবী
সকল কাফির জাত।

হ্যাঁ, তারা দুনিয়ার ভাগ্য বদলে দিয়েছিলেন এ কুরআনেরই বদৌলতে। অতএব কুরআনের অংশ হয়ে যান। কুরআন তিলাওয়াতকারী হয়ে যান, হাফিযে কুরআন হয়ে যান, আলিমে কুরআন এবং আমিলে কুরআন হয়ে যান, নাশিরে কুরআন, দা-ঈয়ে কুরআন হয়ে যান; বরং আশিকে কুরআন হয়ে যান।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ

আয় আল্লাহ! কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত করে দিন। (আমীন!) এটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসনূন দু'আ।

ہر لحظہ ہے مؤمن کی نئی شان نئی آن ÷ کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان

یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مؤمن ÷ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

মু'মিনের কথা বলব যেকি
তার নিত্য নতুন শান,
চলনে বলনে প্রতিটি কদমে
সে যে আল্লাহর নিশান।
অজানা একটি তথ্য শুন
ও হে আদম সন্তান!
মু'মিন দেখতে ক্বারী হলেও
বাস্তবে সে কুরআন।

যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করে, কুরআনের মত সেও সম্মানিত হয়ে যায়। আর এ কুরআনের বদৌলতেই এ জায়গাটি অর্থাৎ থানাভবনের নাম আজ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর সর্বশেষ রাষ্ট্র

আলহামদুলিল্লাহ, এ অধমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর ৪২টি রাষ্ট্র সফর করার তাওফীক দিয়েছেন। এ দ্বীনের উসিলায় আমেরিকাও

দেখেছি, আফ্রিকাও দেখেছি। পৃথিবীর সর্বশেষ রাষ্ট্র যাকে বলা হয়, সে দেশটিও দেখেছি। ঐ দেশে বৎসরে একটি দিন এমন আসে, যে দিন সূর্য ডুবতে গিয়ে আবার উদিত হয়ে যায়। এ দৃশ্যকে দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ টুরিষ্ট সমবেত হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এ রাষ্ট্রটি পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত।

আলহামদুলিল্লাহ! অধমকে আল্লাহ তা'আলা এখানেও আসার তাওফীক দিয়েছেন। বন্ধুরা সঙ্গে ছিল। আমরা সমুদ্র ভ্রমন করছিলাম। অধম সমুদ্রের পানিতে পা রেখে বলতে লাগল।

হে আল্লাহ! আমাদের যদি জানা থাকত যে, তোমার ভূ-পৃষ্ঠে এর পরেও আরো কোন বসতি রয়েছে, তাহলে তোমার নাম নিয়ে আমি অধম সেখানেও পৌঁছার চেষ্টা করতাম যেমন সাহাবায়ে কিরাম রা. আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

মালেশিয়ার জঙ্গল দেখেছি বড়ই আশ্চর্যজনক এবং ভয়ানক। এখানে মানুষ খেকো গাছ আছে। এ গাছের পাতা অনেক বড় বড়। কোন মানুষ যদি ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়, তাহলে পাতাগুলো মানুষটিকে জড়িয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে দম বন্ধ হয়ে মানুষটি মারা যায়। আমি সেখানে একটি ফুল দেখলাম বেশ বড়। মধুর মত একটি জিনিস এর মধ্যে দেখা যায়। কোন পাখি যখন উড়ে এসে ফুলটির উপর বসে, তখন ফুলটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পাখিটি তার লোকমায় পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলার শান কত আশ্চর্যজনক।

আমি আপনাদেরকে কি বলব, সমুদ্র ভ্রমণও আমি করেছি। আলহামদু লিল্লাহ! শ্বেত, কৃষ্ণ, আরব, অনারব সকল প্রকার মানুষের সাথে আমি মিশেছি, কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলছি, আর তা হল, আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই উলামায়ে দেওবন্দের কোন না কোন আধ্যাত্মিক সন্তানকে সেখানে বসে দ্বীনের কাজে ব্যস্ত-মগ্ন পেয়েছি।

এ হচ্ছে কুরআনের সম্মান। এ কুরআনের উসিলাতেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমনভাবে সম্মানিত করেন। আপনারা কি জানেন পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বয়ানুল কুরআন পড়া হয়?

অতএব আপনিও যদি সম্মানিত হতে চান, তাহলে পড়ুন এবং সে অনুযায়ী আমল করুন। যে শিক্ষার্থী এ কথা মনে করল যে, আমি এখন পড়ে নেই

পরে আমল করব। তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়তো সে মৃত্যুর পর আমল করবে। মনে রাখবেন এটি স্পষ্ট শয়তানের ধোঁকা। এখনই আমল করার সময়। এক দিকে পড়ুন, অপর দিকে আমল করুন, এক দিকে কুরআন শেষ হবে, অপর দিকে আমলের দিক দিয়েও আপনি পূর্ণতা লাভ করবেন। এরপর দেখবেন আল্লাহ তা'আলার রহমতের বারিধারা কিভাবে বর্ষিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ দান করুন।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! এ কুরআনের স্বাদ এমন যে, মানুষ যখন এর স্বাদ সম্পর্কে অবগত হয়, তখন পানাহারের স্বাদের কথাও ভুলে যায়। দু'আ করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। সকলের অন্তরের নেক উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ করুন। আমীন!!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব গুনাহ পরিহার কর।'

গুনাহগার বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল প্রভুর ভালবাসা

মুক্তার দামে নেন লুফে
প্রভু করুণাময়,
অনুশোচনার তপ্ত ফোঁটা
কিঞ্চিৎ যদিও হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهٗ.

وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ.

وقال الله تعالى فى مقام آخر: مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

গুনাহের পরিচয়

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব গুনাহ পরিহার কর।'

কুরআন হাদীস পরিপন্থী কাজকে গুনাহ বলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ লঙ্ঘন করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পরিত্যাগ করার নাম হল গুনাহ। আমাদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ পরিহার করতে বলা হয়েছে।

গুনাহের দৃষ্টান্ত হল ক্যান্সার। শরীরের কোন অঙ্গে যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে তাহলে এর চিকিৎসা হল ঐ অঙ্গটি দ্রুত কেটে ফেলা। যদি আক্রান্ত অঙ্গটি কেটে ফেলা না হয়, তাহলে ক্যান্সার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। রোগী মারা যায়। তদ্রূপ গুনাহের চিকিৎসাও একটি– তা পরিহার করা। যদি পরিহার করা না হয় তাহলে গুনাহের অভ্যাস পাকাপোক্ত হয়ে মজ্জাগত হয়ে যায়। অবশেষে এ গুনাহই মানুষের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গুনাহের সূচনাকালটি কাঁচা সূতার ন্যায় দুর্বল হয়ে থাকে। কাঁচা সূতা যেমন ছোট শিশুও ছিঁড়ে ফেলতে পারে। তদ্রূপ সূচনা অবস্থায় গুনাহ চাইলেই ছেড়ে দেয়া যায়, কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে এ গুনাহ বড় জাহাজের নোঙ্গরের রূপ ধারণ করে। যে নোঙ্গরটি বড় জাহাজকে পর্যন্ত নড়তে দেয় না। তদ্রূপ গুনাহ করতে করতে এক পর্যায়ে গুনাহের অভ্যাস এমন মজবুত হয়ে যায় যে, তখন ছাড়তে চাইলেও আর সম্ভব হয় না।

আপনি আগাছা দেখেছেন। আগাছা যখন বেড়ে যায় তখন গাছের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আগাছা দ্রুত পরিষ্কার করা না হলে মূল গাছটিই ধীরে ধীরে মরে যায়। গুনাহের দৃষ্টান্ত হল আগাছা। অর্থাৎ গুনাহ মানুষকে এমনভাবে জড়িয়ে নেয় যে, এর কারণে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে সম্পূর্ণরূপে শক্তি-হীন হয়ে পড়ে।

হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম র. একটি আশ্চর্যজনক কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, হে বন্ধু! তুমি গুনাহ ছোট না বড় এ দিকে লক্ষ্য কর না। বরং ঐ সত্তার বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য কর, যার নাফরমানী তুমি করছ।

বর্তমানে মানুষ গুনাহ করার সময় ছোট শিশুর প্রতিও লক্ষ্য রাখে অর্থাৎ তাদের সম্মুখে গুনাহ করে না, কিন্তু আফসোস! সে গুনাহ করার সময় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কথা ভুলে যায়।

একজন বুজুর্গের ইলহাম

একজন বুজুর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, তুমি লোকদেরকে বল, যখন তারা গুনাহ করে তখন ঐ সব দরজাগুলো তো বন্ধ করে নেয় যার দ্বারা দুনিয়া তাকে দেখবে, কিন্তু ঐ দরজাটি বন্ধ করে না যার মাধ্যমে আমি পরওয়ারদিগার তাকে দেখি। সে কি প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যে আমাকেই সব চেয়ে দুর্বল মনে করে।

অতএব তোমরা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ পরিত্যাগ কর। এটা তো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের গুনাহের উপর রহমতের পর্দা ফেলে দেন। আমাদের গুনাহকে গোপন করেন।

একমালুশ শিয়াম গ্রন্থে একটি আশ্চর্য কথা লিখা হয়েছে যে, হে বন্ধু! যে তোমার প্রশংসা করল, বস্তুত: সে তোমার প্রতিপালকের 'ছাত্তারি' এর প্রশংসা করল। যদি গুনাহের কোন দুর্গন্ধ থাকত তাহলে এমন অনেক পরহেজগার যাদের খোদাভীতির প্রসিদ্ধি রয়েছে তাদের শরীর থেকে এতো দুর্গন্ধ ছড়াতো যে মানুষ তাদেরকে সহ্য-ই করতে পারত না।

হযরত আতা ইবনে রিবাহ র. অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা র. এর উস্তাদদের মধ্যে তাকে গণনা করা হয়। তিনি বড়ই আশ্চর্যজনক কথা বলেছেন যে, একবার আল্লাহ তা'আলা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে বললেন, আতা! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, তারা যখন জীবন-জীবিকা নিয়ে সামান্য কোন পেরেশানীতে পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ মানুষের মজলিসে বসে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করে। অথচ গুনাহে পরিপূর্ণ তার আমলনামা যখন আমার কাছে আসে আমি ফিরিশতাদের মাহফিলে তার ব্যাপারে কোন অভিযোগ করি না।

গুনাহের কারণ

সাধারণত: গুনাহের চারটি কারণ রয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সমাধান মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম কারণ :

গুনাহ করার সময় মানুষ মনে করে, আমাকে কেউ দেখছে না। যখন তার চেতনায় এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আমাকে কেউ দেখছে না, তখন সে

গুনাহ করার সাহস করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এ সম্পর্কে বলেন-

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।'

مِرْصَادْ (মিরছাদ) বলা হয় যখন শিকারী লক্ষ্য স্থির করতে চায়, তখন চূড়ান্ত আঘাতের পূর্বে কিছু সময় অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শিকারকে এমনভাবে দেখতে থাকে যে, চোখের পলকও ফেলে না। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ করে নেয়। সর্বান্তকরণে সে শিকারের প্রতি নিবিষ্ট হয়। শিকারীর এ অবস্থাকেই مِرْصَادْ বলে।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

তোমার প্রতিপালক ওৎ পেতে বসে আছেন। তিনি তোমার গতিবিধি এমন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন যেমন শিকারী তার শিকারকে পর্যবেক্ষণ করে।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হল যে, আল্লাহ তাকে সর্বক্ষণ দেখছেন, যেন মানুষের মন মগজে এমন ধারণা আর না থাকে যে, আমাকে কেউ দেখছে না।

দ্বিতীয় কারণ :

গুনাহ করার সময় মানুষ মনে করে আমি যে ফোন করছি, চিঠি লিখছি অথবা মাপে কম দিচ্ছি এগুলো কেউ জানে না। যখন অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আমার অপকর্ম সম্পর্কে কেউ অবগত নয়, তখন মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এ বিষয়টিও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ যেন মনে না করে, তার অপকর্মের কথা কেউ জানে না।

ইরশাদ হচ্ছে-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ.

'আল্লাহ তা'আলা এমন যে, তিনি চোখের অন্যায় সম্পর্কেও অবগত এবং ঐ সব বিষয় সম্পর্কেও অবগত যা অন্তরে লুকায়িত রয়েছে।'

সুতরাং মানুষ কি করে মনে করবে যে, তার অপকর্ম সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। বুঝা গেল আমরা যা কিছু করি অথবা করার ইচ্ছা করি আল্লাহ তা'আলা সব-ই জানেন।

তৃতীয় কারণ :

মানুষ মনে করে আমার আশেপাশে কেউ নেই। আমি ঘরে একদম একা। 'যার ছিল ভয় সে পাশে নাহি রয়, কর মনে যা কয়।' অর্থাৎ আমার আশেপাশে কেউ নেই, এ ধারণাটিই গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে,

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানে-ই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গেই থাকেন।'

চতুর্থ কারণ :

মানুষ যখন মনে করে কেউ আমার কিছু করতে পারবে না, আমার তো বাবা নেই। সন্তান যখন বড় হয়, যুবক হয়, তখন মা-কে আর ভয় করে না। নির্ভয়ে অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। কেউ কিছু বললে ধমকের সাথে বলে তুমি আমার কি করতে পারবে? আমার পশমও কেউ বাঁকা করতে পারবে না। এই যে কথা 'আমার কেউ কিছু করতে পারবে না' এই ধারণাটি মানুষকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলা এ ধারণাটিও দূর করে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন- (তোমার সবকিছুই এমন এক সত্তার হাতে ন্যস্ত)

اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

'নি:সন্দেহে তার পাকড়াও বড়ই কঠোর এবং যন্ত্রণাদায়ক।'

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

'সুতরাং আপনার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির ব্যাত্রাঘাত করেছেন।'

وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗ اَحَدٌ

'তার মত আর কেউ বাঁধতে পারে না।'

فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ.

'আমি এমন শাস্তি দিব পৃথিবীতে এমন শাস্তি আর কেউ দিতে পারবে না।'

অতএব 'কেউ আমার কিছু করতে পারবে না' এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কোনই অবকাশ আর নেই।

গুনাহের চার সাক্ষী

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের সাথে চার প্রকার সাক্ষী উপস্থিত করা হবে।

প্রথম সাক্ষী

মানুষের আমলনামা;

وَوُضِعَ الْكِتَابُ

যখন আমলনামা সম্মুখে রাখা হবে।

فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

তখন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, তারা ভয়ে কাঁপছে এবং বলছে-

يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰىهَا

'হায়! আমাদের দুর্ভোগ। এটি কেমন কিতাব ছোট বড় কোন গুনাহই লিপিবদ্ধ না করে ছাড়েনি।'

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

'তারা স্বীয় কৃতকর্মকে সম্মুখে উপস্থিত পাবে, আপনার প্রতিপালক কারো উপর জুলুম করবেন না।'

দ্বিতীয় সাক্ষী

দ্বিতীয় সাক্ষী হবেন ফিরিশতা।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

'এবং তোমাদের উপর নিয়োজিত রয়েছে তোমাদের হিফাযতকারী এবং সকল আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফিরিশতা, যারা তোমাদের সকল আমল সম্পর্কে অবগত।'

তৃতীয় সাক্ষী

মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব, তাদের হাতের সাথে কথা বলব, তাদের পাগুলো সাক্ষী দিবে যা তারা করত।'

অর্থাৎ মুখে সিল লাগিয়ে দেয়া হবে। দুনিয়াতে এই মুখ বাস্তব ঘটনার বিপরীত বিবৃতি দিত, কিয়ামতের দিন মুখের কর্মকান্ড রহিত করে দেয়া হবে।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

কিয়ামতের দিন এমন দিন হবে যে দিন সকল গোপন রহস্য প্রকাশ করে

দেয়া হবে। (আল্লাহু আকবার!) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে উম্মতের ওলী-বুজুর্গরা অনেক কান্না-কাটি করতেন। যখন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, তখন মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হবে। বলবে,

لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا

তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষী দিচ্ছ?

قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ.

'তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না- এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছুই গোপন করতে না।' -হা-মীম সাজদা : ২২

একটু ভেবে দেখুন! গুনাহ করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে লুকানো কি সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ এসব অঙ্গ দ্বারাই তো আমরা গুনাহ করে থাকি। এ অঙ্গগুলোই কিয়ামতের দিন রাজসাক্ষী হবে।

চতুর্থ সাক্ষী

কিয়ামতের দিন চতুর্থ সাক্ষী হবে আল্লাহর জমিন। ক্যামেরা যেমন ছবি সংরক্ষণ করে, বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করে রাখে। তদ্রূপ আল্লাহর জমিনও সব দৃশ্যগুলোর ছবি ধারণ করে নেয়। নেককারদের ছবিও, গুনাহগারদের ছবিও। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জমিনকে আদেশ করবেন। তুমিও বল, তোমার পৃষ্ঠে যা কিছু ঘটেছে।

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا

'সেদিন জমিনও সংবাদ পরিবেশন করবে এবং বলে দিবে আমরা কি কি করেছি।' অতএব গুনাহের চিকিৎসা একটি– আর তা হল মানুষ তওবা করে ভবিষ্যতে পাপমুক্ত নেক জিন্দেগী যাপন করবে।

গুনাহের আগ্রহ এবং শাস্তির ভয়

একবার এক যুবক হযরত ইবনে আদহাম র. এর কাছে এসে বলল।

: হযরত! গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাই, ছাড়তেও পারি না, আবার ভয়ও লাগে

যে, এর জন্য তো আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আপনি এমন কোন পন্থা বলে দিন যার দ্বারা আমি শাস্তির হাত থেকেও বেঁচে যাব আবার আমাকে গুনাহও ছাড়তে হবে না।

আল্লাহ ওয়ালারা বড়ই বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী হয়ে থাকেন। তারা অত্যন্ত মমতার সাথে কথা বলেন, কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে এমন পথ-ই বলে দিচ্ছি। এ কথা শুনে যুবক বড়ই আনন্দিত হল এবং হযরতের কথা শুনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। বলতে লাগল, হযরত বলুন, ঐ পদ্ধতিটি কি? আমি গুনাহও করে যাব আবার আমার কোন শাস্তিও হবে না।

হযরত : ভাই! তোমাকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি।

প্রথম পরামর্শ :

যদি তোমাকে গুনাহ করতেই হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির আড়ালে গুনাহ কর। এ কথা শুনে যুবক ভাবনায় পড়ে গেল।

যুবক : হযরত! এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমি আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির আড়ালে গুনাহ করব? এটা তো কোনভাবেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পরামর্শ :

হযরত বললেন, তোমার জন্য দ্বিতীয় পরামর্শ হল, তুমি আল্লাহর রিযিক খাওয়া বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে বলে দাও আমি তোমারটা খাইও না, তোমার কথা মানিও না।

যুবক : হযরত! এটা তো কল্পনাও করা যায় না, আমি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিব, তাহলে বাঁচব কি করে?

তৃতীয় পরামর্শ :

হযরত বললেন, তাহলে তুমি এক কাজ কর এই যমীন-আসমান সব তো আল্লাহর। এখানে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। তার রাজত্বে থেকে তোমার অবাধ্যতা ঠিক নয়। অতএব এর বাইরে কোথাও গিয়ে তার নাফরমানী কর। কুরআনে কারীমেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لَاتَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ.

'হে জ্বিন ও মানবকুল! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।' -রহমান ৩৩

যুবক : হযরত! এটাও তো সম্ভব নয়।

চতুর্থ পরামর্শ :

হযরত বললেন, আচ্ছা তোমাকে আমি আরেকটি পরামর্শ দিচ্ছি। যখ মালাকুল মওত রূহ কজ করার জন্য আসবে, তখন তাকে বলে দি আপনি অপেক্ষা করুন। এখন আমি প্রস্তুত নই।

যুবক : হযরত! মৃত্যু যখন আসে তখন তো অপেক্ষার কল্পনাও করা যা না। ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

'যখন তাদের মৃত্যু এসে পৌঁছবে, তখন না একদণ্ড পিছনে সরতে পারবে, ন সামনে ফসকাতে পারবে।' -ইউনুস ৪৯

পঞ্চম পরামর্শ :

হযরত বললেন, আরেকটি পরামর্শ হল, যখন তোমাকে কবরে দাফন কর হবে এবং মুনকার-নাকীর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তোমার নিকট আসবে, তখন তাদেরকে বলে দিও (No Admission without Permission) অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

অতএব আপনারা অনুমতি ছাড়া এখানে কেন আসলেন? চলে যান।

যুবক : হযরত! অসম্ভব, আমি তাদেরকে এমন কথা কিভাবে বলব এটা কল্পনাও করা যায় না।

ষষ্ঠ পরামর্শ :

হযরত বললেন, আচ্ছা ভাই! তোমাকে আরেকটি পরামর্শ দিচ্ছি। কিয়ামতের দিন যখন তোমার আমলনামা তোমাকে দেখানো হবে, অত:পর ফিরিশতাদেরকে আদেশ করা হবে যে, একে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর তখন তুমি জিদ করে দাঁড়িয়ে যাবে। বলবে, ছাড়ো আমাকে, আমি যাব না।

যুবক : হযরত! আমার এমন অবস্থান কি আছে যে, আমি ফিরিশতাদের সামনে জিদ করে দাঁড়িয়ে যাব? আমার কোন অবস্থান বা মর্যাদা-ই তো নেই।

এতক্ষণে কড়াই গরম হয়ে উঠেছিল, আঘাতের এটাই ছিল মোক্ষম সময়।

হযরত বললেন : আমার ভাই! যখন তুমি কিছুই না, তোমার কোন মর্যাদা-ই নেই, তখন তুমি এত বড় পরওয়ারদিগারের অবাধ্যতা কি করে কর?

যুবক : হযরত! আজ থেকে আমি তওবা করছি এবং অঙ্গীকার করছি যে,

আমি আমার আল্লাহর কোন নাফরমানী আর করব না।
সারকথা হল, আমাদের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ মুতাবিক জীবন পরিচালনা করা উচিত। এর কোন বিকল্প নেই।

গুনাহের মধ্যে অস্থিরতা রয়েছে

প্রতিটি গুনাহের সাথে অস্থিরতা আর পেরেশানী জড়িয়ে রয়েছে। গুনাহ করবে, আর পেরেশান হবে না, অস্থির হবে না এটা সম্ভব-ই নয়। যে ব্যক্তিই গুনাহ করবে, গুনাহ যত সফলভাবেই করুক তার মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করবেই। রাতে তার ভাল ঘুম হবে না। পেরেশানীর কোন না কোন পথ অবশ্যই খুলে যাবে।
আপনি দেখে থাকবেন বড় বড় অনেক হোটেলে বুফে সিষ্টেম রয়েছে। এ হোটেলগুলোতে বিভিন্ন ট্রের মধ্যে খাবার সাজানো থাকে, আর ট্রেগুলোর নিচে একটি বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়, বাতিটি ট্রের খাবারগুলোকে গরম রাখে। তদ্রূপ বান্দা যখন কোন গুনাহ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা পেরেশানী আর অস্থিরতার বাতি জ্বালিয়ে দেন। যা তার অন্তরকে অশান্ত, অস্থির রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনের অশান্তি দূর হবে না। এ পেরেশানী কখনো স্ত্রীর পক্ষ থেকে, কখনো সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে, কখনে ব্যবসায়িক ব্যাপারে, কখনো সুস্থতা সম্পর্কে হবে।
মোটকথা কোন না কোন পেরেশানীর বাতি প্রজ্জ্বলিত থাকবেই। টেনশনে সময় কাটবে। বুঝা গেল গুনাহ মানুষকে বে-চাইন করে রাখে।

গুনাহের দ্বারা দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হয়

মসীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান সাহেব র. এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হল, তিনি বলতেন, তুমি যত খুশী গুনাহ কর, আল্লাহ তা'আলা তোমার জীবনকে যদি জাহান্নাম না বানান তখন বল। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এমন পেরেশান রাখবেন যেমন জাহান্নামে মানুষ পেরেশান থাকবে। এমন ভাবা উচিত নয় যে, যে সমস্ত লোক স্বাধীন মত চলে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তারা সুখে শান্তিতে জীবন কাটায়। এমন লোকদের হতাশা আর অস্থিরতা যে কি পরিমাণ, তাদের রাতগুলো কেমন কষ্টে অতিবাহিত হয়, তা কল্পনাও করা যায় না। এক

পর্যায়ে তারা মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে।

عدل وانصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں ÷ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

বিচার সালিশ নয় তো শুধু
হাশর দিনের বালা,
সইতে হবে এ ধরাতেও
পাপের অমোঘ জ্বালা।

গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতেও হয়, আখিরাতে তো হবেই।

كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ

'এতো হচ্ছে দুনিয়ার শাস্তি, আর আখিরাতের শাস্তি তো বড় ভয়ানক।'

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন-

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

'সকল প্রকার গুনাহ পরিহার কর, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য।'

গুনাহের পরিণতি

আর এ কথাও শিরোধার্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

তোমাদের অবাধ্যতার ফল তোমাদের উপরই আবর্তিত হবে। গুনাহের পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হয়। এ জন্যই এক তাবেঈ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কোন আদেশ পালনে আমার পক্ষ থেকে যখন-ই অলসতা হয়েছে, আমি এর ফল আমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এমনকি আমার পোষা প্রাণীর মধ্যে তথা কোন না কোনটির মধ্যে অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। অর্থাৎ আমার অধীনস্থরাও আমার অবাধ্য হয়েছে। বরং ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ

'কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপরে নয় কুচক্রীর উপরই পতিত হয়।'

অর্থাৎ মানুষ গুনাহের যে পরিকল্পনা করে, যে চিন্তা করে, তা তার নিজের বা পরিবার-পরিজনের উপরই ফিরে আসে। অতএব কোন যুবক যেন এ কথা মনে না করে যে শুধু আমিই বেগানা মেয়ের দিকে কু-দৃষ্টি দেই। হ্যাঁ সে যেন মনে রাখে। এমন কু-দৃষ্টি তার পরিবার-পরিজনের বেলায়ও হতে পারে।

এক স্বর্ণকারের স্ত্রীর ঘটনা

একজন স্বর্ণকার ছিলেন। তার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী এবং নেককার। স্বর্ণকার একদিন ঘরে এসে দেখলেন স্ত্রী অঝোরে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? কাঁদছ কেন? স্ত্রী বললেন, আমাদের যে কাজের ছেলেকে দশ বছর ধরে আমরা লালন-পালন করছি, আজ সে বাজার থেকে তরি-তরকারি এনে ঘরে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে এবং কু-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। দশ বছর লালন-পালনের এই প্রতিদান আমি পেলাম। এমন বিশ্বাসঘাতকতা সে আমাদের সাথে করল। এ জন্যই আমি কাঁদছি।

এ কথা শুনে স্বামীর চোখ দিয়েও অশ্রু ঝরতে লাগল, তিনিও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন কাঁদছেন। স্বামী বললেন, আসলে আমাদের কাজের ছেলে কোন অন্যায় করেনি। অন্যায় আমার দ্বারা হয়েছে। আজকে আমার দোকানে একজন মহিলা অলংকার কিনতে এসেছিল। সে দু'টি চুড়ি পছন্দ করে এবং চুড়ি দু'টি তার হাতে পড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাকে বলে। তাকে চুড়ি পড়ানোর সময় তার হাত দু'টি আমার কাছে আকর্ষণীয় লেগেছিল। ফলে লালসা নিয়ে আমি তার হাতে চাপ দিয়েছিলাম। এর পরিণামেই আমার পরিবারের সাথে আজ এ আচরণ হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবাধ্যতা তো অবাধ্যতাই, তওবা ব্যতীত এর আর কোন সমাধান নেই।

আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন

যে পাপিষ্ঠ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে এমন শিক্ষাই দেন যে, দুনিয়াতে সে কাউকে মুখ দেখানোর উপযুক্ত আর থাকে না। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

আল্লাহ তা'আলা যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে সম্মানিত করবে এমন কেউ নেই। মাথার পাগড়ী ভুলণ্ঠিত হয়ে যায়, রুমাল ছিনিয়ে নেয়া হয়, মানুষ ঘরে বসেই চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়।

আল্লাহ তা'আলা আদেশ করছেন-

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ পরিত্যাগ কর, তওবা কর।'

তওবা কাকে বলে?

গুনাহ পরিত্যাগ করা এবং দ্বিতীয়বার এমন অন্যায়ই না করার অঙ্গীকারকে তওবা বলে। আল্লাহ তা'আলা তওবার দরজা সব সময়ের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। এ ছাড়া অন্য দরজাগুলো কোন সময় খোলা থাকে, কোন সময় বন্ধ। কিন্তু একমাত্র তওবার দরজা সদা-সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। আমাদের পরওয়ারদিগারের কখনো তন্দ্রাও আসে না, নিদ্রাও আসে না। এমন হয় না যে, কোন তওবাকারী তওবা করল, আর আমাদের প্রতিপালক আরামে ঘুমিয়ে রইলেন। সকল পাপিষ্ঠের তওবা গ্রহণ করার জন্য পরওয়ারদিগারে আলম সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকেন।

তওবা ও ইস্তিগফারের মধ্যে পার্থক্য

ইস্তিগফার বলা হয় গুনাহ করার পর অন্তরে অনুশোচনা হওয়া, আফসোস হওয়া, লজ্জিত হওয়া যে, এমন কাজ আমি কি করে করলাম! এর নাম হল ইস্তিগফার। আর ভবিষ্যতে কখনো এমন গুনাহ না করার অঙ্গীকারকে তওবা বলে।

অতএব তওবার মাধ্যমে আমরা কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাই এবং ভবিষ্যতে নেক জীবন-যাপনের অঙ্গীকার করি। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ভালবাসেন।

যখন কোন মানুষ সত্যিকার অর্থে তওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ভালবাসেন, তার প্রতি এমন সন্তুষ্ট হন যে,

فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ.

'আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।'

আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি কাদের উপর?

একজন বিদ্বান ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু যুবককে কোন বিষয়ে তর্কে লিপ্ত দেখলেন। তারা কোন বিষয়ে বিতর্ক করছিল এবং প্রমাণাদি উপস্থাপন করছিল। বিদ্বান ব্যক্তি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যুবকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, জনাব! আমরা একটি বিষয়ে বিতর্ক

করছি। আপনি দয়া করে বলে দিন আমাদের মধ্যে কে সঠিক? বিতর্কের বিষয় হল- আমাদের মধ্যে কেউ বলছে যে, আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি নিষ্পাপ বান্দাদের প্রতি বেশি থাকে, আর অন্যদের দাবী হল, না; বরং যারা গুনাহ করে অত:পর সত্যিকারার্থে তওবা করে নেয়, এমন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টি বেশি থাকে।

এখন আপনি বলে দিন, কাদের কথা সঠিক? বিদ্বান ব্যক্তি বললেন, ছেলেরা শুন! আমি তো কোন আলিম নই যে, কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোন জবাব তোমাদেরকে দিব। আমি তোমাদেরকে অভিজ্ঞতা-লব্ধ একটি কথা বলছি। আমি কাপড় বুনি। কাপড় বুননের জন্য দু'টি জিনিস থাকে; একটি হল তানা, আরেকটি হল বানা। বুননের সময় যখনই এর কোন সুতা ছিড়ে যায়, আমি গিরা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দেই। অত:পর লক্ষ্য রাখি এই গিরা যেন আবার খুলে না যায়।

তদ্রূপ যে বান্দা পাপাচারে লিপ্ত ছিল তার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন তওবার মাধ্যমে সে আল্লাহ তা'আলার সাথে আবার গিরা লাগিয়েছে, সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এখন আল্লাহ তা'আলার এই বান্দার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকতেই পারে। যেন এ বান্দার সাথে সম্পর্ক পুনরায় ছিন্ন না হয়ে যায়। (আল্লাহু আকবার কাবীরা!)

আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা

আল্লাহ তা'আলা এত দয়াশীল, এত ক্ষমাশীল যে, বান্দা তওবা করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হন।

বন্ধুরা আমার! আমাদের উচিত সত্যিকার অর্থে তওবা করা। আমাদের আল্লাহ এত দয়াশীল যে, শয়তানকে আদেশ করলেন,

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ

'জান্নাত থেকে বের হয়ে যা হে পাপিষ্ঠ।'

শয়তান আল্লাহ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘন করেছিল, হযরত আদম আ.কে সিজদা করেনি, তাই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তাকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এমন পরিস্থিতিতে শয়তান বলল,

رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

'হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন।'

এমন ক্ষুব্ধ অবস্থায় শয়তান আল্লাহ তা'আলার নিকট এত বিরাট বিশাল অবকাশ চাইল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন-

فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

'যাও তোমাকে অবকাশ দেয়া হল।'

উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, এমন অসন্তুষ্ট অবস্থায় অভিশপ্ত শয়তান যখন অবকাশ চাইল এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে অবকাশ দিলেন, তার ডাকে সাড়া দিলেন। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত! তোমরাও যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট অবকাশ চাও, ক্ষমা চাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ডাকে কেন সাড়া দিবেন না?

অত:পর শয়তান যখন অবকাশ পেল, সে অভিশপ্ত ছিল। কসম করে বলতে লাগল, আদমের কারণে আজ আমি বিতাড়িত হয়েছি। আল্লাহ! আমি তার সন্তান-সন্ততিকে বিভ্রান্ত করেই ছাড়ব।

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

'তাদের অধিকাংশই আপনার অকৃতজ্ঞ হবে।'

শয়তান যখন শপথ করে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করবই করব, তখন আল্লাহ তা'আলার রহমতের সাগরেও ঢেউ উঠল। ইরশাদ হল, হে অভিশপ্ত! তুমি শপথ করছ যে, আমার বান্দাকে বিভ্রান্ত করবে, আমার অবাধ্য বানাবে। আমার কথাও শুনে রাখ! আমার বান্দারা যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, অত:পর তওবা করে নেয়, আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা করে দিব।

হাত নামানোর আগেই ক্ষমা

আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা যখন তওবা কবুল করে ক্লান্ত হন না, আমরা কেন তওবা করে ক্লান্ত হব? আল্লাহ তা'আলার ব্যবহার যখন এই যে, তিনি চান, হে আমার বান্দা! শয়তান যখন তোমাকে বিভ্রান্তই করেছে, আস, আমার দিকে আস, আবার আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

'হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাকে বলিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। একমাত্র আমার-ই ইবাদত করবে, আর এটাই সরল পথ।'

আরো ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمُ.

'হে মানুষ! তোমাকে তোমার প্রতিপালকের ব্যাপারে কে বিভ্রান্ত করেছে?'

হায়! কত মমতার সাথে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, হে মানুষ! তোমাকে তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে কে বিভ্রান্ত করেছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান তার বান্দা যেন তওবা করে। এ কারণেই শয়তান যখন বলল, আমি তাদেরকে ডানে, বামে, অগ্রে, পশ্চাতে অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে বিভ্রান্ত করব। তখন ফিরিশতারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। আরে! এ কি বলছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন ইরশাদ করেন, আমার ফিরিশতারা! শুন, আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। এই শয়তান চারদিক থেকে আমার বান্দাকে বিভ্রান্ত করার অঙ্গিকার করেছে, কিন্তু দু'টি দিকের কথা রে মা'লুম ভুলে গেছে। একটি উপরের দিক, আরেকটি নিচের দিক।

শুন! আমার গুনাহগার বান্দা যখন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে এবং ভবিষ্যতে এমন অন্যায় আর না করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমার কাছে আসবে এবং হাত দু'টি উপরে উঠাবে, উপরের দিক যেহেতু শয়তানের প্রভাবমুক্ত, তাই হাত দু'টি নিচে নামানোর আগেই আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

আর যদি আমার বান্দা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। সিজদার সময় চেহারা নিম্নমুখী হয়, আর এই দিকটিও শয়তানের প্রভাবমুক্ত। তাই আমি আমার বান্দাকে মাথা উঠানোর আগেই ক্ষমা করে দিব। এ দু'টি দিক উন্মুক্ত রয়েছে। হাত তুলে দু'আ করলে অথবা সিজদায় পড়ে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা'আলা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেন।

মূল্যবান দু'টি ফোটা

দুনিয়ার নিয়ম হল, এখানে আমদানীকৃত (Imported) বস্তুর মূল্য অধিক হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীরা বলে, এটি দুষ্প্রাপ্য, অধিক মূল্যে আমদানী করতে হয়েছে, তাই এর দাম বেশি।

সুতরাং দুনিয়ার নিয়মে যেমন আমদানীকৃত বস্তুর মূল্য বেশি, তদ্রূপ গুনাহগার বান্দার অশ্রু যখন ফিরিশতারা আরশে আযীমে নিয়ে যান। উপর জগতের জন্য অশ্রুর এ ফোটাও আমদানীকৃত বস্তুর ন্যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা গুনাহগার বান্দার অশ্রুর ফোটাগুলোকে মণি-মাণিক্যের সমতুল্য বিবেচনা করেন।

موتی سمجھکے شان کریمی نے چن لئے ÷ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

মুক্তার দামে নেন লুফে
প্রভু করুণাময়,
অনুশোচনার তপ্ত ফোঁটা
কিঞ্চিৎ যদিও হয়।

এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে- দু'টি ফোটা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। একটি শহীদের দেহ থেকে নি:সৃত রক্তের ফোটা, অপরটি গুনাহগার বান্দার চোখ থেকে নির্গত অশ্রুর ফোটা।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম একটি আশ্চর্য কথা লিখেছেন। তারা বলেন, একটু ভেবে দেখুন! গুনাহগার বান্দার অশ্রুর ফোটাকে কি পরিমাণ মূল্যবান সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের অশ্রু ফোটাকে আল্লাহর পথে উৎসর্গিত প্রাণ শহীদের রক্তের ফোটার সমতুল্য আখ্যায়িত করা হয়েছে। (আল্লাহু আকবার!)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বড়ই আনন্দিত হন, খুশী হন যখন কোন বান্দা গুনাহ থেকে তওবা করে এবং নেক জীবন যাপনের অঙ্গীকার করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বড়ই দয়াশীল প্রভু। ইরশাদ করেন- হে আমার বান্দা! যদি তোমার গুনাহ আকাশের তারকারাজির সমপরিমাণও হয়, যদি তোমার গুনাহ পৃথিবীর ধূলি-কণার সমানও হয়, যদি তোমার গুনাহ পৃথিবীর সমস্ত গাছের পাতা বরাবরও হয়, যদি তোমার গুনাহ সমুদ্রের জলরাশির সমতুল্যও হয়। আমার বান্দা শুন! আমার রহমতের সম্মুখে তোমার গুনাহের পরিমাণ তারপরও তুচ্ছ, তুমি যদি তওবা কর আমি তোমার তওবা কবুল করবো।

আরো একধাপ এগিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন, হে আমার বান্দা! যদি তুমি একবার তওবা করে ভেঙ্গে ফেল, আবার তওবা কর আবার ভেঙ্গে ফেল, আবার তওবা কর আবার ভেঙ্গে ফেল, যতবার তুমি তওবা করবে আমি প্রস্তুত আমি তোমার তওবা কবুল করব।

گر توصد بار توبہ شکستی بازآ

তুমি যদি একশত বারও তওবা করে বরখেলাফ কর, আমার দরজা তারপরও তোমার জন্য খোলা রয়েছে। আবার যদি তওবা করে নাও, আমি কবুল করে নিব।

আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

'আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দা! যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছ, আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'

(সুবহানাল্লাহ!) কত আশ্চর্য কথা! পিতা সন্তানের প্রতি নারাজ হলে স্ত্রীকে বলেন, তাকে বল সে যেন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সন্তানের নামটা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করেন না। এভাবে বলেন- 'সে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়' অর্থাৎ ক্ষোভের সময় পিতা সন্তানের নামও মুখে উচ্চারণ করেন না। অচেনা-অজানা লোকের মত সম্বোধন করেন। ঐ সত্তার প্রতি আমাদের জীবন উৎসর্গ হোক, যিনি শাস্তির যোগ্য পাপিষ্ঠ বান্দাকে পর্যন্ত আমার বান্দা! বলে সম্বোধন করছেন।

অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও বান্দার সম্বন্ধ থেকে তাকে বহিষ্কার করেননি। এভাবেও ইরশাদ করতে পারতেন– তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন গুনাহ ছেড়ে দেয়। রাজকীয় ভাষা এমন হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিপরীতে গভীর মমতার সাথে ইরশাদ করছেন-

يَا عِبَادِيْ

'হে আমার বান্দা!'

اَلَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

'যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছ,'

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

'আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।'

একটি ঘটনা

হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম র. একটি আশ্চর্য ঘটনা লিখেছেন (সুবহানাল্লাহ!) তিনি বলেন, একবার আমি একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম আট/নয় বছরের এক শিশুকে মা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রহার করছেন। তাকে ধাক্কা দিচ্ছেন আর বলছেন,

তুই আমার অবাধ্য হয়ে গেছিস, আমার কোন কথাই তুই শুনিস না, কোন কাজও করিস না, এক পর্যায়ে বের হয়ে যা বলে মা বাচ্চাটিকে এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে, বাচ্চাটি রাস্তায় পড়ে গেল।

হযরত বলেন, এরপর মা ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিলেন। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম কি হয় দেখার অপেক্ষায়। হযরত বলেন, শিশুটি পড়ে কাঁদছিল। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল এবং কি ভাবতে ভাবতে এক দিকে চলল। কত দূর গিয়ে একটি গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করল। অত:পর আবার ঘরের দিকে ফিরে আসল। দরজার সামনে এসে ক্লান্ত দেহে বসে পড়ল। এরপর দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক্ষণ পর তার মা কোন প্রয়োজনে দরজা খুললেন। দরজা খুলে দেখেন যে, তারই সন্তান দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু তার ক্ষোভ তখনও ঠান্ডা হয়নি, তিনি আবার ক্ষেপে উঠলেন।

বললেন, তুই এখান থেকে দূর হয়ে যা। তোর মুখ আমি দেখতে চাই না। এবার শিশুটি দাঁড়িয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আম্মা! আপনি যখন ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলেন, তখন আমি ভেবেছিলাম যে, কোথাও চলে যাব। ভিক্ষা করব। এভাবে ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমার কিছু না কিছু জুটে যাবে, অথবা ভেবেছিলাম আমি মানুষের জুতা পরিষ্কার করে দিব, এর বিনিময়ে তারা আমাকে খেতে দিবে, অথবা কারো বাড়িতে কাজ নিব, আমার আশ্রয়ের ঠিকানাও হবে, আহারের ব্যবস্থাও হবে। আম্মা! এ সব ভেবে আমি গলির মোড় পর্যন্ত চলেও গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে পৌঁছার পর ভাবলাম, আমার অন্তরে এ কথা আসল যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত আমি পেতে পারি, কিন্তু আমার মা যে আমাকে ভালবাসতেন, মায়ের এই ভালবাসা আমি আর কোথাও পাব না। আম্মা! এ কথা ভেবে আমি আবার ফিরে এসেছি। আম্মা! আমি এ দরজাতেই পরে থাকব, আপনি মারুন, কাটুন যাই করুন এখান থেকে আমি যাব না।

বাচ্চা ছেলেটি যখন এ কথা বলল, তখন মায়ের মমতায় জোয়ার উঠল। তিনি সন্তানকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, বলতে লাগলেন, প্রিয় বৎস! তোমার যখন এ অবস্থা যে, তুমি মনে কর, যে ভালবাসা আমি তোমাকে দিব পৃথিবীর আর কেউ দিতে পারবে না, তখন আমার দরজা তোমার জন্য খোলা।

হযরত বলেন, গুনাহগার বান্দা যখন এই অনুভূতি নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরজায় এসে দাঁড়ায় আর বলে-

اِلٰهِیْ عَبْدُكَ الْعَاصِیْ اَتَاكَ ÷ مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَ
وَاِنْ تَغْفِرْ فَاَنْتَ اَهْلٌ لِذَاكَ ÷ وَاِنْ تَطْرُدْ فَمَنْ یَرْحَمْ سِوَاكَ

দরগাহে তব হাযির প্রভু
বান্দাহ গুনাহগার,
দগ্ধ হৃদয়ের তপ্ত লাভায়
আমি মূর্ছিত বারবার।
ক্ষমা কর হে প্রভু! আমায়
ক্ষমা-ই তোমার শান,
বিতাড়িত হলে পাব কোথায়
এমন দয়াবান।

মানুষ যখন গুনাহ থেকে এভাবে তওবা করে, তখন পরওয়ারদিগারে আলম রহমতের দরজা খুলে দেন।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি দয়া করুন। সত্যিকার তওবার তাওফীক আমাদের দান করুন। ভবিষ্যতের জীবনে অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করার তাওফীক দিন। আমাদের ভবিষ্যতকে অতীত থেকে সুন্দর করে দিন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

'তোমরা যেখানেই থাকনা কেন; মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতর অবস্থান কর!' - নিসা ৭৮

পরকাল ভাবনা

জীবন হল প্রদীপের কম্পিত শিখা
বাতাসের মৃদু চাপে হঠাৎ করে
নিভে যায়
অথবা জীবন স্বজন হারার অশ্রুফোটা
এক পলকে মাটিতে পড়ে
হারিয়ে যায়

দুই গজের ঐ মাটির গুহা
ছোট্ট তোমার ঘর,
থাকবে না কেউ সঙ্গে হেথা
আপন কিংবা পর।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

وقال الله تعالى في مقام آخر : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

وقال الله تعالى في مقام آخر : اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

وقال الله تعالى في مقام آخر : قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

وقال الله تعالى في مقام آخر : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ، او كما قال عليه الصلوة والسلام.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

মানুষের জীবন প্রদীপের ন্যায়

মানুষের জীবন হল খোলা স্থানে রাখা প্রদীপের ন্যায়। বাতাসে রাখা প্রদীপের যেমন কোন ভরসা নেই। এক ঝাপটায় নিভে যায়, তদ্রূপ মানুষের জীবনেরও এক পলকের নিশ্চয়তা নেই, কখন যে ফুরিয়ে যায়।

زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا سا دیا ÷ ایک ہی جھونکا جسے آکے بجھا دیتا ہے

یاسر مژگان غم کا تھرکتا ہوا آنسو ÷ پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے

জীবন হল প্রদীপের কম্পিত শিখা
বাতাসের মৃদু চাপে হঠাৎ করে
নিভে যায়
অথবা জীবন স্বজন হারার অশ্রুফোটা
এক পলকে মাটিতে পড়ে
হারিয়ে যায়

চোখের অশ্রু ফোটা যেমন মাটিতে পড়ে এক মুহূর্তে মাটির সাথে মিশে হারিয়ে যায়, তদ্রূপ মানুষও এক মুহূর্তের মধ্যে ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে বিলীন হয়ে যায়।

প্রিয় বন্ধুরা আমার! ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী।

সত্যিকারার্থে আল্লাহর বান্দা তারা-ই, যাদের মধ্যে বন্দেগী রয়েছে। অন্যথায় জীবন দুর্গন্ধময় একটি বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর বন্দেগী ব্যতীত জীবন একটি ধোঁকা। এ দুনিয়াতে একবার যে এসেছে তাকে অবশ্যই যেতে হবে।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ.

'হে আমার হাবীব! আমি আপনার পূর্বে কাউকে চিরঞ্জীব করিনি।'

দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে অল্প কিছু দিনের অবকাশ দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র এ সময়টুকুতে আমাদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সুযোগটুকু দান করেছেন। পরকালের সম্বল সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে মন দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ জন্যই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.

'তুমি পৃথিবীতে মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন কর।'

ভিন দেশে আরাম আয়েশের যত সুযোগ সুবিধাই থাকুক না কেন, মানুষের মন সর্বদা মাতৃভূমিতেই পড়ে থাকে। সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য তার মন সর্বদা কাঁদে। সর্বদা সে অপেক্ষায় থাকে, কখন ছুটি হবে, কখন সে মাতৃভূমিতে আপন জনের কাছে ফিরে যাবে।

দুনিয়া হল অস্থায়ী নিবাস

মু'মিনের স্থায়ী ঠিকানা হল জান্নাত, দুনিয়া হল তার অস্থায়ী ঠিকানা। অল্প কিছু দিনের জন্য আমাদেরকে এখানে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশেষে আমাদেরকে স্থায়ী ঠিকানার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের প্রস্তুতির কাজে ব্যয় করা চাই। মুসাফির যেমন সফর অবস্থায় খুব সামান্যই আরাম করে, তার মনে সর্বদা মঞ্জিলে পৌঁছার তাড়া লেগে থাকে, তদ্রূপ আমাদের সফরও রূহের জগতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ كُنْ (কুন) থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, ওয়াদা নেয়া হয়েছে

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের রব নই?'

সকলেই বলেছি-

بَلٰى

'অবশ্যই আপনি আমাদের রব।'

এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরীক্ষা স্বরূপ আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান

অতএব দুনিয়া হল পরীক্ষার জায়গা, আরাম আয়েশ কিংবা রঙ তামাশার জায়গা নয়। কিন্তু আফসোস! আমরা একে ভোগ বিলাস আর রঙ তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করেছি। আমাদের ধারণা হল এভাবেই খেয়ে দেয়ে আরাম-আয়েশের মধ্যেই জীবন কেটে যাবে, আমাদের কিছুই হবে না, কক্ষনো নয়। ইরশাদ হয়েছে-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

'মানুষ কি মনে করে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, শুধু এতটুকু কথার পর যে, আমরা ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।'

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ

'আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিবেন।'

আসল-নকল ভাল করে দেখে নিবেন।

আরো ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

'ঐ সত্তা যিনি জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ?'

অতএব পার্থিব জীবনে আমাদের ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর করতে হবে, চরিত্রবান হতে হবে, সত্যিকার মানুষরূপে জীবন যাপন করতে হবে। অত:পর যখন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হব, তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের মূল্যায়ন করবেন।

প্রিয় বন্ধুরা আমার! দুনিয়া হচ্ছে আমাদের জন্য পরীক্ষার স্থান। এ জন্যই হাদীস শরীফে এসেছে

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া হল মু'মিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।'

আলোচ্য হাদীসের একটি ব্যাখ্যা তো হল এই যে, দুনিয়াতে মু'মিনের জন্য কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শরীয়তের বিধি-নিষেধ রয়েছে। এর মধ্যেই তাকে জীবন যাপন করতে হয়। পক্ষান্তরে কাফিরের জন্য কোন সীমাবদ্ধতা নেই, বিধি-নিষেধের কোন তওয়াক্কা সে করে না, মন মত জীবন যাপন করে।

হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখিত হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যাও করেছেন। তারা বলেন, এ দুনিয়াতে একজন মু'মিন যত আরাম দায়ক জীবনই লাভ করুক না কেন, জান্নাতের মুকাবিলায় তা কারাগারের সমতুল্য-ই। আর একজন কাফির দুনিয়াতে যত কষ্টই ভোগ করুক, যত বিপদেই থাকুক, জাহান্নামের মুকাবিলায় তার জন্য এ দুনিয়া জান্নাত সমতুল্য।

জান্নাত হল মু'মিনের ঘর

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য জান্নাতে কি প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। শুধু এতটুকু কথা মনের মধ্যে গেঁথে নিন যে, দুনিয়া হল মাটির তৈরি এবং ক্ষণস্থায়ী। আর জান্নাত হল স্বর্ণ রৌপ্যের তৈরি এবং চিরস্থায়ী। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি কোন মাখলূক তথা সৃষ্টিকে ভালবাসবে এক দিন না এক দিন তাকে মাখলূক থেকে পৃথক হতেই হবে। আর যে ব্যক্তি খালেক তথা স্রষ্টাকে ভাল বাসবে এক দিন না এক দিন তার স্রষ্টার সাথে মিলন হবেই হবে।

আমাদের উচিত আখিরাতের প্রস্তুতিতে লেগে থাকা। প্রতিটি দিবসকে মূল্যবান করার চেষ্টায় মেতে থাকা। নেক আমলের মধ্যে সময় কাটানোর সাধনা অব্যাহত রাখা। আর রাতগুলোকে দিনে পরিণত করার পিছনে সচেষ্ট থাকা। একটি মুহূর্তও যেন গুনাহের মধ্যে না কাটে, গুনাহ মুক্ত জীবন গঠন করাই আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

এক আল্লাহ ওয়ালার প্রিয় উক্তি

নকশবন্দিয়া সিলসিলার একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন। নাম ছিল খাজা আবুল হাসান খারকানী র.। তিনি একটি আশ্চর্য কথা বলতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি গুনাহ মুক্ত একটি দিন অতিবাহিত করল, সে যেন ঐ দিনটি কোন নবীর সাহচর্যে কাটাল।

অতএব আমাদের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত, কোন প্রকার গুনাহ যেন আমাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়। সুন্নত মুতাবিক জীবন যাপনের তাওফীক যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেন।

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. স্বীয় চিঠি পত্রে লিখেছেন যে, এ উম্মতে এমন অনেক কামিল বুজুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন, যারা বছরের পর বছর এমনভাবে কাটিয়েছেন যে, গুনাহ লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতাদের কিছু লিখার সুযোগ হয়নি। এমন পবিত্র জীবন যাপনকারী আল্লাহওয়ালাগণ যখন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হবেন, তখন তাদের পাশে আমাদের মত গাফেলরাও উপস্থিত থাকবে। যারা জীবনে কখনো কথা বার্তার সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করেনি। চোখের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করেনি।

আজকে কোন ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে বেঈমান, বজ্জাত, ছোট লোক অনেক

কিছু সহজেই বলে দেই, কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে বল, তুমি এসব অশ্লীল কথা কেন বলেছিলে? সে দিন জবাব দেয়া বড় কঠিন হয়ে যাবে। এ দিবসটি এত কঠিন হবে যে, নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত কম্পিত-শঙ্কিত হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার শানে জালালের মধ্যে থাকবেন। ইরশাদ হবে-

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

'আজ রাজত্ব কার?' অত:পর নিজেই জবাব দিবেন

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

'একমাত্র আল্লাহর, যিনি এক এবং পরাক্রমশালী।'

এমন কঠিন দিনে আমরা কি জবাব দিব? ঐ দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় এখনই।

মৃত্যু নিশ্চিত কাফন-দাফন নিশ্চিত নয়

মৃত্যু সম্পর্কে এ কথা বলা হয়নি যে, তোমাদের একদিন মৃত্যু হবে; বরং ইরশাদ হয়েছে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।'

স্বাদ হয়তো সুমিষ্ট না হয় তিক্ত। নেককারদের জন্য মৃত্যু সুমিষ্ট হবে, আর পাপিষ্ঠদের জন্য হবে অত্যন্ত তিক্ত। সুন্দর মৃত্যুর জন্য বর্ণাঢ্য বিদায়ের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। একজন বুজুর্গ কত সুন্দর কথাই না বলেছেন যে, হে বন্ধু! মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু কাফন-দাফন নিশ্চিত নয়। কারো জানা নেই কি অবস্থায় কার মৃত্যু হবে, মৃত্যুর সময় কাফন-দাফনের জন্য কেউ পাশে থাকবে, কি থাকবে না? আমরা একজন লোকের ঘটনা শুনেছি যাকে শত্রুরা হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত তার লাশ পানিতে থাকল, পচে ফুলে উঠল। অবশেষে যখন পানি থেকে তার লাশ উঠানো হল, তখন একদম চিনা যাচ্ছিল না। পুলিশ নিকটস্থ গ্রাম বাসীদের হাতে লাশটি তুলে দিয়ে বলল, দেখে মনে হচ্ছে মুসলমান। তোমরা এর জানাযা এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। গ্রামবাসীরা লাশটিকে গোসল দিয়ে ঘোষণা করে দিল একটি লাওয়ারিশ লাশ পাওয়া গেছে, এর কাফন-দাফনের জন্য যে যা পারেন দান করুন। মানুষরা দশ টাকা বিশ টাকা করে দান করল। এভাবে চাঁদার টাকায় কেনা কাফন

পরিয়ে যখন লাশটি দাফন করা হচ্ছিল, তখন একজন মানুষের চোখেও পানি ছিল না। কেননা মৃত এ লোকটিকে কেউ তো চিনে না। কিছু দিন পর যখন ঘটনা উদ্ঘাটিত হল, জানা গেল ঐ মৃত লোকটি ছিল এক এলাকার বড় জমিদার। শত শত বিঘা জমির মালিক ছিল, ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা জমা ছিল, বড় বড় শহরগুলোতে তার বিশাল বিশাল অট্টালিকা ছিল এবং যুবক বয়সের চারজন পুত্র সন্তানও ছিল। সে কি কখনো জানত যে, মৃত্যুর সময় তার কপালে ভিক্ষার কাফন জুটবে। এ জন্যই এক বুজুর্গ বলতেন-

موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے

মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু কাফন-দাফন নিশ্চিত নয়।

অতএব চির বিদায়ের মুহূর্তটি যদি সুন্দর করতে হয়, পরকালীন জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে হয়, তাহলে এই মুহূর্ত থেকে প্রস্তুতিতে লেগে যাওয়া উচিত।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! একটি মৌলিক কথা স্মরণে রাখবেন। যার জীবন সুন্দর তার মৃত্যুও হবে সুন্দর। আর যার জীবন নিন্দিত তার মৃত্যুও হবে নিন্দিত। আমরা যদি সুন্দর জীবন যাপন করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিদায়-ও সুন্দর করবেন। এটা কি করে সম্ভব যে, একজন মানুষ পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত জীবন অতিবাহিত করবে; আর হযরত বায়েজীদ বুস্তামী র., জুনায়েদ বোগদাদী র. এর ন্যায় তার মৃত্যু হবে। এটা কখনো সম্ভব নয়।

ایں خیال است و محال است و جنون

'এ কল্পনা অসম্ভব, অবাস্তব ও পাগলামী ছাড়া কিছুই নয়'

আমাদের জীবনের হিসাব নেয়ার সময় এখনই। এখনই সময় গুনাহ পরিহার করার। মৃত্যুর প্রস্তুতিতে বিলম্বের কোন-ই অবকাশ নেই।

একটি উপমা

হযরত ইমাম গাযালী র. এ বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। বলেছেন, এক বাদশাহর একটি বাগান ছিল। বাগানটি ছিল বিরাট বড় এবং বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট। বাদশাহ একজন লোককে ডাকলেন। তার হাতে একটি টুকরি দিয়ে বললেন, আমার বাগানে যাও এবং টুকরি বোঝাই করে নানা প্রকার ফল-মূল নিয়ে আস। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব, কিন্তু শর্ত হল

বাগান থেকে যখন তুমি একবার বেরিয়ে আসবে, তখন দ্বিতীয়বার বাগানে আর প্রবেশ করতে পারবে না। লোকটি মনে করল, ঠিক আছে এটা তো তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সে টুকরি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। এক দরজা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করল। দেখল গাছে গাছে ফল পেকে আছে, নানা জাতের সুন্দর সুন্দর ফল, কিন্তু এগুলো তার পছন্দ হল না। সে বাগানের আরেকটি অংশে প্রবেশ করল, এখানের ফলগুলো কিছুটা পছন্দ হল, কিন্তু ভাবল আচ্ছা থাক! সামনের অংশে গিয়ে দেখি সেখানে হয়ত আরো উন্নত ফল রয়েছে। সেখান থেকেই ফল ছিঁড়ব এবং টুকরি ভরব। সে সম্মুখে অগ্রসর হল, বাগানের পরবর্তী অংশগুলোতে অনেক উন্নত মানের ফল-মূল ছিল। এখানে এসে তার মনে হল এখান থেকে কিছু ফল ছিঁড়ে নিই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবতে লাগল প্রথমে সবচেয়ে উন্নত ফল টুকরিতে তুলব। এই কথা ভেবে সে বাগানের সর্বশেষ অংশে প্রবেশ করল। এখানে এসে দেখে ফলের কোন চিহ্ন-ই নেই।

অতএব আফসোস করতে লাগল, বলতে লাগল, হায়! আমি যদি বাগানে ঢুকেই ফল সংগ্রহ করা আরম্ভ করতাম। তাহলে এখন আমার টুকরি খালি পড়ে থাকত না। এখন আমি বাদশাহকে কি করে মুখ দেখাব।

ইমাম গাযালী র. বলেন, বন্ধুগণ! বাদশাহ হলেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের উদাহরণ। আর বাগানে প্রবেশকারী লোকটি হল তোমার উপমা। আর টুকরি দ্বারা উদ্দেশ্য হল তোমার আমলনামা। আর তোমার জীবন হল বাগান।

বাগানের বিভিন্ন অংশ তোমার জীবনের বিভিন্ন ধাপ। এখন তোমাকে প্রতিদিন নেক কাজের ফল ছিঁড়তে বলা হয়েছে, কিন্তু তুমি প্রতিদিনই ভাব, আমি কাল থেকে ফল ছিঁড়া আরম্ভ করব অর্থাৎ সম্মুখের অংশে গিয়ে ফল ছিঁড়ব। আগামী দিন, আগামী দিন করতে করতে তোমার জীবনে আর আগামী দিন আসে না। এভাবেই তুমি রিক্ত হস্তে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দন্ডায়মান হবে।

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

'সুতরাং তাদের নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও আগে-পিছে হবে না।'

হযরত সুলাইমান আ. এর মর্যাদা

হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহ তা'আলার একজন জলীলুল ক্বদর নবী। এমন মর্যাদাশালী নবী যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নবুওয়াত দ্বারাও সম্মানিত করেছিলেন, আবার মানব-দানব, পশু-পাখি সব কিছুর উপর রাজত্বও দিয়েছিলেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন রাজত্ব তার পূর্বেও কেউ পায়নি, তারপরও কেউ পাবে না। (সুবহানাল্লাহ!) আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন মর্যাদা-ই দান করেছিলেন। তিনি বাইতুল মাকদিস নির্মাণ করছিলেন। নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিল অসংখ্য জ্বিন। নিজের জন্য কাচের একটি মহল বানালেন, সে মহলে বসেই কাজের তদাকরি করতেন। দেখুন একদিকে আল্লাহর নবী, এমন সম্মানিত নবী আবার মসজিদ নির্মাণের মত কাজে নিয়োজিত। মহতি কার্যটি তখনো সমাপ্ত হয়নি। এমন অবস্থায়-ই আল্লাহ তা'আলা তাকে ডেকে নিলেন।

তবে মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার জন্য এই ব্যবস্থা করলেন যে, হযরত সুলাইমান আ. লাঠির উপর ভর দিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মৃত্যুর পরও সেভাবে-ই রইলেন। জ্বিনরা হযরত সুলাইমান আ.কে জীবিত ভেবে কাজ চালিয়ে গেল, যখন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হল, তখন হযরত সুলাইমান আ. এর লাঠিও পোকায় খেয়ে শেষ করেছে। ফলে তার দেহ মুবারক মাটির উপর ঢলে পড়ল। জ্বিনরা তার মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হল।

লক্ষ করুন! একজন নবী মসজিদ নির্মাণের মত মহৎ কাজে ব্যস্ত, এমন অবস্থাতেই মৃত্যুর পয়গাম হাযির। সামান্য সুযোগও দেয়া হল না। নিজের কাছে ডেকে নেয়া হল।

আমরা মৃত্যু থেকে কেন উদাসীন?

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা যদি একটু ভেবে দেখি যে, কি কাজে আমরা ব্যস্ত রয়েছি। যখন মৃত্যু এসে যাবে এক মুহূর্তের জন্যও তো অবকাশ দেয়া হবে না। তৎক্ষণাৎ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। এই যে আমাদের জীবন এটাই আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের একমাত্র সময়। এর বাইরে অন্য কোন সময় বা সুযোগ আমাদেরকে দেয়া হবে না।

অতএব এ সময়টিকে গণীমত মনে করুন। কত শিশুর জানাযা আমরা দেখেছি, কত যুবকের লাশ কাঁধে তুলেছি, কত বয়োবৃদ্ধকে স্বহস্তে দাফন

করেছি। জীবনের যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে। এ জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কারো জানা নেই কার মৃত্যু কখন এসে যায়।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি না নেয়া ঠিক এমন যেমন বর যাত্রী কনের বাড়ি এসে দেখে কনের আত্মীয়-স্বজন কান ফুটো করার জন্য তাকে কোথাও নিয়ে গেছে। বলুন, কত লজ্জার কথা। বর যাত্রী বঁধূকে তুলে নেয়ার জন্য এসেছে, আর তারা কনে বিদায়ের কোন প্রস্তুতি-ই নেয়নি। তদ্রূপ যখন মালাকুল মওত এসে উপস্থিত হবেন, তখন আমরা লজ্জিত হয়ে বলব,

قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ.

'আল্লাহ! আমাদেরকে আরেকবার সুযোগ দিন, আমরা নেক কাজ করে আসব।' কিন্তু তখন বলা হবে- كَلَّا কখনো-ই নয়।

সুতরাং ভাইয়েরা আমার! মৃত্যুর জন্য এখন-ই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কারো অবহেলা করা উচিত নয়।

তারা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য লোক রাখতেন

সাইয়্যিদিনা হযরত ওমর ফারুক রা. অত্যন্ত সম্মানিত একজন সাহাবী। তিনি সর্বদা একজন লোক সঙ্গে রাখতেন। তার দায়িত্ব ছিল কিছুক্ষণ পর পর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। লোকটি বিভিন্ন সময় হযরত ওমর ফারুক রা.কে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

একদিন হযরত ওমর ফারুক রা. তাকে বললেন, এখন আপনি অন্য কোন কাজ করুন। লোকটি বলল, হযরত! মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন কি আর নেই? হযরত ওমর ফারুক রা. নিজের দাঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন। যার কিছু অংশ পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। বললেন, এ সাদা চুলগুলোই মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এই শুভ্র দাড়িগুলো দেখে আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়ে যায়।

মৃত্যুর পয়গাম

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর ফিরিশতা হযরত আযরাঈল আ.কে বললেন, তুমি আসার আগে সংবাদ দিয়ে এস। হযরত আযরাঈল আ. বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমি মানুষকে কয়েকবার সতর্ক করি, সংবাদ দেই, কিন্তু মানুষ বুঝে না, উপলব্ধি করে না। কোন মানুষের বার্ধক্যে উপনীত হওয়া মৃত্যুর একটি পয়গাম। কারো দৃষ্টি শক্তি

দুর্বল হওয়া মৃত্যুর পয়গাম। দাঁত নষ্ট হওয়া, যৌবন হারিয়ে যাওয়া, অসুস্থ হওয়া এগুলো সব-ই মৃত্যুর পয়গাম।

কিন্তু আমরা অন্ধ হয়ে রয়েছি। দুনিয়ার রূপ-রস-সৌন্দর্য্য আমাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। পরকাল থেকে গাফেল হয়ে আমরা জীবন অতিবাহিত করছি। অতএব আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কারণ জানা নেই মৃত্যু কখন আসবে। অনেক যুবককে আমরা যৌবন কালেই মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।

মৃত্যু অবধারিত বাস্তবতা

ক্ষমতার দাপট দিয়ে যদি মৃত্যুকে প্রতিহত করা যেত, তাহলে ফিরআউনের মৃত্যু হত না।

মন্ত্রিত্ব দ্বারা যদি মৃত্যুকে রুখে দেয়া যেত, তাহলে হামান কখনো মরতো না।

ঐশ্বর্য দ্বারা যদি মৃত্যুকে প্রতিহত করা যেত, তাহলে কারূণের মৃত্যু হত না।

দৈহিক শক্তি দ্বারা যদি মৃত্যুকে স্থগিত করা যেত, তাহলে সোহরাব মারা যেত না।

ঔষধ দ্বারা যদি মৃত্যুকে বাধা দেয়া যেত, তাহলে আফলাতূন ও জালিয়ানূস মৃত্যু বরণ করত না।

ভালবাসার দ্বারা যদি মৃত্যুকে প্রতিহত করা যেত, তাহলে মা তার কোলের শিশুকে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিতেন না।

কিন্তু আমরা এ দৃশ্য কতবার দেখেছি যে, কোন যুবক খাটের উপর শুয়ে রয়েছে। সকলে জিজ্ঞাসা করছে তোমার কি হল? কিন্তু সে নীরব। কোন কথাই সে বলে না।

আদরের মেয়ে এগিয়ে আসছে। জিজ্ঞাসা করছে, আব্বাজান! বলুন আপনার কি হয়েছে? আমি আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আপনার কি প্রয়োজন? বলুন, আমি এখনি তা উপস্থিত করে দিচ্ছি। আপনি একটু কথা বলুন। কিন্তু বাবা নীরব থাকে। মেয়ের কান্না থামে না। সে চিৎকার করে বলে, আব্বু! আদর করে আমার মাথায় এখন কে হাত বুলিয়ে দিবে? একটু বলে দিন। আব্বু! একটু বলে দিন। কিন্তু বাবা নীরব-নিস্তব্ধ কোন কথাই তিনি উচ্চারণ করেন না।

বোন এগিয়ে আসেন। চিৎকার করে বলেন, ভাইজান! একটু বলুন আপনার কি হয়েছে, কিন্তু ভাই নীরব। বোন বলে আমি আপনার বোন বলছি, আপনার প্রয়োজন? একটু বলুন, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিব। রাত ভর

জেগে আপনার সেবা করব। আমি আপনার বোন হই, আপনার জন্য আমি আমার সব সুখ-শান্তি কোরবান করে দিব, কিন্তু ভাই নীরব।

এরপর স্ত্রী এগিয়ে আসছেন আর্তনাদ করে বলছেন, আপনার জন্য আমি সব কিছু বিলিয়ে দিব, আমার জীবন সাথী, আমার মাথার মুকুট আপনি দয়া করে একটু বলুন, আপনার কি হয়েছে? স্বামী নীরব কোন কথা-ই সে বলে না। বিবির চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে, চিৎকার করে বার বার বলছে, আপনি কেন নীরব। আপনি সুখে দু:খে আমার সাথে থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন। আমাদের দু'জনের একটিই প্রাণ ছিল, আমরা জীবন সঙ্গী ছিলাম। আমাকে আপনি মনের সকল ব্যাথা খুলে বলতেন। আজ কি হল আপনি কিছুই বলছেন না। একটু কথা বলুন, কিন্তু স্বামী নীরব। কোন জবাব সে দেয় না।

বিবি চিৎকার করে বলে, আপনি তো আমার কণ্ঠ ভাল করেই চিনেন, আমার ইশারার অর্থও আপনি বুঝেন, আজ আপনি আমার প্রতি কেন ক্ষুব্ধ? যদি কোন ভুল করে থাকি, তাহলে আপনার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাচ্ছি, আমাকে মাফ করে দিন, কিন্তু স্বামী কিছুই বলে না, নীরব-নিস্তব্ধ পড়ে থাকে।

স্ত্রীর চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠে। অবশেষে মা এগিয়ে আসেন। চোখের পানি ফেলে বলেন, আমার বৎস! আমার চোখের আলো! কলিজার টুকরা! আমাকে বল, তোমার কি হয়েছে? আমি তোমার মা বলছি, কিন্তু ছেলে নীরব। কোন জবাব সে দেয় না। মা জিজ্ঞেস করতে থাকেন, বলতে থাকেন, বেটা! আমি আমার সব সম্পদ ঢেলে দিব, তোমার ভাইকে আমি ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি, তোমার ভাল চিকিৎসা করাব। কলিজা আমার! কোথাও যদি ব্যাথা থাকে, বল কোন কষ্ট যদি থাকে, আমায় খুলে বল। মা এভাবে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, কিন্তু ছেলে খামোশ-নীরব। কিছুই বলে না।

মা চিৎকার করে বলেন, কলিজা আমার! তুমি তো সর্বদা আমার ডাকে সাড়া দিতে, আমার সব কথা তুমি শুনতে, আজ কি হল মায়ের কথাও শুনছ না। ছেলে কোন জবাব দেয় না।

মা অতীতে হারিয়ে যান। চিৎকার করে বলেন, যখন আমার বিবাহ হয়েছিল, আমি আশাও করিনি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সন্তান দিবেন।

কলিজা আমার! আমি নামায পড়ে সন্তান কামনা করে দু'আ করতাম, তাহাজ্জুদ পড়তাম, আল্লাহ তা'আলার কাছে সন্তান চেতাম। আমি হজ্বে গিয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফের সময় সন্তানের জন্য দু'আ করেছি। মাকামে

ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে দু'আ করেছি। বরকতের রাতগুলোতে দু'আ করেছি। কুরআন তিলাওয়াত করে আমি আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছি।

আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে গিয়েও আমি সন্তানের জন্য দু'আ চেয়েছি। অন্য মহিলারা বলত, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ভাল স্বামী দিয়েছেন, ধন-দৌলত দিয়েছেন, আরাম আয়েশের সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার পরও তুমি কেন অস্থির? আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রূপ-সৌন্দর্যও দিয়েছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি এমন হাজারো নেয়ামত দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমি উদাস থাকতাম। আমি বলতাম, যদি আমার কোন পুত্র সন্তান হত, আমার ঘরে সে খেলা করত, তা দেখে আমার মন জুড়িয়ে যেত। আমি তোমার কল্পনায় হারিয়ে যেতাম।

কলিজা আমার! যে দিন তুমি দুনিয়াতে এলে, আমার আনন্দের কোন সীমা ছিল না। তোমার মুখের দিকে তাকালে হৃদয় জুড়ে ভালবাসা ঢেউ খেলে যেত। জীবনের সব দু:খ বেদনা ভুলে যেতাম।

কলিজা আমার! কত মায়া মমতা দিয়ে আমি তোমাকে বড় করেছি। তোমাকে তৃপ্তিসহ খাওয়ানোর পর আমি খেতাম। প্রথমে তোমাকে ঘুম পাড়াতাম, তার পরে আমি ঘুমাতাম। এত ভালবাসা দিয়ে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি। তোমার জন্মের পূর্বে আমি যখন তোমার বাবার সাথে মার্কেটে যেতাম, আমার জন্য কাপড় চোপড় কিনে আনতাম, কিন্তু তোমার জন্মের পর যখন-ই মার্কেটে গিয়েছি তোমার জন্য ছোট ছোট জিনিস প্রয়োজনীয় জিনিস তালাশ করে করে এনেছি। মার্কেটে ঘুরেছি আমার ছেলের এমন ফিডার লাগবে, এমন কাপড় লাগবে।

কলিজা আমার! আমি আমার নিজের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার জন্যই শুধু মার্কেট করে ঘরে ফিরতাম। আমার বোনরাও যদি তোমাকে আদর না করত, আমি তাদেরকে পর মনে করতাম। যে তোমাকে ভালবাসত, আদর করত, আমি তাকে আপন ভাবতাম। যে তোমাকে কষ্ট দিত, আমি তার প্রতি ক্ষুব্ধ হতাম।

কলিজা আমার! ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে গেলে যদি তুমি আমার সম্মুখে আসতে, তোমার চেহারা দেখে আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যেত। তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকতে, আর আমাকে রান্না ঘরে কাজ করতে হত, তখন আমার কান দু'টো তোমার প্রতি মনোযোগী থাকত। সামান্য আওয়াজ করলেই আমি পাগলের মত ছুটে আসতাম। তুমি যদি ঘুম থেকে উঠে যেতে তোমার মুখে ফিডার দিয়ে দিতাম। আর যদি ঘুমন্ত থাকতে তাহলে ফিরে যেতাম।

কলিজা আমার! এতো ভালবাসা আর মায়া মমতা দিয়ে আমি তোমাকে লালন-পালন করেছি, তুমি বড় শিক্ষিত হয়েছ, ভাল ব্যবসা আরম্ভ করেছ, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ, আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে, প্রতি দিন জায়নামাযে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তোমার জন্য দু'আ করি। কখনো রাতের বেলা দেরীতে আসলে সবাই ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু আমি জেগে থাকি আমার ঘুম আসে না। আমি মনে মনে তোমার জন্য দু'আ করতে থাকি- আল্লাহ! আমার সন্তানকে তুমি ভাল রেখ, তুমি হেফাযত কর, তাকে দ্রুত ঘরে ফিরিয়ে দাও।

কলিজা আমার! তুমি অর্ধরাত পরেও বাড়ি ফিরলে আমি দরজা খুলে দেই এবং তোমাকে গরম খাবার দেই। এত ভালবাসা দিয়ে আমি তোমাকে লালন করেছি।

কলিজা আমার! তুমি তো আমার ঐ আদরের সন্তান আর আমি তোমার মা। আজ কি হল আমার কোন কথার উত্তর তুমি দিচ্ছ না। আমাকে একটু বল। মা-র চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে, মা বলে যাচ্ছেন কিন্তু ছেলে কোন উত্তর দিচ্ছে না।

ছেলের সময় শেষ হয়ে এসেছে, তার প্রাণ বায়ু উড়ে যাচ্ছে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান পাশে দাঁড়িয়ে সকলেই কাঁদছে। কারো পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। মৃত্যুর প্রথম দৃশ্যটি আল্লাহ তা'আলা এভাবে ইরশাদ করেছেন-

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمُ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ.

'অত:পর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠগত হয়, এবং তোমরা তাকিয়ে থাক। তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখ না।'

-ওয়াকি'আহ ৮৩-৮৫

ঘর থেকে যায় ঘরের বাসিন্দা চলে যায়

এভাবেই রূহ বের হয়ে যায়। মা তাকিয়ে থাকেন, তার চোখের সামনে ছেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। চোখ দু'টি তার খোলা থেকে যায়। মা কম্পিত হস্তে ছেলের চোখ দু'টি বন্ধ করে দেন। মা জানেন আজকের পর এ চোখগুলো আর কখনই খুলবে না। অত:পর তার মুখও বন্ধ করে দেয়া হয়, মা বুঝেন এ মুখ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল। আর কখনো স্বরব হবে না। কিছুক্ষণ পর চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। তখন সকলেই বলে দ্রুত মাইয়্যিতকে গোসল দিতে হবে। কিছুক্ষণ পূর্বে এ লোকটি কারো

পিতা ছিল, কারো ভাই ছিল, কারো সন্তান ছিল, কারো স্বামী ছিল। এখন সে মাইয়্যিত। সবাই তাকে 'মাইয়্যিত' বলছে। আসল মানুষ তো বিদায় হয়ে গেছে। এটা তো খাঁচা মাত্র। এ খাঁচায় বসবাসকারী প্রাণ পাখি উড়ে গেছে। শরীর নামক খাঁচাটি শুধু পড়ে রয়েছে। এখন একেও তার আসল ঘরে পৌঁছে দেয়া হবে। তার শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলা হবে, গোসল করিয়ে কাফন পড়ানো হবে। তারপর যে ঘরে জীবন কাটিয়েছে, সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? বলে, তাকে আসল ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। যে ঘরে সে পড়েছিল, এ ঘরের ডিজাইন সে নিজ হাতে করেছিল, পছন্দের জিনিস দ্বারা ঘরটি সাজিয়েছিল। তার হাতে গড়া ঘরটির ঝঁকঝকে দেয়ালে এখনো সামান্য ময়লাও জমেনি। সকলেই বলে, এটাতো তার অস্থায়ী নিবাস ছিল। এখন তাকে স্থায়ী ঠিকানায় নিয়ে যাচ্ছি।

دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے

দুই গজের ঐ মাটির গুহা
ছোট্ট তোমার ঘর,
থাকবে না কেউ সঙ্গে হেথা
আপন কিংবা পর।

সেই ছোট্ট ঘরেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। ঘরে সব আত্মীয়-স্বজনরা সমবেত হয়েছেন। কেউ যদি বলে আপনারা কারা? আপনারা কি তার শত্রু? যে তাকে এভাবে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছেন। সকলেই বলবে, আরে না, আমরা তার শুভাকাঙ্খী, তার স্বজন। তাকে স্থায়ী ঠিকানায় পৌঁছে দিচ্ছি।

অত:পর তাকে কাঁধে তুলে নেয়া হয়। জানাযার পর কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তার গঠন অনুসারে একটি কবর খনন করা হয়। মাসআলা অনুযায়ী মাইয়্যিতের কোন নিকটাত্মীয় তাকে কবরে নামিয়ে থাকেন। আমরা এমন অনেক দেখেছি যে, যুবক ছেলেকে বাবা স্বহস্তে কবর দিচ্ছেন এবং বাবাকে ছেলে কবর দিচ্ছে। যখন পিতা যুবক ছেলেকে কবরে স্বহস্তে রেখে দেন। ভেবে দেখুন! এ সেই পিতা যে ছেলের গায়ে ময়লা পোশাক বরদাশত করতেন না। আজ মাটির উপর ছেলেকে রেখে দিচ্ছেন। নিচে কোন গদি বিছান নেই, কোন কার্পেটও নেই। এভাবেই কাফনসহ খোলা মাটির উপর রেখে দিচ্ছেন। সেখানে কোন এয়ারকন্ডিশন নেই, বাতিও নেই, কিছুই নেই।

তারপর উপর থেকে মাটি চাপা দেয়া হয়। যে পিতা ছেলের গায়ে সামান্য ধূলাও বরদাশত করতেন না। আজ তিনি-ই মাটি ঢেলে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে এই হিম্মত দিয়েছেন। দাফন-কাফনের আদেশও তাদেরকেই করেছেন। যদি মহিলাদেরকে এই দায়িত্ব দেয়া হত, মা-কে যদি আপন সন্তান দাফন করার দায়িত্ব দেয়া হত, তাহলে হয়ত মা-কেও সন্তানের সাথে দাফন করতে হত। আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। এমন পিতার অবস্থা কি হয়, যে স্বহস্তে সন্তানকে মাটিতে রেখে উপর দিয়ে মাটি ঢেলে দেন। মনকে মন মাটি দ্বারা তাকে চাপা দেয়া হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! জীবন থাকতে আল্লাহর হয়ে যান। আল্লাহ আপনাদেরকে তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করবেন। আর যদি জীবন থাকতে নিজেকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত না করেন, তাহলে মনে রাখবেন! মৃত্যুবরণ করে আমাদেরকে তার হাতে ন্যস্ত হতেই হবে। তখন অপরাধী হিসেবে তার সম্মুখে উপস্থিত হব। আল্লাহ বলবেন- তোমরা দুনিয়াতে আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ করনি, দেখ শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার কাছে আসতেই হয়েছে।

অতএব গুনাহ থেকে দূরে থেকে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। মহিলারা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত মেনে জীবন যাপন করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

কম্পন সৃষ্টিকারী কথা

ইমাম গাযালী র. বড় আশ্চর্যজনক একটি কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, হে বন্ধু! তোমার হয়ত জানা নেই যে, মার্কেটে ঐ কাপড়টি প্রস্তুত হয়ে এসে পড়েছে, যে কাপড়টি তোমার কাফন হবে। আমরা তো মৃত্যুকে ভুলে বসেছি, কিন্তু মৃত্যু কখনো আমাদেরকে ভুলে না। জানা নেই কখন মৃত্যু এসে যায়। অতএব আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি দিনকে শেষ দিন মনে করতে হবে।

মৃত্যুর স্মরণ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইস্তিঞ্জা থেকে ফারিগ হয়ে তায়াম্মুম করলেন। অথচ তিনি সমুদ্রের পাড়েই ছিলেন। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! নিকটেই সমুদ্র থাকতে আপনি তায়াম্মুম কেন করলেন? আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, আমি তায়াম্মুম এ জন্য করেছি যে, অজু করার জন্য সমুদ্র পর্যন্ত পৌছতে পারব, কি পারব না। তা আমার জানা নেই। হতে পারে এর আগেই আমার মৃত্যু এসে যাবে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ছিল অবস্থা।

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমরা মৃত্যু সম্পর্কে কে কি ভাব? একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সকাল বেলা যখন ঘুম থেকে উঠি তখন বিশ্বাস হয় না যে, আমি সন্ধা দেখব। আরেক জন বললেন, হে আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! চার রাকা'আত নামাযের নিয়ত করার পর আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমি তা পূর্ণ করতে পারব।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার অবস্থা তো হল নামায পড়ার সময় এক দিকে সালাম ফিরানোর পর অপর দিকে সালাম ফিরাতে পারব কি না, এতটুকু ভরসা আমার থাকে না।

অতএব মৃত্যুর যখন এ অবস্থা তখন এর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ অবশেষে মৃত্যু তো আসবেই আসবে।

মু'মিনের মৃত্যুতে আসমান-জমিন কাঁদে

একটি হাদীসের মর্ম হল– যখন কোন নেককার বান্দার মৃত্যুর সময় হয়, তখন আল্লাহর ফিরিশতারা জান্নাতের সুগন্ধি নিয়ে উপস্থিত হন। তারা ঐ ব্যক্তির উপর একটি রুমাল রাখেন। অত:পর সহজ ভাবে তার রূহ কবজ করেন।

এরপর কাফন-দাফনের প্রস্তুতি নেয়া হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, আকাশের ঐ দরজাগুলো তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে। যে দরজা দিয়ে তার জন্য রিযিক প্রেরণ করা হত। জমিনের ঐ অংশগুলো ক্রন্দন করতে থাকে যেখানে বসে তিনি ইবাদত-বন্দেগী করতেন। (সুবহানাল্লাহ!) নেককার মু'মিনের মৃত্যুতে আসমান-জমিন পর্যন্ত কান্না করে।

পক্ষান্তরে কোন কাফির যখন মারা যায়, তখন আসমান-জমিন কাঁদে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ.

'তার মৃত্যুতে আসমান-জমিনের কান্না আসেনি।'

মুফাসসিরীনে কিরামগণ লিখেছেন, মু'মিনের মৃত্যুতে তার বিরহে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সাহাবীর জানাযায় ফিরিশতাদের ভিড়

হাদীস শরীফে একজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীর নাম হল হযরত সা'দ রা.। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযায় পায়ের পাঞ্জার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। এক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আগে তো কখনো আপনাকে এভাবে হাঁটতে দেখিনি। ইরশাদ করলেন, সা'দ এর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য আকাশ থেকে এত ফিরিশতা আগমন করেছেন যে, জমিনে পুরা পা রাখার মত জায়গা পাচ্ছি না। দাফন সম্পন্ন হওয়ার কিছু দিন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন। সা'দের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশও তিনদিন পর্যন্ত ক্রন্দন করেছে। (সুবহানাল্লাহ!) স্বয়ং আল্লাহর নবী বলছেন, সা'দের মৃত্যুতে আরশে আযীমও তিনদিন কান্না করেছে।

নেককার লোকদের মৃত্যুতে আসমান-জমিন এমনকি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কান্না করে।

ফিরিশতাদের সাদর সম্ভাষণ

অনেক কিতাবে এ বিষয়টি লিখা হয়েছে যে, নেককার মুমিনের জানাযা যখন কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে আদেশ করেন, তোমরা রাস্তার দু'পাশে তার অভ্যর্থনার জন্য শারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

প্রেমিকের শবযাত্রা

সাড়া পড়ে যাক ভূবনে।

মু'মিনের জানাযা রওয়ানা হওয়ার সময় ফিরিশতারা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সম্ভাষণ জানান। অত:পর যখন তাকে কবরে শুইয়ে দেয়া হয়। হাদীস শরীফে এসেছে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলেন, আমার এ বান্দা ক্লান্ত দেহে এখানে এসেছে, তোমরা তাকে বলে দাও,

نُمْ كَنَوْمِ الْعَرُوْسِ

(সুবহানাল্লাহ!) আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হচ্ছে হে আমার বান্দা! তুমি নেককাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছ, এখন ঘুমাও। নববধূর ন্যায় ঘুমাও।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম লিখেছেন যে, এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'তুমি আরামে ঘুমাও, সুখ নিদ্রায় ডুবে যাও ইত্যাদি না বলে বধূর ন্যায় ঘুমাও' বললেন এর তাৎপর্য হল– বধূ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তাকে একমাত্র তার প্রাণ-প্রিয় স্বামী-ই জাগ্রত করে। তদ্রূপ আজ যে এ মু'মিন কবরে ঘুম দিলেন, উঠবেন কিয়ামতের দিন এবং তাকে ঐ সত্তাই জাগ্রত করবেন যিনি তার প্রকৃত বন্ধু, মাহবূব। ঘুম থেকে যখন বধূর চোখ খুলে তখন প্রিয় স্বামীর চেহারার উপর তার দৃষ্টি পড়ে।

কিয়ামতের দিন যখন মু'মিন চোখ দু'টি খুলবে, তখন তার সম্মুখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ব মহিমায় আবির্ভূত থাকবেন। এমনকি হাদীস শরীফে এসেছে- কোন কোন মু'মিন বান্দা যখন কিয়ামতের দিন উঠবেন, তখন আল্লাহকে দেখে মুচকি হাঁসবেন। আল্লাহও তাদেরকে দেখে হাঁসবেন, তখন আওয়াজ আসবে-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.

'হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তঅর নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে। অত:পর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'-ফাজর ২৭-৩০

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও মৃত্যুর জন্য তৈরী হওয়ার তাওফীক দান করুন। পরবর্তী জীবনকে অতীতের তুলনায় উত্তম এবং সুন্দররূপে পরিচালিত করার তাওফীক দান করুন। পাক-পবিত্র জীবন দান করুন। অতীতের সমস্ত গুনাহ থেকে একনিষ্ঠভাবে তওবা করার তাওফীক দান করুন। ভবিষ্যতে নেক জীবন যাপনের জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই এবং দু'আ করি আজকের এ মাহফিল থেকে উঠার পূর্বেই যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিছনের সমস্ত গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন। ভবিষ্যতে গুনাহমুক্ত জীবন যাপনের জন্য আমাদেরকে সাহায্য করেন। নেক হয়ে থাকা আমাদের জন্য সহজ করে দেন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً.

'নারী বা পুরুষ যে-ই ঈমান আনবে, নেক আমল করবে, আমি অবশ্যই তাকে শান্তিময় জীবন দান করব।'

পুরুষের জীবন গঠন ও উন্নতি সাধনে নারীর অবদান

মহিলারা যখন দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তখন আগামী প্রজন্মের তরবিয়াত সুন্দর হবে। বরং আপনি যদি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন প্রত্যেক সফল পুরুষের পিছনে কোন না কোন নারীর অবদান রয়েছে। কখনো স্ত্রীর, কখনো বোনের, কখনো মা-র, আর কখনো কন্যার।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

প্রকৃত বান্দা কে?

মানুষ এ পৃথিবীতে অল্প কিছু দিনের মেহমান। সে এখানে স্ব-ইচ্ছায় আসেওনি। স্ব ইচ্ছায় যাবেও না। তার অধিকার নেই যে সে মধ্যবর্তী এ সময়টুকুতে যেমন খুশী জীবন যাপন করবে। যে স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন, যার আদেশে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে এবং যার নির্দেশে এক দিন তাকে ফিরে যেতে হবে। যদি তার সন্তুষ্টি মত জীবন অতিবাহিত করে, তাহলে সে সফলকাম। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী, আল্লাহর স্মরণ। প্রকৃত বান্দা সেই, যার মধ্যে বন্দেগী রয়েছে। অন্যথায় ব্যর্থ তার জিন্দেগী।

নারী-পুরুষের জন্য আল্লাহর নৈকট্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তার নৈকট্যের দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। ইরশাদ করেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً.

'নারী বা পুরুষ যে-ই ঈমান আনবে, নেক আমল করবে, আমি অবশ্যই তাকে শান্তিময় জীবন দান করব।'

সাধারণত: মহিলাদের মধ্যে এমন মনোভাব লক্ষ করা যায় যে, তারা মনে করে আল্লাহওয়ালা হওয়া, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এগুলো পুরুষদের কাজ। মহিলাদের কাজ হল শুধু নামায পড়া, সাংসারিক কাজ-কর্ম করা। ব্যাস এতটুকুই তাদের জীবন।

অথচ আমরা যদি ইসলামের ইতিহাস পড়ি, তাহলে দেখি যে, এ উম্মতের নারীরাও দ্বীনের কাজে অনেক উন্নতি লাভ করেছেন। ইলমের ময়দানেও তারা লক্ষ্যণীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। মহিলাদের মধ্যে দ্বীন প্রচারে রাত্র-দিন পরিশ্রম করেছেন এবং মা'রিফাত লাভের ক্ষেত্রেও তারা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে থাকেননি।

মনে রাখবেন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা, তার মা'রিফাত অর্জন করা, তার সন্তুষ্টি মুতাবিক জীবন-যাপন করা যেমন পুরুষদের জন্য জরুরী, মহিলাদের জন্যও জরুরী।

ইলম অর্জনের আদেশ উভয়ের জন্য

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ.

'ইলম অর্জন করা মুসলিম নর-নারী সকলের উপর ফরয।'

তাই ইলম অর্জন করা যেমন পুরুষদের জন্য জরুরী, মহিলাদের জন্যও জরুরী। বরং আমি তো বলি যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে দু'টি সন্তান দেন। একটি ছেলে, অপরটি মেয়ে। আর এ দু' জনের মধ্যে শুধু একজনকে পড়া-লিখা করানোর সামর্থ্য তার থাকে। তাহলে সর্ব প্রথম মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। কারণ একজন পুরুষ শিক্ষিত হল তো এক ব্যক্তি শিক্ষিত হল, আর একজন নারী শিক্ষিত হল তো একটি পরিবার শিক্ষিত হল।

মহিলারা যখন দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তখন আগামী প্রজন্মের তরবিয়াত সুন্দর হবে। বরং আপনি যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন প্রত্যেক সফল পুরুষের পিছনে কোন না কোন নারীর অবদান রয়েছে। কখনো স্ত্রীর, কখনো বোনের, কখনো মা-র, আর কখনো কন্যার।

এ উম্মতের যত মহা মনীষী গত হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের জীবনী পড়ে দেখুন। তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে কোন না কোন নারীর অবদান আপনি খুঁজে পাবেন। তার তারবিয়াতের ছোঁয়া আপনি লক্ষ্য করবেন।

সফল পুরুষের পিছনে নারীর ভূমিকা

একজন সফল পুরুষের পিছনে কোন নারীর অবদান অবশ্যই থাকে। কখনো স্ত্রী, কখনো মা, বোন অথবা কন্যা এ নেপথ্য ভূমিকা পালন করেন। এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে।

এক. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর হাবীব, সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব। ফিরিশতাদের ইমাম। আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে,

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

আল্লাহর পরে তুমিই মহান
এটাই শেষ কথা।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যখন ওহী অবতীর্ণ

হল, আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসলেন এবং আপন স্ত্রীকে বললেন,

زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ

'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত জিবরাঈল আ.কে তার আকৃতিতে প্রথমবার দেখলেন এবং ওহী আগমনেরও প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল- তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়ে গেলেন। এক ধরনের ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ

আমি তো আমার জীবনের আশঙ্কা করছিলাম। এমন সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনার বাণী শুনালেন। বললেন, ﻻ কখনো নয়, হে প্রিয়! আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, আপনি অসহায়ের সহায়, অতিথী পরায়ণ, অনাথ-আশ্রয়হীনের আশ্রয়। এ ভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকটি উন্নত চরিত্রের কথা উল্লেখ করে বললেন, যখন আপনার মধ্যে এমন এমন চরিত্র মাধুর্য বিদ্যমান, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখনো-ই আপনাকে ধ্বংস করবেন না।

স্ত্রীর এমন অভয় বাণী শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত হলেন। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে নারীর অবদান স্ত্রীর রূপে আবির্ভূত হল, যিনি কঠিন মুহূর্তে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিতেন। এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহের পর তিনি নিজের সমুদয় সম্পদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কদমে লুটিয়ে দিলেন। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এসব সম্পদ দ্বারা বড়ই উপকৃত হয়েছিলেন।

দুই. হযরত আবু বকর রা. সিদ্দীক রা.কে আল্লাহর রাসূলের গুহার সঙ্গী, সফর সঙ্গী ইত্যাদি বলা হয়। তাঁর হিজরতের ইতিহাস যদি পড়েন, তাহলে একজন নারীর অবদানের কথা জানতে পারবেন। হাদীস শরীফে এসেছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.

এর গৃহে তাশরীফ আনলেন, ইরশাদ করলেন- আবু বকর! আমি একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! এখানে আমি আমার স্ত্রী এবং দুই কন্যা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্বস্ত হলেন। অত:পর ইরশাদ করলেন, আবু বকর! আমাকে হিজরতের আদেশ করা হয়েছে। পাশে দাড়িয়ে থাকা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর বড় কন্যা হযরত আসমা রা. তৎক্ষণাৎ তার ওড়নাটিকে দু'টুকরা করলেন। একটি খন্ড পর্দার জন্য মাথায় জড়িয়ে রাখলেন, আর অপর খন্ডের মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফরের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী বেঁধে দিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. স্ত্রীকে বললেন তুমি খাবার তৈরি করে দিবে, আর স্বীয় কন্যা হযরত আসমা রা.কে বললেন, তুমি যেহেতু ছোট, তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। তুমি গারে ছাওরে আমাদেরকে খাবার পৌছে দিও।

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বিদায় নিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আসমা রা. এর দাদা আবু কুহাফা এসে জিজ্ঞেস করল-

আবু বকর কোথায়?

হযরত আসমা রা. : তিনি তো চলে গেছেন।

একথা শুনে আবু কুহাফা যেন ভয় পেয়ে গেল এবং বলল-

ধন-সম্পদ সব কিছু নিয়ে যায়নি তো?

হযরত আসমা রা. : আমি তখন বয়সে ছোট হলেও একটি কৌশল করলাম। আমার সম্মুখে পড়ে থাকা কিছু পাথর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। অত:পর দাদার হাতটি ঐ পাথরগুলোর উপর রেখে বললাম, দাদা! আব্বাজান অনেক কিছু রেখে গেছেন। দাদা ভাবলেন, হয়তো তার ছেলে আসলেই অনেক সহায়-সম্পদ রেখে গেছে। তিনি আশ্বস্ত হয়ে গেলেন।

হযরত আসমা রা. বলেন, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল আমাদের পিতা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে চলে যাওয়ার সময় সাথে করে পাঁচ হাজার দিরহামও নিয়ে গেলেন। আমাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নাম ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। তিনি বলেন, আমি নিয়মিত খাবার পৌছে দিতাম। দ্বিতীয় দিন যখন খাবার নিয়ে গেলাম, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, আরে! আসমার মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এবং তাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

ব্যাপার কি আসমা তোমার কি হয়েছে? তুমি উদাস কেন? এ কথা শুনে হযরত আসমা রা. এর চোখে পানি এসে যায়।

নবীজী সা. : আসমা! তুমি কাঁদছ কেন?

হযরত আসমা রা. : হে আল্লাহর হাবীব! গতকাল যখন আমি খাবার দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন রাস্তায় আবু জাহলের সাথে আমার দেখা হয়ে যায়, সে আমার চুলগুলো শক্ত করে ধরে সজোরে ঝাকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে- আসমা! তুমি কি জান? তোমার বাবা কোথায়? তোমার নবী কোথায়?

হে আল্লাহর হাবীব! আমি তাকে সত্য বলে দিলাম, হ্যাঁ আমি জানি।

আবু জাহল : কোথায়? বল।

হযরত আসমা রা. : কখনোও বলব না।

আবু জাহল : আমি তোমাকে মারব, কঠিন শাস্তি দিব।

হযরত আসমা রা. : আয়! আল্লাহর হাবীব! তাকে বললাম- তোমার যা করার কর, কিন্তু আমি বলব না। হে আল্লাহর হাবীব! হঠাৎ সে আমাকে সজোড়ে চপেটাঘাত করল। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। একটি পাথর খণ্ডের সাথে আমার মাথা সজোরে আঘাত খেলো, মাথা থেকে রক্ত ঝরে পড়ল। চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। আবু জাহল আবার আমার চুলগুলো ধরে একটানে আমাকে দাঁড় করাল। বলল- আমি তোকে মেরে ফেলব, তাড়াতাড়ি বল। তারা কোথায়?

হে আল্লাহর হাবীব! আমি তাকে জবাব দিলাম, আবু জাহল! শুনো আমার জীবন তোমার হাতে তুলে দিতে পারি, কিন্তু মুহাম্মাদে আরাবীকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না।

ভেবে দেখুন! ছোট্ট শিশু, কিন্তু তারও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি কি পরিমাণ ভালবাসা। বলছে, আমার জীবন তোমাকে দিয়ে দিলাম, কিন্তু মুহাম্মাদে আরাবীকে তোমার হাতে দিব না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর হিজরতের এই সকল সফরের পিছনে আমরা কন্যারূপী এক নারীর অবদান দেখতে পাই।

তিন. সাইয়্যিদিনা হযরত ওমর ফারুক রা.। যাকে মুরাদে মুস্তফা বলা হয়। একবার উন্মুক্ত তরবারী হাতে ছুটলেন। উদ্দেশ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করে দিবেন। পথে একজন সাহাবীর সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-

ওমর! কোথায় যাচ্ছ?

ওমর : আমি তাঁকে (মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) খতম করে দিতে চাই।

সাহাবী : আরে! নিজের বোনের বাড়ি গিয়ে তো দেখো। তোমার বোন ভগ্নিপতি সবাই মুসলমান হয়ে গেছে।

ওমর : বিক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আমার পরিবারের লোক! আমার অনুমতি ছাড়া ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটা কি করে সম্ভব! সোজা বোনের বাড়ি চলে গেলেন এবং দরজায় কড়া নাড়লেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তারা বসে কি যেন পড়ছে। হযরত ওমর রা. এর বোন হযরত ফাতিমা রা. বুঝে ফেললেন, দরজায় ওমর দাঁড়িয়ে আছে। অতএব যে সাহাবী পড়াচ্ছিলেন, তিনি দ্রুত আত্মগোপন করলেন এবং কুরআনের আয়াত লিখা বস্তুটিও লুকিয়ে ফেললেন। দরজা খোলা হল। হযরত ওমর রা. ভিতরে আসলেন, ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম আপনারা মুসলমান হয়ে গেছেন? ভগ্নিপতি বললেন, ইসলাম হল সত্য ধর্ম। এ ধর্ম গ্রহণে বাধা কোথায়? একথা শুনামাত্র হযরত ওমর রা. তার উপর ঝাপিয়ে পড়লেন, শুরু হল বেদম প্রহার। বোন হযরত ফাতিমা রা. স্বামীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলেন। ক্রুদ্ধ হযরত ওমর বোনের চেহারাতেও স্বজোড়ে হাত চালালেন। বোনও মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে অশ্রু সজল চোখে হযরত ওমর রা. এর মুখোমুখি হয়ে বললেন, ওমর! যে মায়ের দুগ্ধ তুমি পান করেছ ঐ মায়ের দুগ্ধ আমিও পান করেছি। শুন! তুমি আমার দেহ থেকে আমার আত্মা বের করতে পার, কিন্তু আমার দিল থেকে ঈমান বের করতে পারবে না।

এ শব্দগুলো হযরত ওমর রা. এর অন্তরে বিদ্যুতের মত আছড়ে পড়ল। অন্তরকে মোমের মত গলিয়ে দিল। হযরত ওমর রা. বললেন, ফাতিমা! বল, তোমরা কি পড়ছিলে? বোন বলতে লাগলেন, ভাইজান! আপনি অপবিত্র, শিরকের নাপাক আপনাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। প্রথমে গোসল করুন, তাহলে আপনি ঐ কালাম শ্রবণ করতে পারবেন। হযরত ওমর রা. গোসল করে আল্লাহর কালাম শুনলেন। আয়াত গুলো ছিল এই-

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ.

'আমি-ই আল্লাহ। আমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, তোমরা আমার-ই ইবাদত কর, এবং আমার স্মরণে নামায পড়।'

হযরত ওমর রা. বললেন, আচ্ছা! তোমরা আমাকেও মুসলমান বানিয়ে

দাও। এ কথা শুনে লুকিয়ে থাকা সাহাবী আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলেন। বললেন- হে ওমর! মোবারক হোক।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক দিন ধরেই দু'আ করছিলেন, হে আল্লাহ! উমর ইবনে খাত্তাব অথবা উমর ইবনে হিশাম দ্বারা আপনি দ্বীনকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহর হাবীবের দু'আ আপনার জন্য কবুল হয়ে গেছে। চলুন! আমি আপনাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে যাই।

অত:পর উভয়ে চললেন দারুল আরকামের দিকে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দরজা লাগিয়ে বসে ছিলেন। মুসলমানদের কে তা'লীম দিচ্ছিলেন। যখন তারা কড়া নাড়লেন, একজন সাহাবী দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে বললেন, আল্লাহর হাবীব! দরজায় ওমর দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে রয়েছে উন্মুক্ত তরবারী। আমরা জানি না কোন উদ্দেশ্যে সে এসেছে।

হযরত হামযা রা. এগিয়ে আসলেন। বললেন, দরজা খুলে দাও। যদি ভাল উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাকে স্বাগতম। আর যদি অন্য কোন ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমার তরবারি আর তার গর্দান।

মানুষ দেখবে আমি তার সাথে কি আচরণ করি। দরজা খুলে দেয়া হল। ওমরের ছিল পরিবর্তিত রূপ। খতম করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিজেই খতম হয়ে গেছেন। তার অন্তর তখন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাসত্বের জন্য উদগ্রীব উন্মুখ হয়ে আছে। আদবের সাথে এসে বসলেন। বললেন, আমি তো আপনার খাদিম হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আকবার বলে ধ্বনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ কাঁপিয়ে দিলেন। এটাই ছিল মুসলমানদের সর্ব প্রথম সজোরে সম্মিলিত তাকবির ধ্বনি। এর পূর্বে হযরত হামযা রা. মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ৩৯তম, আর হযরত ওমর রা. হলেন ৪০তম মুসলমান।

অল্প কিছুক্ষণ পর নামাযের সময় হল। সকলে ঘরের মধ্যেই নামাযের প্রস্তুতি নিলেন। হযরত ওমর রা. বললেন, হে আল্লাহর হাবীব! এখানে কেন নামায পড়ব? উমর মুসলমান হয়ে গেছে। এখন চলুন আমরা আল্লাহর ঘরে গিয়ে নামায আদায় করি। সকলে আল্লাহর ঘরে সমবেত

হলেন। আর হযরত ওমর রা. ঘোষণা করে দিলেন, হে মক্কার কুরাইশরা শুন! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সন্তানকে এতীম করতে চায়, তাহলে সে যেন ওমরের মুকাবিলায় আসে। আমরা এখানে আল্লাহর ইবাদত করব। সুতরাং সাবধান। (সুবহানাল্লাহ!)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ওমর রা. এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করলেন। কিন্তু তিনি যে এই মহাদৌলত লাভ করলেন এর পিছনে ছিল বোন হযরত ফাতিমা রা. এর ভূমিকা।

অতএব আরেকজন সফল ব্যক্তিত্বের পিছনে আমরা বোনরূপী এক মহিয়সী নারীর অবদান দেখতে পেলাম। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

চার. প্রখ্যাত বীরযোদ্ধা হযরত ইকরামা রা.। যার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের সময় তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র করেছি। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত কষ্ট দিয়েছি যে, আজ আমার রেহাই নেই। আমার ব্যাপারে অবশ্যই হত্যার আদেশ জারি হবে। তাই তিনি পালিয়ে দূরে কোথাও চলে গেলেন। এদিকে তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরয করলেন হে আল্লাহর হাবীব! আমার স্বামীকে নিরাপত্তা দিন। যেন সে ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ পায়। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপত্তা দিলেন। ইকরামার স্ত্রী ছুটলেন তার সন্ধানে। বর্ণিত আছে যে, পথে সমুদ্র পড়ল। হযরত ইকরামা রা. নৌকায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলেন। তার স্ত্রীও একটি নৌকায় চড়লেন। নৌকাটি দ্রুত চালিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে হযরত ইকরামা রা.কে বহনকারী নৌকার সামনে নিয়ে গেলেন এবং স্বামীকে বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? মক্কায় ফিরে চলুন। স্বামী বললেন- আমাকে তো মেরে ফেলা হবে। স্ত্রী বললেন- না। আমি আপনার জন্য নিরাপত্তা নিয়ে এসেছি।

অত:পর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরলেন। স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে ইসলামের একজন বিখ্যাত সিপাহ সালার বানিয়ে দিলেন। এ ঘটনায়ও আমরা একজন সফল পুরুষের পিছনে স্ত্রীরূপী এক নারীর অবদান লক্ষ্য করছি।

পাঁচ : হযরত ইমাম মালিক র. যাকে মদীনার ইমাম বলা হয়। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে- যখন তিনি মসজিদে নববীতে বসে হাদীসের দরস

রাক'আত আরম্ভ হয়েছে, তখন ইমাম গাযালী র. এর ভাই বিস্ময়করভাবে নামায ছেড়ে ঘরে চলে গেলেন।

ইমাম গাযালী র. নামায শেষ করে যখন ঘটনা সম্পর্কে জানলেন, অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। বিষন্ন হৃদয়ে ঘরে আসলে, মা জিজ্ঞেস করলেন- বেটা! তোমাকে খুব পেরেশান মনে হচ্ছে? বললেন, আম্মাজান! ভাই জামাতে শরীক হয়েছিলেন, কিন্তু নামায শেষ না করেই ঘরে চলে এসেছেন। এর চেয়ে জামাতে শরীক হতেন না এটাই তো ভাল ছিল। মা তাকে ডেকে আনলেন, জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কেন এমন করলে? বলতে লাগলেন- আম্মাজান! আমি তার পিছনে ইকতিদা করেছিলাম, প্রথম রাকা'আত তো তিনি ঠিক মতই পড়ালেন, কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে তার মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ছিল না। তাই আমি নামায ছেড়ে ঘরে চলে এসেছি।

এবার মা ইমাম গাযালী র.কে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! কি ব্যাপার? ইমাম গাযালী র. বললেন, আম্মাজান! সে ঠিক বলছে। আমি নামাযের পূর্বে ফিকাহ শাস্ত্রের একটি কিতাব পড়ছিলাম। নিফাস সম্পর্কিত কিছু মাসআলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। অত:পর যখন জামাতে দাঁড়ালাম, প্রথম রাক'আতে আমার আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোযোগ যথারীতি ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে নিফাস সম্পর্কিত ঐ মাসআলাগুলো আমার মনে আসতে লাগল। এভাবে কিছুক্ষণের জন্য আমার মনোযোগ ছুটে গিয়েছিল। আম্মাজান! আমার দ্বারা এ ভুলটি হয়ে গেছে।

এ কথা শুনে ইমাম গাযালী র. এর মা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন। বললেন- আফসোস! তোমরা দু'ভায়ের কেউ কাজের হলে না। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারলে না। এ কথা শুনে দুই ভাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইমাম গাযালী র. দ্রুত ক্ষমা চাইলেন। আম্মাজান! আমি ভুল করে ফেলেছি এমন করা আমার উচিত হয়নি। ছোট ভাই বলতে লাগল, আম্মাজান! আমার তো কাশফ হয়েছিল, এ কাশফের কারণেই আমি নামায ছেড়ে দিয়েছি। আমি কাজের হলাম না কি করে?

তখন মা বললেন, তোমাদের একজন তো নামাযে দাঁড়িয়ে নিফাসের মাসআলার কথা ভাবছিল, অপরজন পিছনে দাঁড়িয়ে ইমামের মনের অবস্থা দেখছিল। তোমাদের মধ্যে কেউ-ই তো আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোযোগী ছিলে না।

অতএব তোমরা একজনও আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারনি।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল- যখন মা এমন হন, আধ্যাত্মিক এমন সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে ছেলেদেরকে সতর্ক করেন, তখন সন্তানরা বড় হয়ে ইমাম গাযালী কেন হবেন না? এখানেও সফল পুরুষের পিছনে আমরা এক মহীয়সী মা-র অবদান দেখতে পাই।

সাত : শায়খ আবদুল কাদির জিলানী র. শৈশবে ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য রওয়ানা হলেন। মা কিছু টাকা কাপড়ের মধ্যে সিলাই করে দিয়ে দিলেন এবং বিদায় কালে বললেন, বেটা! সর্বদা সত্য কথা বলবে। অত:পর দুর্ভাগ্যক্রমে আবদুল কাদির জিলানী র. পথে ডাকাতের কবলে পড়লেন, ডাকাতদের কেউ জিজ্ঞেস করল, এই! তোমার কাছে কি আছে বল? তিনি সত্য সত্য বলে দিলেন। ডাকাত সরদার এ ঘটনা শুনে অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি মিথ্যে কথা কেন বললে না? তাহলে তুমি প্রাণেও বাঁচতে, তোমার টাকাও রক্ষা পেত। তিনি বললেন, আমার মা আমাকে বলে দিয়েছেন, সদা সত্য কথা বলবে এবং আমি তার কাছে এ মর্মে অঙ্গীকারও করেছিলাম। অতএব প্রাণের চেয়েও অঙ্গীকার রক্ষা করা আমার কাছে বড় ছিল।

একথা ডাকাত দলকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিল। আরে এতটুকু শিশু মা-র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে এভাবে রক্ষা করছে, আমরাও তো কালিমা পাঠ করে আমাদের রবের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছি। তাহলে আমরা কেন তা রক্ষা করছি না? অত:পর তারা সকলেই তওবা করলেন। তাদের জীবন বদলে গেল। এ শিশুটি পরবর্তীতে হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী র. নামে জগত জোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

এখানেও একজন সফল পুরুষের পিছনে মা-রূপী এক বিদুষী নারীর অবদান দেখতে পাচ্ছি।

আট : হযরত বায়েজীদ বোস্তামী র.। যার সম্পর্কে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী র. এর উক্তি হল- হযরত জিবরাঈল আ.কে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের মধ্যে যেমন বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, তদ্রূপ বায়েজীদ বোস্তামী র.কেও আল্লাহ তা'আলা ওলী আউলিয়াদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এ উক্তিটি স্বয়ং হযরত জুনায়েদ বাগদাদী র. এর।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী র. যখন শৈশবে এতীম হয়ে যান, তখন মা তাকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেন এবং ক্বারী সাহেবকে বলেন ছেলেকে আপনার কাছে রেখে গেলাম। বাড়িতে আসার অভ্যাস যেন তার না হয়।

সে যেন কোন ভাবেই ইলম থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায় আপনি সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। অত:পর কিছু দিন বায়েজীদ বোস্তামী র. ক্বারী সাহেবের কাছেই থাকলেন। একদিন তার মন উদাস হয়ে গেল। মাকে দেখার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। ক্বারী সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন। ক্বারী সাহেব শর্ত দিলেন তুমি এতটুকু সবক ইয়াদ করে দ্রুত শুনিয়ে দাও, আমি তোমাকে ছুটি দিয়ে দিব। সবকের পরিমাণ ক্বারী সাহেব অনেক বাড়িয়ে দিলেন যেন ছুটির আবদার না করতে পারে, কিন্তু শিশুটি ছিল অত্যন্ত মেধাবী। দ্রুত সবক ইয়াদ করে শুনিয়ে দিলেন। ছুটিও পেয়ে গেলেন।

অত:পর ঘরে ফিরে আসলেন। যখন দরজায় কড়া নাড়লেন, তখন মা অজু করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন- আরে! আমার ছেলের মত আওয়াজ মনে হচ্ছে। দরজার নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কে দরজায় আওয়াজ করছ? জবাব আসল আমি বায়েজীদ। মা বললেন, বায়েজীদ নামে আমারও একটি সন্তান ছিল, আমি যাকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি। মাদরাসায় রেখে এসেছি। তুমি কোন বায়েজীদ বলছ? এবং এখানে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়ছ।

এ কথা শুনে বায়েজীদ বোস্তামী র. মায়ের মনোভাব বুঝলেন যে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়ি, এটা তিনি চান না। তিনি চান আমি যেন মাদরাসায় বসে আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়ি। তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করি। তিনি তৎক্ষণাৎ মাদরাসায় ফিরে আসলেন।

এরপর মাদরাসা থেকে একেবারে আলিম বা-আমল হয়ে বের হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশ্ব বিখ্যাত বায়েজীদ বানিয়ে দিলেন।

এঘটনার মাধ্যমে আমরা আরেকজন সফল পুরুষের পিছনে মা-রূপী এক বিদুষী নারীর অবদান জানলাম।

নয় : হযরত খানসা রা.। তাঁর চার ছেলে ছিল। তারা যখন আহার গ্রহণের জন্য বসতেন, তখন তিনি বলতেন ছেলেরা! শুন, তোমরা এমন মায়ের সন্তান, যিনি তার মামাদেরকে লজ্জিত করেননি এবং তোমাদের পিতার সাথেও কোন প্রকার বিশ্বাস ঘাতকতা করেননি। মা যখন বারবার এ কথা বলতেন একদিন ছেলেরা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আম্মা! আপনার একথার উদ্দেশ্য কি? মা বললেন, আমার সন্তানরা! শুন, যখন আমি কুমারী ছিলাম, তখন আমার দ্বারা এমন কোন অন্যায় হয়নি, যার দরুন তোমার মামারা লজ্জিত হবে। অত:পর যখন আমার বিবাহ হল, তখন আমি তোমাদের

পিতার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করিনি। আমি এমন আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্না নারী। পর্দায় সর্বদা জীবন কাটিয়েছি।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করল, আম্মাজান! আপনি কি চান? মা বললেন, তোমরা যখন যুবক হবে, তখন আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। বেটা! তোমরা শাহাদাৎ বরণ করবে, আমি তোমাদের লাশগুলো এসে দেখব। তরবারির আঘাত যদি তোমাদের সীনায় দেখি, আমি খুশি হয়ে যাব।

আর যদি তোমাদের পশ্চাতে কোন আঘাত দেখতে পাই, তাহলে শুন আমি তোমাদেরকে কোন দিন ক্ষমা করব না। ছেলেরা জিজ্ঞেস করল, আম্মাজান! আপনি কেন বলছেন যে, তোমরা শাহাদাৎ বরণ করবে?

মা বললেন, বেটা! এ জন্য বলছি যখন কিয়ামতের দিন ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে, আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, শহীদের মা-রা কোথায়? সেদিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে আমার মুখ উজ্জ্বল হবে। চারজন শহীদের মাতা রূপে আমি সেদিন উপস্থিত হব।

দেখুন! শাহাদাৎ এর মর্যাদা লাভকারী মহান ব্যক্তিত্বদের পিছনে মা- রূপী এক মহীয়সী বীরাঙ্গনা নারীর অবদান প্রত্যক্ষ করলাম।

দশ : হযরত ইবনে সীরীন র.। যিনি স্বপ্নের তা'বীর নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। সকল আলিম-উলামার হাতে এ কিতাবটি রয়েছে। এ কিতাব দেখেই তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক উঁচু স্থান দান করেছেন।

তার একটি বোন ছিল- নাম হাফসা। তিনি অনেক বড় ক্বারী ছিলেন। কুরআনের সব ক্বিরাআতের উপর অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তার জীবনীতে লিখা হয়েছে যে, টানা বত্রিশটি বছর তিনি পারিবারিক মসজিদেই কাটিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র পাক- পবিত্রতা অর্জনের জন্য মসজিদ থেকে বের হতেন। এ ছাড়া সম্পূর্ণ সময় মসজিদে বসে মহিলাদেরকে, ছোট শিশুদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। এত মাহের ক্বারী ছিলেন যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. এর কুরআনের কোন শব্দ উচ্চারণে যদি খটকা হত, তাহলে কোন বাচ্চাকে পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন- যাও, দেখ! হাফসা এ শব্দটি কিভাবে উচ্চারণ করে? তোমরাও সেভাবে-ই উচ্চারণ করবে।

তাবেয়ীনদের মধ্যে কেউ কেউ লিখেছেন যে, আমরা এত বড় ইবাদত গুজার, এত জ্ঞানী, ইলমওয়ালা কোন নারী দেখিনি। এমনকি কেউ কেউ এ কথাও লিখেছেন যে, হযরত হাসান বসরী র. এর উপরও তাকে শ্রেষ্ঠত্ব

দেয়া যায়। কেউ জিজ্ঞাসা করল- তিনি কি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র. এর চেয়েও বড় ছিলেন? তারা বলেছেন হ্যাঁ।

তার দাসীকে একবার জিজ্ঞাসা করা হল আচ্ছা বল তো, তোমার মনিব হাফসা কেমন ছিলেন? দাসী তার অনেক প্রশংসা করল এবং বলল- তিনি সুন্দর করে কুরআন শরীফ পড়তেন, সর্বদা ইবাদতে রত থাকতেন, সব কাজ শরীয়ত মুতাবিক করতেন। কিন্তু জানি না, তিনি এমন কি গুনাহ্ করেছিলেন যার জন্য এশার নামায শেষ করে নফলের নিয়ত বেঁধে ক্রন্দন করা আরম্ভ করতেন, ফজর পর্যন্ত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতেন, আহাজারি করতেন। (বেচারী দাসীর ধারণা যে, তিনি বড় কোন গুনাহের কারণে সারা রাত কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।)

অনুমান করুন, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. এর বোন হযরত হাফসা র. দ্বীনের কি পরিমাণ খেদমত করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য নারীর অবদান আমরা দেখতে পাই।

এগার : খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী র. বঙ্গ এলাকায় সফর করলেন। এ সফরে অনেক মানুষ হযরতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অগণিত মুসলমান তাঁর হাতে হাত রেখে তওবা করেছেন, বাইআত গ্রহণ করেছেন। হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী র. একদিন ঘরে আসলেন, মুখমন্ডলে আনন্দের আভাস দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন, মুঈনুদ্দীন! তোমাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে, কি ব্যাপার? হযরত বললেন আম্মাজান! সাত লক্ষ হিন্দু আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে; আর সত্তর লক্ষ মুসলমান আমার হাতে হাত রেখে তওবা করেছে এবং বাইআত গ্রহণ করেছে। এ কারণে আমার অন্তর আজ আনন্দে ভরে গেছে।

মা বললেন বেটা! এটা তোমার কৃতিত্ব নয়, আমার কৃতিত্ব। হযরত বললেন আচ্ছা মা তা কিভাবে? মা বললেন বেটা! তুমি জন্ম লাভ করার পর আমি অজু ব্যতীত কখনো তোমাকে দুধ পান করাইনি। এর বরকতেই আজ আল্লাহ তা'আলা লক্ষ লক্ষ মানুষকে তোমার হাতে কালিমা পড়ার তাওফীক দান করেছেন।

দেখুন! আরেক মহীয়সী মা। যার অবদানে সন্তান জীবনে এমন সফলতা লাভ করেছিল।

বার : হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী র. কুতুব মিনারের পাশে আজো শুয়ে আছেন। তার নামের শেষে জুড়ে দেয়া 'কাকী' শব্দটি

হিন্দী অর্থ রুটি।

তার সম্পর্কেও একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, তিনি যখন একটু বড় হন, তখন পিতা-মাতা এ পরামর্শের জন্য বসলেন যে, আমাদের সন্তান কিভাবে নেককার হবে? কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে?

মা বললেন- আমার একটি পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী কাল থেকে আমি তদানুযায়ী কাজ আরম্ভ করব। আগামী দিন ছেলে যখন মাদরাসায় চলে গেলেন, মা খাবার প্রস্তুত করে আলমারিতে লুকিয়ে রাখলেন। ছেলে মাদরাসা থেকে আসল, বলল- মা! ক্ষুধা লেগেছে, খাবার দিন।

মা বললেন- দেখ বেটা! আমরাও ক্ষুধার্ত হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আহার দান করেন, রিযিকদাতা তিনি-ই। তিনি-ই আমাদের মালিক এবং স্রষ্টা। বান্দাকে তিনি-ই রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন। মা ছোট্ট শিশুর সম্মুখে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরলেন।

অত:পর বললেন, বেটা! তোমার রিযিকও তিনি-ই দেন। তুমি আল্লাহর কাছে চাও। আল্লাহ তোমাকে খাবার দিবেন।

ছেলে বলল, মা! আল্লাহর কাছে চাওয়ার নিয়ম কি?

মা বললেন, বেটা! জায়নামায বিছাও। জায়নামায বিছানো হল। জায়নামাযের উপর ছেলে নামাযের অবস্থায় বসল, অত:পর ছোট ছোট মা'সূম দু'টি হাত উপরে উঠালো। মা বললেন, দু'আ কর, আল্লাহ! আমি মাদরাসা থেকে এসেছি, আমার ক্ষুধা লেগেছে। আল্লাহ! আমাকে খানা দিন।

ছেলে এভাবেই কিছুক্ষণ বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকল। এরপর বলল, আম্মাজান! এখন কি করব?

মা বললেন, বেটা! হয়ত আল্লাহ তা'আলা তোমার রিযিক পাঠিয়ে দিয়েছেন, তুমি তালাশ করে নাও।

ছেলে ঘরের বিভিন্ন স্থানে তালাশ করে অবশেষে আলমারীর ভিতর খাবার পেয়ে গেল। প্রশান্তিতে আহার গ্রহণ করল।

এ থেকে ছেলের অন্তরে আল্লাহকে জানার অদম্য স্পৃহা জাগল। সে প্রতি দিন আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মাকে জিজ্ঞেস করে। বলে, আম্মাজান! তিনি সবাইকে আহার দেন, পশু-পাখিকেও? জীব-জন্তুকেও? তার কাছে মনে হয় অনেক ভাণ্ডার রয়েছে। যা কখনো শেষ হয় না। ছেলে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বেশির চেয়ে বেশি জানার চেষ্টা চালিয়ে গেল। মা আনন্দিত হলেন

এই ভেবে যে, ছেলের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকছে। শিশুটি যখন এ কথা বুঝল যে, সকলকেই আল্লাহ তা'আলা আহার দেন, এমন অনুগ্রহ-কারীর প্রতি মন স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়।

বাচ্চার অন্তরেও আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেল। এখন অত্যন্ত মহব্বত আর ভালবাসার সাথে সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। ঘুমানোর পূর্বে মাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে নানান কথা জিজ্ঞেস করে। মা অত্যন্ত খুশী হন যে, আমার ছেলের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। কিছু দিন এভাবেই চলল।

একদিনের ঘটনা মা এক আত্মীয়ের দাওয়াতে গেলেন। কোন অনুষ্ঠান ছিল ব্যস্ততায় সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে পারেননি। ছেলের ঘরে ফেরার নির্ধারিত সময়ের কথা ভুলে গেলেন। যখন মনে হল, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। মা দ্রুত বোরকা পড়লেন। ঘরের দিকে উর্ধ্ব শ্বাসে ছুটলেন। চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে, দু'আ করছেন- হে আল্লাহ! হে আমার মালিক! আমি তো বাচ্চার ঈমান বানানোর জন্য এসব হেকমত অবলম্বন করেছি। আয় আল্লাহ! আজ যদি আমার সন্তানের বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়, তাহলে আমার সব শ্রম বৃথা যাবে।

আয় পরওয়ারদিগারে আলম! তুমি আমার শ্রম, আমার সাধনা রক্ষা কর। তুমি রহস্য উন্মোচন করে দিও না। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে আর ফরিয়াদ করতে করতে মা ঘরে পৌছলেন। এসে দেখেন, বাচ্চা আরামে ঘুমাচ্ছে। দ্রুত খাবার তৈরী করলেন এবং গোপনে আলমারীতে রেখে দিলেন। অত:পর বাচ্চার শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে চুম্বন করলেন। তাকে জাগ্রত করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন বাবা! আজ তোমার হয়তো অনেক ক্ষুধা লেগেছে।

বাচ্চা হেসে বলল, মা! আমার তো ক্ষুধা নেই।

মা জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তা কি ভাবে?

বাচ্চা বলল, মা! আমি মাদরাসা থেকে এসে জায়নামায বিছিয়েছি, অত:পর যথারীতি দু'আ করেছি, আয় আল্লাহ! আমার ক্ষুধা লেগেছে, আমি ক্লান্ত, আজ ঘরে আম্মাও নেই। আল্লাহ! তুমি আমাকে খাবার দাও।

আম্মাজান! এ দু'আ করে আমি ঘরে খাবার তালাশ করেছি। তালাশ করে এক জায়গায় রুটি পেয়েগেছি।

আম্মা! আমি আনন্দে তা খেয়েছি। কিন্তু আজকের রুটিতে এত স্বাদ ছিল, এমন সুস্বাদু রুটি মা কোন দিন খাইনি। (সুবহানাল্লাহ!)

আগের যুগের মা-রা সন্তানকে এভাবেই শিক্ষা দিতেন। এভাবেই জন্ম নিত বখতিয়ার কাকীর মত ব্যক্তিত্ব। তিনি মোগল বাদশাহদের শায়খ ছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিল। এমন সফল ব্যক্তিত্ব গঠনের পিছনে মায়ের স্মরণীয় ভূমিকার কথা ভুলবার মত নয়।

পুরুষদের আগে মহিলা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহতারামা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন মাখদূমাতুল মুসলিমীন, মাহবূবায়ে মাহবূবে খোদা সাইয়্যিদাহ হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. এ উম্মতের আলিমা নারীদের মধ্যে এক বিশেষ সম্মানের অধিকারী। এ উম্মতের সর্ব প্রথম হাফিযে কুরআন।

আশ্চর্য ঘটনা হল কিছু কিছু বিষয়ে নারীরা পুরুষদেরকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন। যেমন এ উম্মতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী রূপে দেখার সর্বপ্রথম সৌভাগ্য এক নারী-ই লাভ করেছিলেন। হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. এ বিষয়ে উম্মতের সকল নারী- পুরুষকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। নবী রূপে রাসূলকে দর্শনকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা.।

কুরআন হিফয করার ব্যাপারে এ উম্মতের মধ্যে হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বড় ফকীহ ছিলেন, আলিমা ছিলেন। হযরত ইবনে কাইয়্যিম র. লিখেন– সকল সাহাবীই বড় আলিম ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে ১৩৯ জন ইলমের সমুদ্র ছিলেন। যাদেরকে উম্মতের সবচেয়ে বড় আলিম গণ্য করা হয়। তাদের মতামতকে সর্বযুগের ওলামায়ে কিরাম নিজেদের মতামতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

এই ১৩৯ জনের মধ্যে ১৪জন ছিলেন শীর্ষ স্থানীয়। এ ১৪ জনের মধ্যে একটি নাম হল- হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা.। বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম রা. পর্যন্ত পর্দার আড়ালে বসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহতারামা এ স্ত্রীর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন এবং তিনি সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন মেধা দিয়েছিলেন, ইলমের ময়দানে এমন মর্যাদা দিয়েছিলেন যে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আয়শা! খেজুর এবং মাখন এক সাথে করে খাওয়ার চেয়েও তুমি আমার কাছে প্রিয়।

এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. বললেন- হে আল্লাহর

হাবীব! আপনি তো আমার নিকট মধু আর মাখন একত্রিত করে খাওয়ার চেয়েও বেশী প্রিয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন, বললেন- আয়শা! তোমার উক্তি আমার উক্তির চেয়েও সুন্দর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা এবং মেধা দান করেছিলেন।

কন্যা-জননীর কথোপকথন

হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. একবার হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রা. এর সঙ্গে বসেছিলেন। তাদের মধ্যে মা সন্তানের সম্পর্ক হলেও বয়সের দিক দিয়ে তেমন পার্থক্য ছিল না। এ কারণে অনেক সময় বসে গল্প করতেন। হৃদয়ের উষ্ণতা-শীতলতা শেয়ার করতেন। এমনকি কোন সময় হাসি-মজাকও করতেন।

একবার হযরত ফাতিমা রা. হযরত আয়শা রা.কে দেখে হাসলেন।

আয়শা রা. : কি ব্যাপার? হাসির কারণ কি?

ফাতিমা রা. : আমার অন্তরে হঠাৎ এ কথার উদয় হল যে, আপনার পিতা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা., আর আমি মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা।

একথা শুনে হযরত আয়শা রা. নেচে উঠলেন এবং নবী কারীম সাল্লা- ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসায় মেতে উঠলেন, বললেন-

ফাতিমা! আপনি সত্য বলেছেন, আমরা নবীজী সাল্লা- ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসিলায় ঈমানের দৌলত লাভ করেছি, কুরআন পেয়েছি, আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত লাভ করেছি। এভাবে প্রশংসা করতে থাকলেন।

অত:পর এক পর্যায়ে বললেন, ফাতিমা! আমার মনেও একটি কথা আসছে।

ফাতিমা রা. : কি কথা?

আয়শা রা. : ফাতিমা! আপনার স্বামী হলেন হযরত আলী মুর্তজা রা., পক্ষান্তরে আমার স্বামী স্বয়ং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একথা শুনে হযরত ফাতিমা রা. নীরব হয়ে গেলেন।

আয়শা সিদ্দীকা রা. অত:পর বললেন, ফাতিমা! আমার মনে আরেকটি কথা এসেছে।

ফাতিমা রা. : কি কথা?

আয়শা রা. : কিয়ামতের দিন যখন আপনি কবর থেকে উঠবেন, তখন হযরত আলী রা. এর হাতে আপনার হাত হবে, আর আমি যখন উঠব, তখন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে আমার হাত হবে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. বললেন, আমার মাথায় আরেকটি কথা এসেছে।

ফাতিমা রা. : কি কথা?

আয়শা রা. : ফাতিমা! আপনি জান্নাতী রমণীদের সরদার। আপনি যখন জান্নাতে সিংহাসনে আসন গ্রহণ করবেন, তখন আপনার পাশে হবে হযরত আলী মুর্তাজা রা., আর আমি স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে উপবেশন করব।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা.কে এমন বুদ্ধিমত্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন- আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কিছু বৈশিষ্ট দিয়েছেন যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্য কোন স্ত্রীকে দেননি।

১. আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। এ ছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য সব স্ত্রী বিধবা ছিলেন।

হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে আসেন, তখন তিনি সাবালিকাও হননি। বয়স খুব কম ছিল।

মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন যে, সাবালিকা হওয়ার পর তাঁর প্রথম দৃষ্টি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী চেহারার উপর পড়েছিল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে তিনি এমন অবস্থায় এসেছিলেন যে, তিনি বলেন- বদর যুদ্ধের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু তালাশ করছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম- আল্লাহর হাবীব! কি তালাশ করছেন?

ইরশাদ করলেন- আমি কোন কাপড়ের টুকরা তালাশ করছি, যার দ্বারা ইসলামের একটি পতাকা বানিয়ে উত্তোলন করতে পারি।

হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমার একটি ওড়না ছিল, যার যমীন

ছিল সাদা কালো ডোরা কাটা। আমি ওড়নাটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে তুলে দিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে ওড়নাটি দ্বারা পতাকা বানিয়ে তা উত্তোলন করলেন।

২. মুনাফিকরা যখন আমার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত হল, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে আমার পবিত্রতার সাক্ষী দিয়েছেন। অথচ ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ আ. এর উপরও একই রকম অপবাদ আরোপিত হয়েছিল। বিবি মারইয়াম আ.ও একই অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সব নিষ্পাপ বান্দাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগকে নিষ্পাপ যবান দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ছোট্ট শিশুরা সাক্ষী দিয়েছে তাদের পূত-পবিত্রতার, কিন্তু আমার উপর যখন অপবাদ আসে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছোট্ট শিশুর পরিবর্তে স্বয়ং তাঁর কালামে পাকে আমার পবিত্রতার সাক্ষী দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ এটা তো জঘন্যতম অপবাদ, ডাহা মিথ্যা।

৩. জীবন সায়াহ্নে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যাশায়ী, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মস্তক মুবারক এবং চেহারা মুবারক আমার কোলে ছিল। আমার চোখ দু'টি নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারকে নিবদ্ধ এমন অবস্থাতেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে চলে যান। আমার কোলে মাথা রেখেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চির দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। এ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা কেবল আমাকে দান করেছেন। (সুবহানাল্লাহ!) কত বড় ভাগ্য!

পৃথিবীতে দু'টি কোল-ই ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোকে সম্মানিত করেছেন- একটি হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. এর কোল। এখানে মাথা রেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে ছিলেন, তাঁর উপাধী ছিল 'সিদ্দীক'।

অপরটি হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. এর কোল, আল্লাহর হাবীব ইন্তেকালের পূর্বে এখানেই মস্তক মুবারক রেখেছিলেন। আর তিনি ছিলেন 'সিদ্দীকাহ'।

বড়ই অবাক হই এবং মনে মনেই বলি, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এ বিরল সম্মানে ভূষিত করেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী চেহারা আপনার চোখের সম্মুখে ছিল।

আমার মাহবূবের চেহারা মুবারক তো কুরআনের মত ছিল, আর আপনি ছিলেন তার পাঠক। বসে বসে ঐ কুরআন আপনি পাঠ করছিলেন। আর এ অবস্থাতেই প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন।

চার. আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরেকটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যে, আমার হুজরাতেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন আরাম করছেন। কিয়ামতের দিন এ হুজরা থেকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠবেন এবং উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন।

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা.কে অনেক মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইলমের দিক দিয়ে তিনি অনেক উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।

অনেক সুন্দর প্রশ্ন

দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও নারীরা কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে একজন নারী সাহাবী উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- হে আল্লাহর হাবীব! আমলের দিক দিয়ে তো পুরুষরা আমাদেরকে পিছনে ফেলে দিয়েছে, তারা আপনার সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়, জানাযার নামায পড়ে, মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করে, আর আমরা সর্বদা ঘরেই বন্দি থাকি। সন্তান লালন-পালন করি, সাংসারিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকি। পুরুষরা যে সকল নেক কাজ করে, তা আমরা করতে পারি না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন প্রশ্নকারী অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছে। অত:পর ইরশাদ করলেন যে মহিলা সন্তানের জন্য রাত্রি জাগরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ পুরুষের সমপরিমাণ সওয়াব দান করেন যে, রাতভর জেগে থেকে সীমান্ত পাহারা দেয়। যে মহিলা ঘরে নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ পুরুষের সমপরিমাণ সওয়াব দান করেন, যে মসজিদে উপস্থিত হয়ে তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায় করে। (সুবহানাল্লাহ!)

নারীরাও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন সুন্দর সুন্দর প্রশ্নাবলী করতেন। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, প্রশ্নটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে।

ইলম অর্জনে নারীদের আগ্রহ

একজন নারী সাহাবীয়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আসলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী! পুরুষরা আপনার মজলিসে বসে ইলমে দ্বীন হাসিল করে, আমরা নারীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আপনি আমাদের জন্যও একটি সময় নির্ধারিত করে দিন, আমরা আপনার খেদমতে উপস্থিত হব, ইলমে দ্বীন হাসিল করব।

কিতাবে রয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জন্য বুধবারের দিনটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এ দিনে মহিলারা সমবেত হতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা'লীম দিতেন। এর ফলে ইলমের ময়দানে মহিলারাও অনেক অগ্রসর হয়ে গেলেন। পুরুষদের পিছনে থাকলেন না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুরুষের সমপরিমাণ ইলম দান করলেন।

সাহাবাদের যুগে মহিলাদের ইলমের মান

সাহাবাদের যুগে মহিলাদের ইলমের ময়দানে অবস্থান কি ছিল? এটা প্রমাণের জন্য আমি মাত্র দু'টি ঘটনা উপস্থাপন করছি। হযরত উমর রা. এর শাসনকাল। একবার তিনি ভাবলেন, বর্তমানে বিয়ে-শাদীতে মোহরের পরিমাণ অধিক ধার্য করা হচ্ছে, ফলে অস্বচ্ছল লোকেরা ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। এমনকি অনেকে বিয়ের হিম্মত পর্যন্ত করতে পারছেন না।

হযরত উমর রা. মোহরের একটি পরিমাণ নির্ধারিত করতে চাইলেন। যেন মানুষ এ সংক্রান্ত পেরেশানী থেকে মুক্তি পায়। সুতরাং একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন- আমি চাই সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোহরের একটি পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয়া হোক। যেন গরীব লোকদের কষ্ট দূর হয়ে যায়। পেরেশানী থেকে তারা মুক্তি লাভ করে।

বক্তব্য সমাপ্ত করে হযরত উমর রা. মিম্বার থেকে নেমে আসলেন। মহিলা সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন সাহাবীয়া পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়ালেন, বললেন- আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যে সিদ্ধান্ত দিলেন তা কি কুরআন-হাদীস থেকে দিয়েছেন? না রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা -কে সামনে রেখে খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন?

হযরত উমর রা. বললেন- আমি রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি সামনে রেখে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মহিলা সাহাবীয়া বললেন- কুরআনে কারীমে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আপনি কি করে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন?

হযরত উমর রা. বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- মোহর সম্পর্কিত বিধানটি কি করে স্পষ্ট হল?

মহিলা সাহাবী বললেন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন- তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا 'স্তূপ স্তূপ সম্পদ দিয়ে থাক' এ আয়াতে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মোহরের ক্ষেত্রে স্বর্ণ রূপার স্তূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন হযরত উমর রা. এর এ অধিকার কি ভাবে হল যে, তিনি মোহরের পরিমাণ নির্ধারিত করে দিবেন?

একথা শুনে হযরত উমর রা. উল্টো পথে ফিরে আসলেন। মিম্বারে দাঁড়ালেন, ঘোষণা করলেন- উমর ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। এক বোন অনুগ্রহ করে ভাইকে শোধরে দিয়েছেন। ভুল চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

অতএব সাহাবায়ে কিরাম রা. এর যুগে মহিলাদের ইলমী মান এত উঁচু ছিল যে, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণ ভিত্তিক ইলমী তথা জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করতেন।

এক বৃদ্ধার হুমকি

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে এক বৃদ্ধার ছেলের উপর অনেক জুলুম করেছিল। বৃদ্ধা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দরবারে এসে তাকে শাসাঁল যে, হাজ্জাজ! তুমি জুলুমের পথ পরিহার কর, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এভাবে উড়িয়ে দিবেন, নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, যেভাবে কুরআনে কারীমের প্রথম ১৫ পারা থেকে ১৬ শব্দটি উড়িয়ে দিয়েছেন।

হাজ্জাজ তো নিজেও হাফিজে কুরআন ছিল, দক্ষ ক্বারী ছিল। তার স্বভাবে ছিল চরম কঠোরতা। তৎক্ষণাৎ সে কুরআনের উপর নযর বুলালো তো দেখল- সত্যি প্রথম ১৫ পারার কোথাও ১৬ শব্দটি নেই। সে বলল- আমি যদি কোথাও ১৬ শব্দটি পেয়ে যেতাম, তাহলে তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হত।

দেখুন! সে যুগে নিত্য দিনের স্বাভাবিক আলাপ-চারিতায় মহিলারা যেমন জ্ঞান-গর্ভ কথা বলতেন। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সে যুগের মহিলাদের ইলমী মান ছিল আকাশ ছোঁয়া।

কুরআনে আয়াত দ্বারা যে মহিলা কথা বলতেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. একজন মহিলার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যিনি সব কথার উত্তর কুরআনে পাকের আয়াত দ্বারা দিতেন। ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ এখানে শুধু তার চুম্বক অংশটুকু তুলে ধরা হল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. বলেন- আমি এক জায়গায় শুয়েছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, একজন আরোহী আমার কাছে আসল। জিজ্ঞেস করলাম।

তুমি কে?

উত্তর : سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ বৃদ্ধা নারীর কণ্ঠ ছিল।

প্রশ্ন : আম্মাজান! আপনি কোথা থেকে এলেন?

উত্তর : وَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

বুঝলাম যে, তিনি উমরা করে এসেছেন।

প্রশ্ন : এখানে কিভাবে আসলেন?

উত্তর : مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

বুঝলাম যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

প্রশ্ন : আম্মাজান! আপনি কোথায় যাবেন?

উত্তর : اُدْخُلِ الْمِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ

বুঝলাম, তিনি শহরে যেতে চান। আমি তার বাহনের লাগাম ধরে সম্মুখের দিকে চলতে থাকলাম। চলার পথে আমি তার জীবন বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম যে, তার জীবন কি ভাবে কাটছে? স্বামী আছে কি নেই? আমি জিজ্ঞেস করলাম-

আপনার জীবন বৃত্তান্ত জানতে চাই।

উত্তর : لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

এ আয়াত দ্বারা বুঝলাম যে, বৃদ্ধা আমার সাথে কোন কথা বলতে চাচ্ছেন না। অগত্যা আমি কিছু আরবী কবিতা আবৃত্তি করা আরম্ভ করলাম। বৃদ্ধা কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

'তোমাদের যদি কিছু পাঠ করতেই হয়, তাহলে কুরআন পাঠ কর।'

বুঝলাম আমাকে কবিতা নয়, কুরআন তিলাওয়াত করতে বলা হচ্ছে। আমি কুরআত তিলাওয়াত করতে থাকলাম। অত:পর যখন শহরে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করলাম-

এখানে আপনার কে আছে?

উত্তর : اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

বুঝলাম তার ছেলে সন্তান রয়েছে।

প্রশ্ন : তাদের নাম কি?

উত্তর : اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ

বুঝলাম, তার তিনটি ছেলে রয়েছে, আর তাদের নাম হল ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাম ধরে যখন ডাকলাম, তখন সুন্দর চেহারার তিন যুবক বেরিয়ে এল। তাদের মুখমন্ডলে এত নূর ছিল, এমন আকর্ষণ ছিল যে, দৃষ্টি ফিরানো যাচ্ছিল না। মণি-মুক্তার মত যুবকদের চেহারাগুলো ঝল মল করছিল। সর্বাঙ্গে ছিল তাকওয়ার ছাপ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. বলেন, আমি তাদের রূপ- সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে গেলাম। ছেলেগুলো এগিয়ে আসলেন, মাকে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠলেন, বলতে লাগলেন- আম্মাজান! আমরা তো বড়ই অস্থির ছিলাম, আপনি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন?

তাদের মা বললেন- وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ এ আয়াত শুনা মাত্র ছেলেরা দস্তরখান বিছালেন। আহারের জন্য যা কিছু তাদের নিকট ছিল দস্তরখানে রেখে দিলেন। বললেন- আহার গ্রহণ করুন। আমি অস্বীকার করলাম।

বৃদ্ধা বললেন- اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ

আমি বুঝলাম- আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তিনি মেহমানদারী করতে চান। আমি গ্রহণ করলাম। পানাহার শেষে যখন আমি চলে আসছিলাম, তখন বৃদ্ধা আমাকে কিছু বিদায়ী কথা বললেন এভাবে-

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا

আমি অবাক হয়ে ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনাদের মা-র অবস্থা তো বড়ই আশ্চর্যজনক! তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিটি কথার উত্তরে তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেছেন।

ছেলেরা বলল- আম্মাজান হাফিজে কুরআন। হাদীসেরও বড় আলিম, তার অন্তরে আল্লাহর ভয় এমনভাবে বসে গেছে যে, তিনি সর্বদা চিন্তা করেন

কিয়ামতের দিন যখন আমার আমলনামা খোলা হবে, তখন আমার আমলনামাতে কোন অনর্থক কথার উল্লেখ যেন না থাকে।
বিগত ২০ বছর যাবৎ তার মুখ থেকে কুরআনে কারীমের আয়াত ব্যতীত অন্য কোন কিছু উচ্চারিত হয়নি। (সুবহানাল্লাহ!)
এমন এমন মহীয়সী নারীগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হবেন। বর্তমান যুগের মহিলাদের সময় পরনিন্দা আর অপবাদে কেটে যায়। আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে কি জবাব দিবেন?
আমরা যদি ইসলামের ইতিহাস পড়ি, এই উম্মতের আলিমা নারীদের জীবনী পাঠ করি, তাহলে দেখব তারা কিভাবে সন্তানদেরকে গড়েছেন, দ্বীনী শিক্ষা দিয়েছেন, দ্বীনের খেদমতে কিভাবে নিয়োজিত থেকেছেন।
ইতিহাস সাক্ষী দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে সে যুগের নারীরা কোন ভাবেই পুরুষদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন না।

কুরআন সংরক্ষণে নারীর অবদান

হাকীম তিরমিযী র. লিখেছেন যে, আমি শৈশব কালে এমন ১৭জন মহিলা থেকে ইলম অর্জন করেছি, যারা প্রত্যেকে হাদীস বর্ণনাকারী রাবী ছিলেন। (সুবহানাল্লাহ!) সে যুগে প্রতিটি ঘর দ্বীনের একেকটি বাগান ছিল। কন্যা শিশুরা পর্যন্ত দ্বীনের কাজ করত। এমনকি বিস্ময়কর ব্যাপার হল কুরআন সংরক্ষণে এ উম্মতের কন্যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
সে যুগে তো কোন প্রেস ছিল না যে প্রেস থেকে কুরআন ছাপিয়ে নেয়া হবে। হাতে লিখতে হত। ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে যে, যুবতী মেয়েরা শিক্ষা সমাপ্ত করার পর বৈবাহিক জীবন আরম্ভ করার পূর্বে ঘরে থাকত। প্রতিদিন সাংসারিক কাজ কর্ম শেষ করে জায়নামায বিছিয়ে বসে পড়ত এবং আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখত।
এভাবে প্রতিদিন লিখে লিখে সব মেয়েরা নিজের জন্য একটি করে কুরআন লিপিবদ্ধ করে নিত।
কুরআন লিপিবদ্ধকরণ সমাপ্ত হলে তাদের পিতা-মাতা কুরআন শরীফটি সুন্দরভাবে বাঁধাই করে দিতেন। অত:পর যখন মেয়ের বিবাহ হত ঐ কুরআনখানা তার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হত। যা স্বহস্তেই মেয়েটি লিপিবদ্ধ করেছে।
সে যুগে মেয়েরা যৌতুক স্বরূপ স্বহস্তে লিখা কুরআন নিয়ে স্বামীর বাড়ি যেত। এভাবে একদিকে আল্লাহর কালাম তাদের সঙ্গে থাকত, অপর দিকে

অধিকহারে কুরআনের কপি তৈরী হওয়ার দ্বারা কুরআন সংরক্ষণের পিছনে এটি বিরাট ভূমিকা রাখত।

অতএব কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে যেখানে পুরুষরা ভূমিকা রেখেছেন সেখানে এ উম্মতের নারীরাও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দ্বীনের ব্যাপারেও নারীরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে নেই।

আল্লাহর মা'রিফাত এবং নারী

আধ্যাত্মিক জগতেও নারীরা ঈর্ষনীয় সফলতা লাভ করেছেন। তারা তাৎপর্যপূর্ণ অনেক সূক্ষ্ম কথাও বলতেন। হযরত রাবেয়া বসরী র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রাত্রে দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তিনি হাত তুলে দু'আ করতেন। তার দু'আ ছিল বড়ই আশ্চর্যজনক। দু'আর সময় তিনি বলতেন আয় আল্লাহ! এখন দিন শেষ হয়ে রাত হয়েছে, প্রত্যেকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে গেছে। মালিক! আমার মহব্বত আর ভালবাসা হল তোমার সাথে। আমি তোমার সম্মুখে আচল খুলে বসে আছি। এরপর বড়ই আজব কথা তিনি বলতেন।

বলতেন- আল্লাহ! দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা কপাট বন্ধ করে দিয়েছে, তোমার দরজা এখনও উন্মুক্ত। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। এক পর্যায়ে তিনি বলতেন- হে আল্লাহ! আপনি তো ঐ সত্তা যিনি আকাশকে যমীনের উপর পতিত হওয়া থেকে ধরে রেখেছেন। আপনি শয়তানকে আমার উপর প্রবল হওয়া থেকে ধরে রাখুন। এভাবে তিনি যখন দু'আ করতেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সিনাকে উলূম ও মা'আরিফ দ্বারা ভরপুর করে দিতেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল এ উম্মতের নারীরা দ্বীনের ব্যাপারে এবং মা'রিফাত লাভের ব্যাপারেও পুরুষদের থেকে পিছিয়ে থাকেননি; বরং পুরুষদের সাথে সমান তালে এগিয়ে গেছেন।

দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতিযোগিতা

এ উম্মতের মধ্যে এক দিকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ন্যায় যেমন ফকীহ রয়েছেন, তেমনি হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. এর ন্যায় ফকীহাও রয়েছেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা. এর ন্যায় যেমন হাফিয রয়েছেন, হাফসা বিনতে উমর রা. এর ন্যায় হাফিযাও রয়েছেন। হযরত

হামযা রা. এর মত সাইয়্যিদুশ শুহাদা তথা শহীদদের সরদার পুরুষ যেমন দেখতে পাই, তদ্রূপ হযরত সুমাইয়্যা রা. এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ নারী শহীদাও দেখতে পাই। এমনকি ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তিত্ব হলেন একজন নারী।

এ ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের থেকে এগিয়ে গেছেন। (সুবহানাল্লাহ!)

এ উম্মতে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. এর ন্যায় বীর যোদ্ধাও রয়েছেন, আবার হযরত যারার রা. এর বোন হযরত খাওলা রা. এর ন্যায় বীরাঙ্গনা নারীও রয়েছেন।

ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে রয়েছে যে, হযরত যারার রা. কে কাফিররা গ্রেফতার করেছিল। এ সংবাদে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. চিন্তিত হয়ে পড়লেন, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। শত্রু বাহিনী ছিল বিরাট-বিশাল। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. বলেন- এমন কঠিন মূহূর্তে নেকাবে ঢাকা এক আরোহীকে আমি দেখলাম। যার হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারি। সে ছুটে আসল এবং কাফিরদেরকে তরি-তরকারির মত কাটতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রু বাহিনীর ভিড়কে লাশের স্তূপে পরিণত করে দিল। শত্রু বাহিনীর মধ্যে এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে, তারা হযরত যারার রা.কে রেখেই যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। নেকাবে ঢাকা মুজাহিদ যারার রা. এর হাতকড়া খুলে তাকে মুক্ত করে দিলেন। যখন তারা ফিরে আসলেন আমি অবাক বিস্ময়ে নিকাবধারী ঐ মুজাহিদার কাছাকাছি হলাম।

জিজ্ঞেস করলাম- তুমি কে? এমন বীরত্ব আর অসীম সাহস আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দিয়েছেন।

উত্তরে এক নারী কণ্ঠ ভেসে আসল। বললেন- আমি হচ্ছি হযরত যারার রা. এর বোন (হযরত) খাওলা রা.। আমার ভাইকে কাফিররা বন্দি করেছিল, আমার মনে হয়েছিল, আজ আমার ভাইয়ের জন্য বোনের বড় প্রয়োজন। আমি নিকাব পরিধান করলাম এবং তরবারি হাতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

মুসলমানদের মধ্যে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. এর মত দু:সাহসী বীর মুজাহিদও ছিলেন, আবার হযরত খাওলা রা. এর ন্যায় বীরাঙ্গনা মুজাহিদাও ছিলেন।

এ উম্মতের মধ্যে এক দিকে হযরত হাসান বসরী র. এর ন্যায় আধ্যাত্মিক

মহা পুরুষও রয়েছেন, অপর দিকে হযরত রাবেয়া বসরিয়্যা র. এর ন্যায় আধ্যাত্মিক মহীয়সী নারীও রয়েছেন।

বুঝা গেল, দ্বীনের ব্যাপারেও মহিলারা কখনই পিছিয়ে থাকেননি। তারা হাফেযে কুরআনও হয়েছেন, ক্বারীও হয়েছেন, মুহাদ্দিসও হয়েছেন, দ্বীন প্রচারের কাজে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গও করেছেন।

শিক্ষার্থীরা আল্লাহর প্রিয় হয়ে থাকেন

আজ এ অধম বড়ই সৌভাগ্যবান যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানে আসার সুযোগ হয়েছে, যেখানে ছোট মেয়েদেরকে তা'লীম দেয়া হয়। মেয়েরা কুরআন তিলাওয়াত করে, সিনাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস দ্বারা আলোকিত করে। এরা হচ্ছে সৌভাগ্যবান মেয়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা লাভের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। দ্বীনের জন্য কবুল করেছেন।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا.

স্বয়ং কুরআন সাক্ষী দিচ্ছে যে, 'আমি কিতাবের উত্তরসূরী বানাবো ঐ সব বান্দাদেরকে যারা আমার নির্বাচিত হবে, প্রিয় হবে।' (সুবহানাল্লাহ!) দ্বীনী শিক্ষা লাভকারী ছাত্র-ছাত্রী সকলেই আল্লাহর প্রিয়।

হাদীস শরীফে এসেছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কিরামকে দাঁড় করাবেন। ইরশাদ করবেন-

يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ!

হে ওলামাদের দল! আমি তোমাদের সিনাকে ইলমের জন্য বেছে নিয়েছিলাম। আজ আমি তোমাদেরকে মানুষের সামনে অপদস্থ করতে চাই না। তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছি। বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলিম-উলামাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ আর দয়া করবেন।

হাদীস শরীফে এসেছে- এ উম্মতের সাধারণ মু'মিনরা যখন হাউযে কাউছারের আশে-পাশে সমবেত হবে, তখন ফিরিশতারা পেয়ালা ভরে ভরে তাদেরকে হাউযে কাউছারের পানি পান করাবেন, কিন্তু যখন উম্মতের আলিম-আলিমা হাউযে কাউছারের সামনে উপস্থিত হবেন, তখন স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হস্ত মুবারকে তাদেরকে জামে কাউছার পান করাবেন।

কত বড় সৌভাগ্য যে, স্বয়ং আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। এমন যেন না হয় যে, আমাদের যবান আলিম হলো আর দিল জাহিল থেকে গেল। আমাদের দেমাগ, মস্তিষ্ক আলিম হল, আর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোথাও নবীর সুন্নত থাকল না- এমন দ্বিমুখী জীবন থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

মনে রাখবেন, শয়তান পিছনে লেগে আছে, মাদরাসায় ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও শয়তান আমাদরেকে ছেড়ে চলে যায়নি। চেষ্টা চালাচ্ছে মেয়েরা যেন সময় নষ্ট করে, শিক্ষার্থীরা যেন ইলম দ্বারা উপকৃত হতে না পারে। এ জন্য শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। নফসের প্রবঞ্চনার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। যা কিছু পড়া হয়, যতটুকু ইলম অর্জন করা হয়, নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা চাই।

একটি কথা মনোযোগ সহকারে শুনুন! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনের মধ্যেই আমাদের জন্য ইজ্জত রেখেছেন। মনে রাখবেন যদি মানুষের ব্যক্তিত্ব উন্নত হয়, তাহলে চোখ সুরমা ছাড়াই সুন্দর লাগে। যদি তার মধ্যে লজ্জা থাকে, তাহলে মেকাপ ব্যতীতই চেহারা নজর কাড়ে। আর যদি ললাটে সিজদার চিহ্ন থাকে, তাহলে তো আর কথাই নাই।

অতএব তাকওয়া, পরহেযগারীর সাথে যদি জীবন-যাপন করা হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া-আখিরাতে অবশ্যই সফলকাম এবং সম্মানিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মর্যাদাশালী করুন। অনিষ্টকর দিন এবং রাত থেকে হিফাযত করুন। মন্দ কাজ থেকে অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা করুন। সম্মানিত হওয়ার পর লাঞ্ছনা থেকে বাঁচান। পদস্খলন থেকে হিফাযত করুন।

আল্লাহ! আমরা তো কমজোর, আমরা এত দুর্বল যে, ঘরের সামান্য আসবাব পত্রও আমরা হিফাযত করতে পারি না। ঈমানের হিফাযত কি করে করব? আল্লাহ! আপনি-ই সাহায্য করুন। মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ঈমানের জিম্মাদার হয়ে যান।

এভাবে যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। ঈমানের হিফাযত করবেন।

আল্লাহ! আমাদের জীবনকে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন এবং স্বীয় মাকবূল বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

বি. দ্র. বয়ানের পর হযরত অল্প কিছুক্ষণ মুরাকাবা করিয়েছেন। এ সময় মুনাজাতের কবিতা পাঠ করেছেন। অত:পর নিজেই কেঁদে কেঁদে দু'আ করেছেন।

مناجات

ہواو حرص والا دل بدل دے ÷ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے

بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے ÷ خدایا فضل فرما دل بدل دے

گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں ÷ بدل دے میرا رستہ دل بدل دے

سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں ÷ مزا آجائے مولی دل بدل دے

کروں قربان اپنی ساری خوشیاں ÷ تو اپنا غم عطاء کر دل بدل دے

ہٹا لوں آنکھ اپنی ماسوی سے ÷ جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے

سہل فرما مسلسل یاد اپنی ÷ خدایا رحم فرما دل بدل دے

پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ ÷ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے

ترا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے ÷ بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے

میری فریاد سن لے میری مولی ÷ بنالے اپنا بندہ دل بدل دے

ہواو حرص والا دل بدل دے ÷ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے

মুনাজাত

লোভ লালসায় কাতর হৃদয় বদলে দাও
নিদ্রা বিভোর হৃদয় আমার বদলে দাও,
বদলে দাও দিলের জগত বদলে দাও
দিলটাকে মোর দয়া করে বদলে দাও।
আর কতকাল রইব পড়ে পাপের পথে
দিলটাকে মোর চালাও এবার পূণ্য পথে,
শুনতে চাহি তোমার যিকির হৃদয় তানে
মরতে চাহি খোদা আমি তোমার টানে।
করতে চাহি বিলীন যত খুশির বহর
তোমার ব্যথায় আবাদ কর মোর দিলের শহর,
পার্থিব সব লালসা থেকে বিমূখ আমায় কর
তোমার প্রেমে খোদা আমায় মুগ্ধ সদা রাখ।
তোমার ধ্যানে মত্ত থাকা দাও না করে আসান
করাও মোরে পিয়ালা ভরে বত প্রেমের সুধা পান,
ভগ্ন হৃদয়ে রয়েছি পড়ে দরগাহে তোমার
দাও না খোদা বদলে এবার হৃদয় আমার।
তোমার তরে জীবন আমার তোমার তরে মরণ
হৃদয় জুড়ে থাকুক সদা তোমার পাক স্মরণ,
অধমের ডাকে দাও না সাড়া ওগো রহীম রহমান!
তবো গোলামির মুকুট খোদা করো আমায় দান।
লোভ লালসায় কাতর হৃদয় বদলে দাও
নিদ্রা বিভোর হৃদয় আমার বদলে দাও।

بسم الله الرحمن الرحيم

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর।' - তওবা ১১৯

নেককার হওয়ার পথ

তুমি যদি পাথর কিংবা
আরো কঠিন হও,
আল্লাহওয়ালার পরশ মাখো
যদি স্বর্ণ হতে চাও।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করা সহজ, কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানুষ হওয়া কঠিন। হযরত থানভী র. বলতেন, যে বুজুর্গ হতে চায় সে যেন অন্য কারো কাছে যায়। আর যে মানুষ হতে চায় সে যেন আমাদের কাছে আসে। হযরত বলতেন, আমরা মানুষ বানিয়ে দিব।

আত্মসংশোধন কাকে বলে?

মানুষের স্বভাবের মধ্যে পশুত্ব প্রবল। প্রবৃত্তির চাহিদা ব্যাপক। কঠোর সাধনা, ইলম, যিকির ইত্যাদি দ্বারা সে পশুত্ব ও প্রবৃত্তিকে চাপা দেয়, মঙ্গলজনক দিককে শক্তিশালী করে। অন্ধকার গৃহে আলোর জন্য কুপি জ্বালাতে হয়, বাতি লাগাতে হয়, আলোর ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্ধকার ঘরটি আলোকিত হয় না। তদ্রূপ মানুষের স্বভাব সৃষ্টিগতভাবে তাকে মন্দের দিকে আকৃষ্ট করে, উত্তম কাজের জন্য তাকে নফসের গলায় দড়ি পড়াতে হয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, লাগাম টেনে ধরতে হয়। একেই আত্মসংশোধন বলে। মানুষত্বের বিকাশের জন্য চারিত্রিক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই, এ জন্যই তা'লীম-তরবিয়াত (শিক্ষা-দীক্ষা) এবং ইলম ও যিকির (জ্ঞান ও আল্লাহর স্মরণ) শব্দ দু'টি সর্বদা একত্রে ব্যবহৃত হয়।

তারবিয়াত কোথায় হয়?

আমরা মাদরাসা, স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করি, কিন্তু তারবিয়াত তথা চারিত্রিক প্রশিক্ষণ কোথা থেকে লাভ করব? আল্লাহওয়ালাদের মাহফিল হল তারবিয়াত তথা দীক্ষা লাভের স্থান, আল্লাহওয়ালারা বান্দাকে প্রকৃত বান্দা বানিয়ে দেন। আল্লাহর রঙ- এ রঙ্গীন করে দেন।

কিছু লোক আছেন রঙ বিক্রেতা আর কিছু লোক আছেন রঙের কারিগর। যারা রঙ বিক্রি করেন, তাদেরকে রঙ বিক্রেতা বলা হয়, আর রঙের কারিগর ঐ সব লোককে বলা হয়, যারা কাপড় ইত্যাদি রঙ করে থাকেন।

কুরআন-হাদীস হচ্ছে রঙ। ওলামায়ে কিরাম হলেন রঙ বিক্রেতা।

আর পীর মাশায়েখরা হলেন রঙ্গের কারিগর। যারা বান্দাকে আল্লাহর রঙে রঙ্গীন করেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

'আমরা আল্লাহর রঙ গ্রহণ করব, আর আল্লাহর রঙ্গের চাইতে উত্তর রঙ কার হতে পারে?'

আর আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু সৌভাগ্যবান বান্দাও রয়েছেন যারা

একই সাথে রঙ বিক্রেতা এবং রঙ্গের কারিগরও। তারা শরীয়ত-তরীকতের সমন্বয়কারী। তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে দেন।

বুজুর্গরা মানুষকে মুক্তা বানিয়ে দেন

মানুষ হল অপরিশোধিত স্বর্ণের ন্যায়। খনি থেকে যখন স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মাণিক্য উত্তোলন করা হয়, তখন তা দেখতে পাথরের মত থাকে। দেখলে চেনাও যায় না। অভিজ্ঞরা জানে যে, মাটির ভাঁজে ভাঁজে মণি-মাণিক্য রয়েছে। এগুলোকে প্রথমে পরিষ্কার করা হয়, উপরের মাটি সরিয়ে ফেলা হয়, অত:পর কাটা হয়- একে ডায়মন্ড কাট বলে। এরপর পালিশ করা হয়। উন্নত মেশিনে যখন এগুলোকে পালিশ করা হয়, তখন এর মধ্যে উজ্জ্বলতা আসে। এরপর এগুলো মহামূল্যবান মণি-মুক্তায় পরিণত হয়।

মানুষের অবস্থাও ঠিক তাই। শুরুতে তার দিলের অবস্থা একদম পাথরের মত হয়ে থাকে। অত:পর যখন কোন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গের খেদমতে আসে, তখন আল্লাহ ওয়ালা তাকে ডায়মন্ড কাট বানিয়ে দেন। এ জন্যই কবি বলেন-

قال را بگذار مردے حال شو ÷ پیش مردے کاملے پامال شو

صد کتاب وصد ورق درنار کن ÷ جان ودل را جانب دل دار کن

কথার ঝুড়ি ফেলে এবার
দিলের লাগাম ধর,
কামেল পীরের অধীন হয়ে
পিষ্ট তোমায় কর।
কিতাব-খাতা বইয়ের পাতা
সব জ্বালিয়ে দাও,
দিলের চাবি আল্লাহ তা'আলার
হাতে তুলে দাও।

گر تو سنگ خارۂ مرمر شوی ÷ چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

তুমি যদি পাথর কিংবা
আরো কঠিন হও,

আল্লাহওয়ালার পরশ মাখো
যদি স্বর্ণ হতে চাও।

কবি বলেন- যদি তুমি মরমর পাথরও হয়ে থাক, তবুও কোন আল্লাহ ওয়ালার হাতে হাত রাখ, আল্লাহ ওয়ালা তোমাকে হীরা বানিয়ে দিবেন। আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে থাকলে জীবন রঙ্গীন হয়। এ ধারাবাহিকতা পূর্ব থেকেই চলে আসছে।

জিজ্ঞাসাবাদের নাম হল তারবিয়াত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াত স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন, আর সাহাবায়ে কিরাম রা. এর তারবিয়াত করেছেন স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনি কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেক স্থানে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে لِمَ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এই لِمَ শব্দটি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এর নামই হচ্ছে তারবিয়াত।

কিছু পীর আছেন যারা নীরব সন্যাসী হয়ে বসে থাকেন, কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করেন না, কিন্তু আমাদের এখানের ব্যাপার হল ভিন্ন। এখানে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ রয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। لِمَ (কেন?) তো বলা হয় ঐ সময়ই যখন কোন কিছু বুঝানো বা শিখানো উদ্দেশ্য হয়।

এ لِمَ (কেন?) শব্দটি কুরআনে কারীমে সাধারণ মু'মিনদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দু'টোর মধ্যে পার্থক্য আছে। যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে শুরুতে অথবা শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন। অর্থাৎ لِمَ (কেন) শব্দটি ব্যবহার তো করা হয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি ক্ষমার সুসংবাদও দিয়ে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সব স্থানে শব্দটি সাধারণ মু'মিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, এমন কেন হল? সাবধান হয়ে যাও, সোজা হয়ে যাও। আর যদি সোজা না হও, তাহলে আমি সোজা করে দিব।

দেখুন! আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কত মমতার সাথে শব্দটি ব্যবহার করছেন।

عَفَى اللّٰهُ عَنْكَ

(শুরুতে ক্ষমার উল্লেখ।) 'আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করে দিন।'

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

আপনি তাদেরকে অনুমতি কেন দিলেন?

অথচ সরাসরি এভাবেও বলা যেত,

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

'আপনি তাদেরকে অনুমতি কেন দিলেন?'

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানতেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে খাশইয়াতে ইলাহী তথা আল্লাহর ভয় এমন পর্যায়ে রয়েছে যে, মাগফিরাতের ওয়াদা ব্যতীত শুধু لِمَ দ্বারা সম্বোধন করলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরদাশতই করতে পারবেন না। এ জন্য প্রথমে মাগফিরাতের কথা বলেছেন-

عَفَى اللّٰهُ عَنْكَ

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করে দিন,

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

আপনি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলেন?

আর কোথাও ক্ষমার ওয়াদা পরে করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'হে নবী! আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুটি আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজের উপর তা কেন হারাম করলেন? এবং আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'

এখানে لِمَ শব্দটি আগে উল্লেখ করে পরে মাগফিরাতের ওয়াদা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সাধারণ মু'মিনদের ক্ষেত্রে যখন لِمَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, (আল্লাহু আকবার!) একদম রাজকীয় ভঙ্গিতে কঠোর স্বরে সম্বোধন করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا

'হে ঈমানদাররা!'

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

'তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না?'

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

'আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন কথা বড়ই অপছন্দ যে, তোমরা যা বল তা কর না।'
দেখুন! এখানে মাগফিরাতের কোন ওয়াদা নেই।

তারবিয়াতের আদেশ

স্বয়ং হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বলছেন (আল্লাহু আকবার!) সোজা হয়ে যান, সত্যের উপর মজবুত থাকুন,

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

আপনাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে, সেভাবে মজবুত থাকুন এবং তারাও, যারা কুফর থেকে তওবা করে আপনার সঙ্গী হয়েছে।
এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তারবিয়াত।

নবীজী সা. এর তারবিয়াতের মমতামাখা পদ্ধতি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রা. এর তারবিয়াত করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বুঝাতেন, শিখাতেন, পথ দেখাতেন। বলতেন, অমুক লোকটি তো অত্যন্ত ভাল মানুষ। যদি সে তাহাজ্জুদের পাবন্দী করত। এই ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারবিয়াতের ঢং। প্রথমে প্রশংসা করতেন, অত:পর আদেশ দিতেন।
আমরা এ সূক্ষ্ম বিষয়টি ভুলে যাই। আমরা যখন কারো সংশোধন করি, তখন আমাদের সম্মুখে তার ত্রুটি গুলোই শুধু থাকে, ভাল দিকগুলো মন থেকে হারিয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীকে নামাযের জন্য যখন ঘুম থেকে উঠায়, তখন বলে, উঠ। অত:পর বলে, তুমি তো নামায ছেড়ে দিয়েছ, অলস হয়ে গেছ, লাশের মত বিছনায় পড়ে থাক, লজ্জা হয় না! জীবন সঙ্গীকে দ্বীন শিখানোর এই হল আমাদের ভাষা।
প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমরা পুরুষরা তো ওলামায়ে কিরামের মাহফিলে বসার সুযোগ পাই, মাশায়েখদের মজলিসে শরীক হতে পারি, মসজিদের মত দ্বীনী পরিবেশ বরাবর পেয়ে থাকি, এসব কারণে হয়ত আমাদের

মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু ঘরের মহিলারা তো এসব মাহফিল ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত।

অতএব সে এক মুহূর্তেই বদলে যাবে না। তাদের পিছনে মেহনত করতে হবে। ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। মানুষ গড়া কোন সহজ বিষয় নয়। অনেক সাধনার পর একজন মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

এ জন্য তা'লীম ও তারবিয়াত শব্দ দু'টি পাশাপাশি বলা হয়।

শুধু ইলম অহংকার জন্ম দেয়

মানুষের কাছে যদি শুধু ইলম থাকে। এই ইলম তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে। আচরণে অহংবোধ প্রকাশ পায়।

ইয়াহুদীদের অবস্থা দেখুন। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে তারা ইলমওয়ালা উম্মত ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অহংবোধ এসে গিয়েছিল। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

'আমি এমন লোকদেরকে আমার বিধানাবলী থেকে দূরে রাখব যারা দুনিয়াতে অহংকার করে, যার কোন অধিকার তাদের নেই।'

দেখুন! স্বয়ং কুরআন সাক্ষী দিচ্ছে যে, তাদের মধ্যে অহংকার এসে গিয়েছিল। তারা অহমিকায় পতিত হয়েছিল। স্বগর্বে তারা বলত-

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّائُهُ

'আরে! আমরা তো হলাম শাহযাদা',

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

'আগুন আমাদেরকে স্পর্শই করবে না, করলেও অল্প কিছু দিনের জন্য।'

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا

'তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেছ?'

আসলে তাদের মধ্যে অহংকার এসে গিয়েছিল। পরিণতিতে

وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

'তারা পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা এবং শহীদ কর

অথচ তাদের মধ্যে ইলম ছিল। তা সত্ত্বেও অবস্থা ছিল এই।

শুধু যিকিরের পরিণাম

খৃষ্টানদের মধ্যে যিকিরের স্বভাব ছিল প্রবল। এজন্যই তারা উপাসনালয় বানিয়ে একাকীত্ব পরিবেশে জীবন কাটাত, কিন্তু তারাও পথ ভ্রষ্ট এক জাতি। তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিদ'আত আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বুঝা গেল শুধু যিকির বিদ'আতের দিকে নিয়ে যায়, আর শুধু ইলম তাকাব্বুর শিখায়।

ইলম যিকিরকারীর মধ্যে ভারসাম্যতা আনে। বিদ'আত থেকে রক্ষা করে। আর যিকির ইলম ওয়ালাদের মধ্যে গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে।

সুতরাং ইলম এবং যিকিরের মধ্যে একটি কুদরতী সেতু বন্ধন রয়েছে।

ইলম ও যিকির এক সাথে

এ জন্যই হযরত মাওলানা ইলয়াছ র. যখন ছয় নম্বর তৈরি করেন, তখন প্রতিটি নম্বর একক রেখেছেন। কিন্তু ইলম ও যিকির এ দু'টি শব্দকে পৃথক করেননি। কেননা এ দু'টি একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য।

এ ইলম ও যিকির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ দু'টো যদি এক সঙ্গে থাকে, তখন বান্দার মধ্যে ইলমের নূরও থাকবে, যিকিরের কারণে আমলের প্রতি আগ্রহও থাকবে।

গাড়ি চলার জন্য দু'টি জিনিস প্রয়োজন।

এক. রাস্তা। যদি রাস্তা-ই না থাকে, তাহলে গাড়ি নতুন হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে, সম্মুখে চলতে পারবে না। রাস্তা তৈরি থাকা গাড়ির জন্য এক নম্বর বিষয়।

দুই. পেট্রোল গাড়ির মধ্যে পেট্রোল থাকা দ্বিতীয় পর্যায়ের আবশ্যকীয় বিষয়। একটি নতুন গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, চলে না। কেন? পেট্রোল নাই।

বে-আমল আলিমের উদাহরণ

একবার আমরা কোথাও যাচ্ছিলাম। হঠাৎ জ্যামে পড়লাম। একটি বড় ট্যাংকার রাস্তা ব্লক করে রেখেছিল। জ্যাম ক্লিয়ার হওয়ার পর ট্যাংকারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহর বান্দা! রাস্তা ব্লক করে রেখেছিলে কেন? ড্রাইভার বলল ভাই তেল ছিল না।

দেখুন! টনকে টন পেট্রোল সে বহন করছে, কিন্তু নিজের পেট্রোল শেষ হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বন্ধুদেরকে বললাম দেখ বে-আমল আলিমের এই হল উদাহরণ।

পিঠে টনকে টন পেট্রোল বহন করছে, কিন্তু নিজের ট্যাংকি খালি, তাই চাকা ঘুরছে না, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

তো ইলম হল রাস্তার ন্যায়।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .

'আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করুন।' -ফাতিহা ৫

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ.

'আর এটিই হচ্ছে সরল পথ অতএব এর অনুসরণ কর।' আন'আম।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ، وَاَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত কর না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।' -ইয়াসীন ৬০-৬১

বন্ধুরা আমার! ইলম হল রাস্তার ন্যায়, আর মানুষ হল গাড়ি, আর যিকির হচ্ছে গাড়ির পেট্রোল। যিকির অব্যাহত রাখবে, তাহলে পেট্রোল দিয়ে ট্যাংকি ভরে থাকবে, দ্রুত পথ অতিক্রম করতে পারবে।

বুঝা গেল ইলম ও যিকির উভয়টি জরুরী বিষয়। ইলম ও যিকিরের পরিবেশে মানুষ আমলে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

সোহবত দ্বারা সাহাবী হয়েছেন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবতে (সাহচর্যে) কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত করে সাহাবায়ে কিরাম রা. যে মর্যাদা লাভ করেছেন, জীবনভর সিজদায় পড়ে থেকেও ঐ মর্যাদা লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। নামায দ্বারা যেমন মানুষ নামাযী হয়, যিকির দ্বারা যাকির হয়, তদ্রূপ সোহবত দ্বারা সাহাবী হয়ে থাকেন।

এর দৃষ্টান্ত হল চুম্বক। কোন লোহা যদি কিছুক্ষণ চুম্বকের সঙ্গে থাকে, তাহলে লোহার মধ্যেও চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ ক্ষমতা এসে যায়, তখন এ লোহাও অন্য লোহাকে টানে, আকর্ষণ করে।

তাই সাহাবায়ে কিরাম যখন নবী [illegible] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর সোহবতে বসতেন, তখন তাদের অন্তরাত্মাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেত, চুম্বকে পরিণত হত।

একটি উদাহরণ

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. এর একটি সহজ উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন জমিনের উপর যদি কোন নাপাক বস্তু পড়ে থাকে, তাহলে তা পাক করার পদ্ধতি হল দু'টি-

এক. খুব বৃষ্টি হল। বৃষ্টির পানিতে নাপাক বস্তু কোথা থেকে কোথায় চলে গেল, তার কোন নাম নিশানাও আর থাকল না। এরপর যখন জমিন শুকিয়ে যাবে, তখন একে পবিত্র জমিন বলা হবে।

দুই. সূর্যের আলোর উত্তাপ ঐ অপবিত্র বস্তুটিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। জমিনের উপর তার কোন চিহ্নও আর থাকল না। এর দ্বারাও জমিন পবিত্র হয়ে যাবে।

হযরত বলেন যে, মানুষের অন্তরের দৃষ্টান্ত হল জমিন। গুনাহ হল নাজাসাত বা নাপাক বস্তু। এখন এই নাজাসাত দূর করার পদ্ধতিও দু'টি-

প্রথম পদ্ধতি হল- মানুষ আল্লাহ তা'আলার যিকির এত পরিমাণ এত পরিমাণ করবে যে, যিকিরের বদৌলতে নূরের মুষলধারে বৃষ্টি অন্তরের সব নাজাসাত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল- মানুষ কোন আল্লাহ ওয়ালা সাহেবে দিল বুজুর্গের সোহবতে থাকবে। আল্লাহওয়ালাদের অন্তর সূর্যের ন্যায়। সূর্য্যের আলোর মত আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরের নূরেরও উত্তাপ রয়েছে। তাদের সোহবতে থাকার দ্বারাও দিলের সব নাজাসাত জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে নাই হয়ে যায়।

সোহবতের তাছীর

এ কারণেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবতে থাকা অবস্থায় সাহাবায়ে কিরামের যে অবস্থা হত, ঘরে ফিরে গেলে হুবহু সে অবস্থা আর থাকত না। এ জন্যই তো একজন সাহাবী

نَافَقَ حَنْزَلَةُ نَافَقَ حَنْزَلَةُ

হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে বলতে বলতে ঘর থেকে বের হলেন। পথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, আরে ভাই! তুমি এসব কি বলছ? সাহাবী বললেন

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবতে থাকলে মনের যে অবস্থা আমার হয়, ঘরে আসলে সে রকম আর থাকে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, আরে! আমার অবস্থাও তো তাই। চলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।

এ ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সোহবতে থাকাকালীন অবস্থা ভিন্নতর হয়ে থাকে। এ জন্যই হযরত আনাস রা. বলেন-

لَمَّا كَانَ يَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلَّ شَيْئٍ.

'যে দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনেন, সেদিন মদীনার প্রতিটি বস্তু আলোকিত হয়ে উঠে। প্রতিটি জিনিস নূরের আলোয় সব ঝলমল করে উঠেছিল।'

وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اَظْلَمَ مِنْهَا كُلَّ شَيْئٍ.

'আর যে দিন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দার আড়ালে চলে গেলেন, সব কিছুর উপর অন্ধকার নেমে আসল।'

তিনি আরো বলেন- আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাফন সম্পন্ন করে তখনো হাত ঝাড়িনি

حَتّٰى اَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا

'আমরা আমাদের অন্তরে স্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করলাম।'

বুঝা গেল সোহবত তথা সাহচর্যের আছর ভিন্ন ছিল। আর বর্তমান সোহবতহীন অবস্থা ভিন্ন। স্বয়ং সাহাবীরাও এ পার্থক্য অনুভব করতেন। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসার দ্বারা বান্দার অন্তরে আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

সোহবত অবলম্বন করার আদেশ

এ জন্যই আদেশ হয়েছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ

হে ঈমানদাররা! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় ক

كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর।

এটি আমর তথা আদেশ বাচক শব্দ। এর ব্যবহার দ্বারা সোহবতের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ

তুমি নিজেকে জড়িয়ে রাখ,

مَعَ الَّذِيْنَ

ঐ সব লোকদের সঙ্গে,

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ

যারা সকাল-সন্ধ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তাকে স্মরণ করে।

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

(সুবহানাল্লাহ!) কুরআনে কারীমের কি আশ্চর্য শব্দমালা। ইরশাদ হচ্ছে, তুমি তোমার চেহারা তাদের দিক থেকে সরিয়ে নিও না। তোমার দৃষ্টি তাদের প্রতি যেন নিবদ্ধ থাকে। যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও,

تُرِيْدُوْنَ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

'তাহলে তুমি দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষী সাব্যস্ত হবে।'

অতএব মানুষের কর্তব্য হল, আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করা। এটি হচ্ছে একটি আমল। আর অধিক পরিমাণে যিকির করা, এটি দ্বিতীয় আমল।

এই দু'টি আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের অন্ধকারকে দূর করে দেন। মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে যায়। এ উম্মতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত আকাবির অতিবাহিত হয়েছেন, দেখবেন- তারা সকলে ইলম ও যিকির উভয়টিকে নিয়ে চলেছেন। আমাদের নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার একজন বুজুর্গ হলেন, হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক রা.। অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর দৌহিত্র। তিনি মদীনার সপ্ত ফকীহের একজন ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন উচ্চ মাকাম দিয়েছিলেন যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.কে একবার কেউ জিজ্ঞেস করল- আপনার দৃষ্টিতে এ পৃথিবীতে আমীরুল মু'মিনীন হও[illegible] চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কে?

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব বলেছিলেন- এ বিষয়টি যদি আমার হাতে থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ র.কে আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করতাম।

এ বুজুর্গ এক দিকে মদীনার সপ্ত ফকীহের একজন ছিলেন, অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে দিয়েছিলেন যে, তিনি আমাদের নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার একজন উর্ধ্বতন বুজুর্গ হিসেবে পরিগণিত হন।

আরো দেখুন হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক র., তিনি ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা র. এর শায়খ ছিলেন। দুই বৎসর তাদের মধ্যে উঠা- বসা ছিল। এর লম্বা বিবরণ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা র. স্বয়ং বলেন-

لَوْ لَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ

'এ দু'টি বছর যদি আমার জীবনে না থাকত, তাহলে আমি নো'মান ধ্বংস হয়ে যেতাম।'

ইমাম আবু হানীফা র. এর উক্তি 'এ দু' বছর না হলে নো'মান ধ্বংস হয়ে যেত' এ কথা প্রমাণ করে যে, হযরতের সোহবত দ্বারা তিনি অনেক, অনেক কিছু অর্জন করেছিলেন।

ইমাম শাফী র. বলতেন- সুফীদের দু'টি কথা দ্বারা আমার অনেক উপকার হয়েছে।

দেখুন! ইমাম শাফী র. এর মত ব্যক্তিত্ব বলছেন- সুফিয়ায়ে কিরামের দু'টি কথা দ্বারা আমার বড় ফায়দা হয়েছে।

এক. সময় হচ্ছে একটি তরবারি। যদি তোমরা একে কর্তন না কর, তাহলে সে তোমাদেরকে কর্তিত করবে।

দুই. তোমরা যদি নফসকে হক পথে ব্যস্ত না কর, তাহলে সে তোমাকে বাতিল পথে অবশ্যই ব্যস্ত করে দিবে।

কথা একদম সত্য। আমরা নফসের যত্নে/লালন পালনে মাশগুল রয়েছি, আর নফস আমাদেরকে জাহান্নামে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর নিকট একজন বুজুর্গ আসতেন। বহুল প্রচলিত সুফী শব্দটি সর্বপ্রথম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। বুজুর্গ লোকটি যখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর নিকট আসতেন, অনেক সময় ঐ বুজুর্গের সম্মানে ইমাম সাহেব র. দরস

মুলতবি করে দিতেন এবং দাঁড়িয়ে যেতেন, তাকে পাশে বসাতেন। ছাত্রদের মনে প্রশ্ন জাগত ইমাম সাহেব এত বড় আলিম, ইলমের পাহাড়, আর ইনি তো একজন দরবেশ মাত্র। ইমাম সাহেব তার জন্য দাঁড়িয়ে যান, এমনকি দরসও মুলতবি করে দেন, তার কথা মনোযোগের সাথে শুনেন। একদিন এক শাগরিদ জিজ্ঞেস করে বসল। হযরত! আমাদের কিছুই বুঝে আসে না। আপনি তাকে এত সম্মান কেন করেন?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. আশ্চর্য এক আলেমানা জবাব দিলেন। বললেন দেখ! আমি হলাম আলিম বি কিতাবিল্লাহ তথা কুরআন হাদীসের আলিম, আর আবু হাশিম হলেন আরেফ বিল্লাহ (আল্লাহর জাত ও ছিফাতের আলিম)। আর আরেফ বিল্লাহ আলিম বি কিতাবিল্লাহ থেকে উত্তম।

ইমাম আহমদ র. তার সোহবত অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন- যদি আবু হাশিম কূফী না হতেন, তাহলে আমি রিয়া সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বিষয় গুলো কখন-ই জানতাম না।

মহব্বতের মর্ম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন

ইমাম মালিক র. বলতেন, মহব্বত শব্দের অর্থ যদি জানতে হয়, তাহলে আমরাও তা বলে দিতে পারব যে, শব্দটির উৎস কি, প্রকার কি, কোন বাব থেকে এর উৎপত্তি হয়? কিন্তু এর মর্ম যদি তোমাদেরকে জানতে হয় তাহলে অমুক শায়খের নিকট তোমাদেরকে যেতে হবে। তিনি মহব্বতের মর্ম তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। এভাবে এ উম্মতের আলিমগণ সমকালীন মাশায়েখদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রেখে চলতেন।

স্মরণীয় কথা

একটি মৌলিক কথা স্মরণে রাখা চাই যে, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আলিম হবে, সে সর্বদা মাশায়েখদেরকে মূল্যায়ন করবে, সম্মান করবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে সুফী সাধক হবে, সে আলিম-উলামাদের সম্মান করবে। ইলম পরিপূর্ণ হলে মাশায়েখদের সম্মান করবে, তদ্রূপ ইশক পরিপূর্ণ হলে উলামাদের মূল্যায়ন করবে। পক্ষান্তরে যদি ইলম অসম্পূর্ণ হয় তদ্রূপ ইশকও যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। যেখানেই উল্লেখিত দুই শ্রেণীকে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত দেখবে, বুঝে নিবে যে, এখানে উভয় পক্ষের অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

দেওবন্দী উলামাদের মর্যাদা

আমাদের দেওবন্দী আলিমদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য ছিল যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুই সমুদ্রের মোহনা বানিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একই সাথে ইলমও ছিল, যিকিরও ছিল। ফলে তাদেরকে পীরের গদিতে সমাসীন দেখলে জুনায়েদ বাগদাদী র., বায়েজীদ বুস্তামী র. এর কথা মনে হত। আর হাদীসের মসনদে উপবিষ্ট দেখলে ইমাম আসকালানী র., ইমাম কাস্তালানী র. এর স্মরণ তাজা হত। উভয় প্রকার নিসবত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে দান করেছিলেন। এ কারণেই তারা আল্লাহ তা'আলার মাকবূল বান্দায় পরিণত হয়েছিলেন। তাদের ফয়েয পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল।

বর্তমান যুগে এমন কোন মুফতী নেই যার কাছে ফতওয়া শামী নামক ফতওয়ার সংকলনটি পাওয়া যাবে না। এ কিতাবটি মাসআলা দেখার জন্য সর্ব প্রথম মুফতীদের হাতে উঠে। এ গ্রন্থটির সংকলক হলেন, হযরত আল্লামা শামী র.। দেখুন! আল্লাহ তা'আলা কিতাবটিকে সর্ব মহলে কেমন সমাদৃত করেছেন। এই আল্লামা শামী র. নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। তার শায়খ ছিলেন হযরত শায়খ মাওলানা খালিদ রুমী র.। ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে দিল্লীতে আগমন করেন এবং হযরত মূসাজী র. এর শায়খ হযরত আবদুল্লাহ দেহলভী র. এর সান্নিধ্যে থাকেন এবং এখান থেকেই খেলাফত লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরাক, তুর্কিস্তান এবং সিরিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছেন। এমনকি ইমাম শামী র. তার অবদান ও কর্মের উপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও রচনা করেছেন। কত বড় মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছিলেন যে, আল্লামা শামী র. এর মত ব্যক্তিত্ব তার জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন।

হযরত গাঙ্গুহী র. এর ঘটনা

ফিকাহ শাস্ত্রে দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের মধ্যে হযরত গাঙ্গুহী র. একটি বিশেষ স্থান লাভ করে আছেন। তাকে ফকীহুল উম্মত বলা হত। শিক্ষা জীবন শেষ করার পর একদিন তিনি ভাবলেন, থানাভবন যাই এবং হযরত হাজী সাহেব র. এর খেদমতে একদিন থেকে আসি। ছাত্ররা যেমন বুজুর্গদের কাছে দু'আ নেয়া বা দেখা করার জন্য যেয়ে থাকে।

হযরত গাঙ্গুহী র. হাজী সাহেব র. এর খেদমতে গেলেন, অত:পর যখন ফিরে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন, তখন হযরত হাজী সাহেব র. বললেন-
মিয়া রশীদ আহমদ! তুমি কিছু দিন আমাদের এখানে থেকে যাও।
গাঙ্গুহী র. : হযরত! পড়ানোর দায়িত্ব আছে, অতএব আমাকে ফিরে যেতেই হবে এবং যেতে হবে পায়ে হেঁটে। রাতে যদি ভাল ঘুম না হয়, তাহলে দিনের বেলা সফর করতে পারব না। আর সফর করতে না পারলে সবকও পড়াতে পারব না। এ জন্য এই মুহূর্তেই অনুমতি চাচ্ছি।
হাজী সাহেব র. : আরে ভাই! রাতটা এখানেই থেকে যাও।
গাঙ্গুহী র. : হযরত! খানকার মধ্যে তো লোকেরা রাত্রি জাগরণ করে, এ অবস্থায় আমি ঘুমাব কি করে?
হাজী সাহেব র. : মিয়া রশীদ আহমদ! যেহেতু তোমাকে সফর করতে হবে। তোমাকে কেউ জাগাবে না। তুমি আরামে ঘুমাতে পারবে।
হযরত গাঙ্গুহী র. আর অস্বীকার করতে পারলেন না।
গাঙ্গুহী র. : আচ্ছা হযরত, তাহলে আমি এখানেই শুয়ে পড়ি। সকাল সকাল উঠে চলে যাব।
হাজী সাহেব র. খাদেমকে বললেন- ভাই! মিয়া রশীদ আহমদের চকি আমার চকির পাশে রেখে দিও। আসলে উদ্দেশ্য এর দ্বারাই সাধন হওয়ার ছিল।
গাঙ্গুহী র. : আমি চকিতে শুয়ে পড়লাম। তাহাজ্জুদের সময় আমার চোখ খুলে গেল, দেখলাম কেউ নফল পড়ছে, কেউ যিকির করছে, কেউ কেঁদে কেটে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আয় মগ্ন, আবার কেউ সিজদায় পড়ে কান্না কাটি করছে। আশ্চর্য এক অবস্থা বিরাজ করছিল। আমার মনে চাচ্ছিল আমি ঘুমিয়ে-ই থাকি, কিন্তু বিবেক বলল রশীদ আহমদ! নবীর উত্তরসূরীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো তুমিও কর। আর নবীদের আখলাক তো ছিল–

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

'তারা রাতের বেলায় অল্প সময় ঘুমাতেন এবং শেষ রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতেন।'
হযরত গাঙ্গুহী র. বলেন- এভাবে একের পর এক আয়াত এবং হাদীস আমার স্মরণে আসতে লাগল। এক পর্যায়ে বিছানা আমাকে ছুড়ে ফেলল। আমি উঠে বসে পড়লাম। অজু করলাম, তারপর কিছু নফল নামায

পড়লাম, এরপর অন্যান্যরা যেমন যিকির করছিল আমিও যিকির আরম্ভ করে দিলাম। ফজর নামায শেষে হযরত হাজী সাহেব র. এর খেদমতে আসলাম বিদায় নেয়ার জন্য।

হাজী সাহেব র. : আচ্ছা মিয়া রশীদ! আমার পাশে যিকির করছিল লোকটা কে?

গাঙ্গুহী র. : হযরত! আমি-ই। আপনার পাশে বসে আমি-ই যিকির করছিলাম।

হাজী সাহেব র. : মিয়া রশীদ আহমদ! যিকির যদি করতেই হয়, তাহলে শিখে কেন করছ না?

গাঙ্গুহী র. : হযরত! আমাকে শিখিয়ে দিন। তৎক্ষণাৎ বাই'আত হয়ে গেলেন।

বাই'আত হওয়া মাত্র আমার অবস্থা বদলে গেল। আমি বললাম- হযরত! এখন আমি এক মাস/চল্লিশ দিন এখানেই থাকব। হাজী সাহেব র. ও রেখে দিলেন। যিকির শুরু হয়ে গেল। হাজী সাহেব র. পথ দেখাতে থাকলেন। এক মাস মেহনত চলল, প্রদীপ তো প্রস্তুত ছিল-ই। হাজী সাহেব র. শুধুমাত্র আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। এক মাসের মধ্যে কাজ পূর্ণ হয়ে গেল।

হাজী সাহেব র. যখন দেখলেন তার মধ্যে যিকিরের গভীর ছাপ দেখা যাচ্ছে, তখন পরীক্ষা নেয়ার এরাদা করলেন। আল্লাহওয়ালারা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যাচাই বাছাই করেন। দেখেন বান্দার মধ্যে যিকিরের কি আছর হয়েছে?

এরই মধ্যে একদিন হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী র. আগমন করলেন। হাজী সাহেব র. এর সাথে কোন এক দাওয়াতে তার শরীক হওয়ার কথা ছিল। হাজী সাহেব র. যাওয়ার সময় গাঙ্গুহী র. কেও সঙ্গে নিয়ে নিলেন। যখন দাওয়াতকারীর ঘরে পৌঁছলেন, সেখানে বাহারি খাবার দ্বারা দস্তরখান সাজানো ছিল। হাজী সাহেব র. বসেই এক প্লেটে সামান্য কিছু ডাল আর দু'টি রুটি হযরত গাঙ্গুহী র. এর হাতে দিয়ে বললেন- মিয়া রশীদ আহমদ! ওখানে বসে তুমি খেয়ে নাও। এরপর নিজেরা খেতে লাগলেন মাছ, মুরগী এবং নানা সুস্বাদু খাবার। বর্তমান যুগের মুরীদ হলে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর তৎক্ষণাৎ বাই'আত-ই ভেঙ্গে দিত এবং বলত- পীর সাহেবের মধ্যে ইনসাফ নেই। কিন্তু তারা

জানতেন, আল্লাহ ওয়ালারা বড় জ্ঞানী, বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন। তাদের কোন কাজই উদ্দেশ্য বিহীন হয় না।

হযরত গাঙ্গুহী র. দস্তরখানের এক কোণে বসে খেতে লাগলেন। হযরত হাজী সাহেব র.ও স্বাভাবিকভাবে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাগত স্বরে বলতে লাগলেন- মিয়া রশীদ আহমদ! মনে তো চায় তোমাকে আরো দূরে কোথাও বসতে দেই, তোমার উপর এটা অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তোমাকে দস্তরখানের এক প্রান্তে বসার সুযোগ দিয়েছি।

দেখুন! এক দিকে শুধু ডাল আর রুটি দিলেন, এর উপর আবার দস্তরখানের এক কোণে বসতে দিয়ে অনুগ্রহ করেছি বলছেন! এমন কথা যখন অনেক লোকের সামনে বলা হয়, যাকে বলা হচ্ছে তিনি যদি নিজেও কোন বড় আলিম হন, তখন নফস চরম উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

হযরত হাজী সাহেব র. কথাগুলো বলার সময় হযরত গাঙ্গুহী র. এর চেহারা গভীরভাবে দেখতে লাগলেন। তার নফস উত্তেজিত হয় কি না? কিন্তু নফস তো সম্পূর্ণ রূপে মিটে গিয়েছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত গাঙ্গুহী র. হাজী সাহেব র. এর কথাগুলো শুনে যেন আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন হযরত! আপনি সত্য কথাই বলেছেন। আমি তো আপনার জুতোগুলোর পাশে বসারও উপযুক্ত নই, এটা আপনার বড় অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে দস্তরখানের এক কোণে জায়গা দিয়েছেন।

হযরত হাজী সাহেব র. যখন দেখলেন, নফস উত্তেজিত হওয়ার পরিবর্তে মুখমন্ডল জুড়ে খুশীর আভা ফুটে উঠছে, তখন ইরশাদ করলেন- আলহামদু লিল্লাহ! যিকিরের আছর এখন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। দাওয়াত থেকে ফিরেই হযরত হাজী সাহেব র. ইজাযত এবং খেলাফত দান করলেন।

হযরত গাঙ্গুহী র. বিস্মিত হয়ে : হযরত! আমার মধ্যে তো আমি কিছুই দেখি না।

হাজী সাহেব র. : রশীদ আহমদ! তোমাকে এই ইজাযত ও খেলাফত এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তুমি নিজের মধ্যে কিছুই দেখ না। যদি নিজেকে কিছু মনে করতে, তাহলে এই সৌভাগ্য কখনো তা লাভ করতে না।

যাহোক! এরপর হযরত গাঙ্গুহী র. ফিরে আসলেন। এক/দুই বছর গাঙ্গুহ থেকে কাজ করলেন। হযরত হাজী সাহেব র. একবার গাঙ্গুহ তাশরীফ আনলেন। দু'জনের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার পর হযরত হাজী সাহেব র.

একটি আজীব কথা জিজ্ঞেস করেছেন। যা স্মরণে রাখার মত, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত।

হাজী সাহেব র. : রশীদ আহমদ! বল তো বাই'আত গ্রহণের পূর্বে এবং পরে তুমি নিজের মধ্যে কি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন ছিল।

গাঙ্গুহী র. : কিছুক্ষণ ভাবলেন, অত:পর বললেন হযরত! আমি তিনটি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি।

এক. বাই'আত গ্রহণের পূর্বে মুতালা'আ করার সময় আমি নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম, যে কারণে আমাকে কিতাবের টীকা এবং শরাহ দেখতে হত। অনেক পরিশ্রম করে তার সমাধান বের করতে হত। বাই'আত গ্রহণের পর এখন আর কোন প্রশ্নেরই সম্মুখীন হই না। সব প্রশ্ন আপনা আপনিই সমাধান হয়ে যায়। মনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সমাধান ঢেলে দেন। এটা হল প্রথম পরিবর্তন।

দুই. দ্বিতীয় পরিবর্তন হল- এখন শরীয়তের কোন বিধানের উপর আমল করার জন্য আমার নফসকে প্রস্তুত করতে হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই শরীয়তের হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমি আমল করে যাই।

তিন. তৃতীয় পরিবর্তন আমি এই লক্ষ্য করেছি যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে হক কথা বলে দেই। নিন্দুকের নিন্দার কোন পরওয়া করি না। (আল্লাহু আকবার!)

হযরত হাজী সাহেব র. যখন কথাগুলো শুনলেন, বললেন- মিয়া রশীদ! দ্বীনের স্তর হল তিনটি।

এক. দ্বীনের সর্বপ্রথম স্তর হল ইলম। আর ইলমের কামাল হল এই যে, শরীয়তের বিধানাবলীর মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্ব বা প্রশ্ন না হওয়া। যদি অবস্থা এমন হয়, তাহলে ইলম কামিল।

দুই. দ্বীনের দ্বিতীয় স্তর হল আমল। আর আমলের কামাল তথা উৎকর্ষ হল এই যে, শরীয়ত কর্তৃক অপছন্দনীয় কাজগুলো নিজের কাছেও অপছন্দনীয় হওয়া। যে সব বিষয় শরীয়ত অপছন্দ করে, স্বভাবগত ভাবেও ঐ সব বিষয়গুলোর প্রতি ঘৃণা থাকা। এটি হচ্ছে আমলের কামাল বা উৎকর্ষ।

তিন. দ্বীনের তৃতীয় স্তর হল ইখলাছ। আর ইখলাছের কামাল হল এই যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে। এমনকি কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া তার থাকবে না। মানুষের প্রশংসা বা

কুৎসা সমান মনে হবে। এটাই হচ্ছে ইখলাছের কামাল।

মোবারক হোক! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইলমের মধ্যেও পরিপূর্ণতা দান করেছেন, আমল এবং ইখলাছের মধ্যেও পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

أُولٰئِكَ آبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

তারাই মোদের পিতৃপুরুষ
দেখাও তাদের তুল্য,
জারীর! যেদিন আসর বসে
দিয়েও অনেক মূল্য।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও এসব আকাবির-বুজুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।' -রহমান ৪৮

আল্লাহর ভয়

দরগাহে তব হাযির প্রভু
বান্দাহ গুনাহগার,
দগ্ধ হৃদয়ের তপ্ত লাভায়
আমি মূর্ছিত বারবার।
ক্ষমা কর হে প্রভু! আমায়
ক্ষমা-ই তোমার শান,
বিতাড়িত হলে পাব কোথায়
এমন দয়াবান।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء.

وقال الله تعالى في مقام آخر : وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى.

وقال الله تعالى في مقام آخر : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم ضل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

আশা এবং ভয়

বহুল প্রচলিত দু'টি শব্দ হচ্ছে- আশা এবং ভয়। পূর্বের কয়েকটি বক্তৃতায় আমি আল্লাহ তা'আলার রহমত সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আশার বাণী শুনিয়েছি। আজ আমি যুবকদেরকে সম্মুখে বসা দেখে ভাবলাম আল্লাহ তা'আলার 'খওফ' নামক নেয়ামত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি।

আমরা আশাকে তো নেয়ামত মনে করি, কিন্তু আল্লাহর ভয়কে নেয়ামত মনে করি না, অথচ এটিও আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট নেয়ামত। সকল প্রকার গুনাহ থেকে বাঁচার একমাত্র চাবি-কাঠি। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ.

আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভয় কামনা করছি, যা আমার মধ্যে এবং গুনাহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হবে। সুতরাং খওফও আল্লাহ তা'আলার বিরাট নেয়ামত। যার বদৌলতে মানুষ গুনাহ থেকে রক্ষা পায়। আজকের এই মাহফিলে আমি মাকামে খওফের বিশ্লেষণ করব। আমরা আমাদের অন্তর হাতড়িয়ে দেখব আমাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ তা'আলার ভয় আছে, কি নেই?

ভয় এবং বিষণ্নতার মধ্যে পার্থক্য

দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে খওফ–ভয়, অপরটি হচ্ছে হুয্ন–শোক বা বিষণ্নতা। খওফ বাহ্যিক ভয়কে বলে, আর হুয্ন বলে অভ্যন্তরীণ বিষণ্নতাকে। মানুষের অন্তরে যখন শোক বৃদ্ধি পায়, তখন তার খাওয়া-দাওয়া কমে যায়। যেমন সন্তান হারানো মা। অনেক দিন পর্যন্ত খাবার ছুঁয়েও দেখেন না। ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ছাত্ররা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ঘরে উন্নত খাবার প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও খেতে চায় না।

সুতরাং মানুষের অন্তরে যখন বিষণ্নতা বৃদ্ধি পায়, তখন তার খাওয়া-দাওয়া কমে যায়। পক্ষান্তরে যখন খওফ তথা আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি লাভ করে তখন গুনাহ কমে যায়। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। অটোমেটিক তার গুনাহ কমে যায়, বন্ধ হয়ে যায়।

উদাহরণ হল- ফাঁসির আদেশ হওয়া ব্যক্তি, সে কন্ডেম সেলে বসে কখনই গুনাহের পরিকল্পনা করে না। তার অন্তরে ভয় এমন ভাবে ছেয়ে থাকে যে,

গুনাহের কোন ইচ্ছাই তার মনে জাগে না। সর্বদা এই ভয় তাকে তাড়িত করে যে, কালকেই আমাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

বুঝা গেল আল্লাহর ভয় হচ্ছে গুনাহ থেকে বাঁচার মন্ত্র। তবে অন্তরে কখন ভয় বেশী থাকা চাই, আর কখন আশা বেশী থাকা চাই; এটি এক জটিল বিষয়।

আশা এবং ভয় আল্লাহর নেয়ামত

ইমাম গাযালী র. বলেন- যৌবনকালে বান্দার মনে ভয় বেশী থাকা চাই। যেন নফস দুর্বল থাকে, গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়। আর বার্ধক্যের সময় আশা প্রবল থাকা চাই, নফস তখন দুর্বল থাকে তিনি আরো বলেন- আনন্দঘন মুহূর্তে মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় অধিক থাকা উচিত, যেন সীমা লঙ্ঘন না হয়। আর শোকের মুহূর্তে আশা প্রবল থাকা উচিত, যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়। তদ্রুপ সুস্থতার সময় ভয়, আর অসুস্থতার সময় আশা অধিক থাকা চাই। আজকে যেহেতু সম্মুখে যুবকরা বসে আছেন, তাই আপনাদের মুখগুলোই আমার বক্তব্যের বিষয় বস্তু নির্ধারিত করে দিয়েছে। বাস্তবিক অর্থেই এ বিষয়ে আমাদের অন্তরে অনেক কিছু বসানো প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত খওফ আজ আমাদের অন্তরে নেই এই খওফ আল্লাহ তা'আলার এক আশ্চর্য নেয়ামত। এ নেয়ামতের জন্য আমাদের দু'আ করা চাই যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন ভয় দান করুন, যার দ্বারা আমরা গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করতে পারব।

সব কিছুর উপর আল্লাহর আদেশ

ইমাম গাযালী র. আরো বলেন- এ পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর হুকুম বলবৎ রয়েছে।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ

আল্লাহ তা'আলা এমন ক্ষমতাশালী বাদশাহ এবং স্রষ্টা যে, প্রতিটি বস্তুর লাগাম তার হাতের মুঠোয়। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য সমস্ত জগতের উপর আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব শতভাগ প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বাইরে কোন কিছুই হয় না, এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ.

'সূর্য্যের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে চন্দ্রকে ধরে ফেলবে এবং রাত দিনের পূর্বে আগমন করতে পারে না। উভয়টি আপন আপন কক্ষে সন্তরণ করছে।'

প্রতিটি বস্তু তাসবীহ পড়ছে, আর যে দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তা পালন করে যাচ্ছে। এখন থাকল মানুষ। মানুষের অর্ধেকের উপরও আল্লাহ তা'আলার হুকুম প্রতিষ্ঠিত। যেমন আপনি লোকমা মুখে পোরার তো ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু মুখে দেয়ার পর আপনার ক্ষমতা শেষ। এখন এই লোকমা পেটে পৌঁছবে, সেখানে অটোমেটিক প্রসেসিং হবে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম মুতাবিক নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে সেখানে সব কিছু চলবে। এর অন্যথা করার ক্ষমতা কারো নেই।

বুঝা গেল মানুষের দেহের অর্ধেক আল্লাহ তা'আলার হুকুম মুতাবিকই চলে, বাকি অর্ধেকের উপর আল্লাহ তা'আলা অল্প সময়ের জন্য আমাদেরকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, তোমরা এ দেহকে আমার হুকুম মুতাবিক পরিচালিত কর। এখানে এসে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহওয়ালারা দেহের এ অংশটিকেও আল্লাহ তা'আলার হুকুম মত পরিচালিত করেন আর গাফিল উদাসীন লোকেরা খেয়াল খুশীমত চলে, নফস এবং শয়তানের কথা মানে, কিন্তু কতদিন? আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আমরা কতদিন পালিয়ে বেড়াব? আমাদেরকে অবশেষে ধরা দিতেই হবে।

ইরশাদ হচ্ছে-

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ.

'হে জিন ও মানবকুল! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।' - রহমান ৩৩

আমরাতো একুরিয়ামের মাছের ন্যায়, কোথায় পালাব? অতএব বুদ্ধিমত্তার দাবি হল, দেহের এ অংশটিকেও আমরা আল্লাহ তা'আলার হাতেই ন্যাস্ত করে দেই।

إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ.

'সব কিছু তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।'

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগত এবং ফরমাবরদার বান্দা হয়ে যাই। এ সরল কথাটি যে বুঝল, দুনিয়া-

আখিরাতে সে সফলকাম হবে। আর যে বুঝল না, খেয়াল-খুশীমত জীবন যাপন করল, তার হাতে সময় বেশী নেই। অবশেষে তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

'নিঃসন্দেহে তার ধর-পাকড় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।'

তাকওয়ার সংজ্ঞা

কিছু কাজ পরিহার করাকে তাকওয়া বলে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এর ওসিয়ত করেছেন-

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ.

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদেরকে ওসিয়ত করেছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাকওয়া অবলম্বন কর, পরহেযগার হয়ে যাও।'

গুনাহ থেকে বাঁচার নাম হল তাকওয়া। এমন সব কর্মকান্ড পরিত্যাগ করা যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, তাকেই তাকওয়া বলে। এই তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে করেছেন।

অমুখাপেক্ষী সত্তা আল্লাহ

প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই কার্যকর হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা হলেন বে-নিয়ায সত্তা। সমগ্র ভূখণ্ড যদি কা'বায় পরিণত হয়, সব মানুষ যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর ন্যায় হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলার সম্মান-মর্যাদায় কোন প্রকার বৃদ্ধি ঘটবে না, তদ্রূপ সমগ্র পৃথিবী যদি কুফরিস্তান হয়ে যায়, গোটা মানব জাতি ফিরআউন, কারুণ আর হামানে পরিণত হয়, আল্লাহ তা'আলার শান এতটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। আল্লাহ হলেন, অমুখাপেক্ষী সত্তা। আমাদের যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর আযমতের, আল্লাহর বড়ত্বের পর্দার নিচেই পড়ে থাকে।

وَهُوَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ.

'পূত পবিত্র ঐ সত্তা উচ্চ, আরও উচ্চ, আরো উর্ধ্বে, আরো বড়, আরো মহান।'

আল্লাহর ইচ্ছাই সর্বদা পূর্ণ হয়

দেখুন! হযরত আদম আ. সর্বদা জান্নাতেই থাকতে চেয়েছিলেন। এ আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মর্জি ছিল তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। ফলাফল কি দাঁড়ালো? কার ইচ্ছা বাস্তবতার মুখ দেখল? আল্লাহর।

সাইয়্যিদিনা হযরত ইবরাহীম আ. আপন পুত্রকে যবাই করার জন্য ছুরি চালাচ্ছেন। সংকল্প হল আমি এ পুত্রকে কুরবানী করে দিব, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হল, এ শিশুটি যেন যবাই না হয়। এখানেও কার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হল? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের।

হযরত নূহ আ. এর সম্মুখে তার প্রিয় পুত্র ডুবে যাচ্ছে, তিনি বুঝাচ্ছেন-

يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكَافِرِيْنَ.

'হে বৎস! আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফিরদের সঙ্গে থেকো না।'

দেখুন! হযরত নূহ আ. চাচ্ছেন তার পুত্র যেন রক্ষা পায়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ইচ্ছা তার উল্টো। কার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংকল্প করছেন, আজকের পর আর কখনো আমি মধু সেবন করব না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে পয়গাম আসল-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'হে নবী! যে বস্তু আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি তা নিজের জন্য স্ত্রীদের সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেন হারাম করছেন? আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।'

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু সেবন করলেন। তো কার ইচ্ছা পূর্ণ হল? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের।

এসব ঘটনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছা-ই পূর্ণতা লাভ করে। তাহলে আমরা কেন তার নাফরমানী করে তাকে অসন্তুষ্ট করি? আমাদের উচিৎ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট রাখা, তাকে খুশী করা। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে অসন্তুষ্ট করল, সে কোন দিন সফলকাম হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা যখন অসন্তুষ্ট হন, তখন বিপদ কাকে বলে, অপদস্থতা কাকে বলে- দেখিয়ে দেন।

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

'আল্লাহ তা'আলা যাকে অপদস্থ করেন, তাকে সম্মান দেয়ার কেউ নেই।' এ জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করল, সে সব-ই ধ্বংস করল। আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে আমাদের ভীষণ ভয় করা উচিত।

ভয় এর তিন স্তর

হযরত ইমাম গাযালী র. লিখেছেন যে, ভয় এর তিনটি স্তর রয়েছে।

এক. সবচেয়ে নিম্নস্তরের ভয় যাকে সাধারণ মানুষের ভয় বলা হয়। সাধারণ মানুষের ভয় ছোট শিশুদের ভয়ের মত হয়ে থাকে। কোন শিশুর হাতে যদি কাঁচের কোন বস্তু ভেঙ্গে যায়, তখন তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়, সে ভাবে, আম্মাজান জেনে ফেললে আমাকে মারবেন। এ জন্য সে পূর্ব থেকেই মানুষিকভাবে প্রস্তুত থাকে, অপেক্ষায় থাকে যে, আম্মা জানা মাত্র আমাকে ধোলাই করবেন। সাধারণ মানুষদের ভয়ও এ পর্যায়ের। তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘন করে, গুনাহ করে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ করে, তখন তাদের অন্তরেও এসব অপকর্মের কারণে এক ধরনের ভীতি কাজ করে যে, আমরা কবরে এবং পরকালে এসব অপকর্মের জন্য শাস্তির সম্মুখীন হব। এই হল সাধারণ মানুষের ভয়। তারা নিজেদের কর্ম-কান্ড, পাপকার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে মনে মনে শংকিত হয় যে, এসবের কারণে তো পরকালে আমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে।

দুই. দ্বিতীয় স্তরের ভয় নিম্নস্তরের তুলনায় অনেক উন্নত। এ স্তরের ভয়কে সৎকর্মপরায়ণদের ভয় বলা হয়। এর বিশ্লেষণ হল, এ স্তরের লোকেরা নেককাজ করেন, কিন্তু নেককাজ করার পর তাদের এমন অনুভূতি হয় যে, আমরা যথাযথভাবে আমল করতে পারিনি। যেমন আমল করা কর্তব্য ছিল, আমাদের দ্বারা তা হয়নি। আল্লাহ-ই জানেন আমাদের এসব আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ ধরনের একটি ভীতি তাদের মধ্যে কাজ করে। এ শ্রেণীর লোকেরা গুনাহ তো করেন না, কিন্তু নিজেদের নেক আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্পর্কে শংকিত থাকেন।

ইমাম আযম ইমাম আবু হানীফা র. চল্লিশ বছর এশার অজু দ্বারা ফজর নামায পড়েছেন। হারামাইন শরীফাইনের যিয়ারতে যখন গেলেন, তখন

মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে দু'রাকাতে পূর্ণ কুরআন খতম করলেন, অত:পর হাত উঠিয়ে এ দু'আ করলেন-

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

'আয় আল্লাহ! আমরা আপনার ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি, আপনার মা'রিফাত যেমন হাছিল করা উচিত ছিল, তাও আমাদের দ্বারা হয়নি।'

এই শ্রেণীর নেককার লোকেরা নেক আমলও করেন, আবার ভয়ও করেন। একদিকে নেক আমল করছেন, অপরদিকে এ সব আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হচ্ছে কি না? এ ব্যাপারে শংকিত থাকেন। দিন-ভর এই চেষ্টায় রত থাকেন যে, বেশির চেয়ে বেশি নেক কাজ কি ভাবে করা যায়? আবার রাত্রি বেলায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই বলে কান্না কাটি করেন-

میری قسمت سے الٰہی پائے یہ رنگ قبول ÷ پھول کچھ میں نے چنے ہے اسکے دامن کے لئے.

গোলাপ বেলি হাসনাহেনার
মালা গেঁথেছি
ধন্য আমায় কর গো প্রভু
দু'হাত মেলেছি।

আমাদের আকাবিরীন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা সারা রাত ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন, অত:পর শেষ রাতে এমন অনুশোচনার সাথে ইস্তিগফার করতেন যে, মনে হত না জানি সারা রাত কোন বড় গুনাহে তারা লিপ্ত ছিলেন।

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

'রাত্রি বেলায় অল্প সময় তারা নিদ্রা যান এবং শেষ রাতে ইস্তিগফার করেন।'

হযরত মাদানী র. তাহাজ্জুদের সময় এমনভাবে ক্রন্দন করতেন যেমন কোন শিশু পিতার হাতে প্রহৃত হওয়ার সময় ক্ষমা চায়, চিৎকার করে, ফরিয়াদ করে, কান্নাকাটি করে, ঠিক এভাবেই হযরত মাদানী র. আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শাহী দরবারে হাত উঠিয়ে রোনাজারি করতেন।

এটি হচ্ছে ভয়ের দ্বিতীয় স্তর, নেক আমলও করছেন, আবার ভয়ও করছেন আমল যে ভাবে করা উচিৎ ছিল আমার দ্বারা তা হয়নি। যেমন বর্তমান যুগকে Quality Control (কোয়ালিটি কন্ট্রোল) এর যুগ বলা হয়। সবখানেই কোয়ালিটি কন্ট্রোল তথা মানোত্তীর্ণের কথা বলা হয়। আল্লাহ

রাব্বুল আলামীনের এখানেও মানের বিষয়টি দেখা হবে। ইরশাদ হয়েছে-

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

'যিনি জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কর্ম করে।'

দেখুন! এখানে اَكْثَرُ عَمَلًا (বেশি আমল) এর কথা বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে اَحْسَنُ عَمَلًا (উত্তম কর্ম) এর কথা। অর্থাৎ তোমরা আমল কর আমলের হক আদায় করে। যেভাবে করা উচিত, ঠিক সেভাবে কর।

তিন. ভয়ের তৃতীয় স্তর হল আরিফদের ভয়। এর ব্যাখ্যা হল এই শ্রেণীর বুজুর্গরা সাধ্যমত উত্তমরূপে আমল তো করেন, কিন্তু আবার এ শঙ্কায় কম্পিত থাকেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারব তো? না আবার এমন কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ব যার দরুণ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলার নেক দৃষ্টি থেকে আমরা পড়ে যাব। পরিণতি সম্পর্কে এ শ্রেণীর বুজুর্গগণ সদা শঙ্কিত-কম্পিত থাকেন।

এ পর্যায়ের ভয় হল আরিফদের ভয়। এমনকি হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. এর ভয়ও এমনই হয়ে থাকে। তারাও এমন শঙ্কায় শঙ্কিত থাকেন-

وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ.

'আমার জানা নেই, আমার সঙ্গে কি আচরণ হবে? এবং এ কথাও জানা নেই যে, তোমাদের সাথে কি আচরণ হবে? আমি তো শুধুমাত্র ঐ ওহীর অনুসরণ করি যা আমার নিকট আসে।'

আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.ও ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকেন যে, না জানি আমাদের পরিণতি কি হবে? কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আযমত, বড়ত্ব তাঁর জালালাতে শান সম্পর্কে তারা ওয়াকিফ থাকেন। আল্লাহ তা'আলার বে-নেয়াযী অমুখাপেক্ষিতা যখন প্রকাশিত হয়, তখন বাল'আম বা'উরার চারশত বছরের ইবাদতকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করে দেন। আর যখন তাঁর রহমতের দরিয়ায় ঢেউ উঠে, তখন ফুযাইল ইবনে আয়াযকে ডাকাত দলের নেতৃত্ব থেকে তুলে এনে আল্লাহওয়ালাদের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আল্লাহওয়ালা আরিফ বুজুর্গগণ এবং নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় করেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা চাইলে

কোন কারণ ছাড়াই পাকড়াও করতে পারেন এবং এটা শতভাগ ন্যায় সঙ্গতও হবে। কেননা একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে জঘন্য হতে পারে। বড় বড় পীর-মাশায়েখরা অনেক সময় বাহ্যত তুচ্ছ বিষয়েও কঠিন পরীক্ষায় পতিত হয়েছেন।

আবদুল্লাহ উন্দুলুসী র. এর ঘটনা

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া র. লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ উন্দুলুসী র. যিনি হযরত শিবলী র. এর শায়খ ছিলেন। একবার কোন বিধর্মী এলাকার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভাবলেন, এরা কেমন নির্বোধ লোক যে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে? এতটুকু কথার উপর তার পাকড়াও হল যে, তুমি হিদায়াত লাভ করেছ, এটা তোমার কোন কৃতিত্ব নয়; বরং আমার অনুগ্রহ যে, আমি তোমাকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছি। তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক সমস্ত নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হল। হযরত বিধর্মী এক কিশোরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, ভক্তবৃন্দকে বলে দিলেন, তোমরা যার যার বাড়ি ফিরে যাও। তিনি হাফিজে কুরআন এবং হাফিজে হাদীস ছিলেন। অসংখ্য মানুষের পথের দিশারী ছিলেন। এখন তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। অন্তর জগত শূন্য করে দেয়া হয়েছে। তিনি ঐ কিশোরীর বাড়ি গেলেন, তার পিতাকে বললেন, একে আমার সঙ্গে বিবাহ দিন, কিশোরীর পিতা বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে থাক, দুই বৎসর আমাদের সেবা যত্ন কর, এ সময়ে আমাদের সঙ্গে তোমার জানা-শুনা হবে, সম্পর্ক হবে, এরপর আমার কন্যাকে তোমার হাতে তুলে দিব। এর আগে তোমাকে এ দায়িত্বও পালন করতে হবে যে, আমাদের এই শুকরগুলো তোমাকে চরাতে হবে। তিনি বললেন, আমি রাজি। দু'বছর পর্যন্ত শুকরের পাল চরাতে থাকলেন। একদিন হযরত শিবলী র. তার শায়খের কথা ভাবলেন যে, না জানি তিনি কি অবস্থায় আছেন? একবার দেখে আসা দরকার। দেখা করার জন্য তিনি আসলেন। দেখলেন আগের সেই জুব্বা, পাগড়ী এবং লাঠি যে সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি জুমার খুৎবা দিতেন, আজ ঐ সাজেই তিনি শুকরের পাল চরাচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা এ কাজেই তাকে লাগিয়ে দিয়েছেন। হযরত শিবলী র. নিকটে আসলেন। বললেন, হযরত! আপনি তো কুরআনের হাফিয ছিলেন, কুরআনে পাক কি আপনার স্মরণে আছে? বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন হযরত!

কুরআনের কোন আয়াতও কি আপনার স্মরণে নেই? বললেন, হ্যাঁ। বাস এই একটি আয়াত আমার স্মরণে রয়েছে।

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

'আল্লাহ তা'আলা যাকে অপদস্থ করেন, তাকে সম্মানিত করার আর কেউ নেই।' অত:পর জিজ্ঞেস করলেন, হযরত আপনি তো হাদীসেরও হাফেয ছিলেন, তিনি বললেন, আমি সব ভুলে গিয়েছি। জিজ্ঞেস করলেন, একটি হাদীসও কি আপনার স্মরণে নেই? বললেন, একটি হাদীস মাত্র আমার স্মরণে আছে-

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

'যে ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা কর।'

এ আয়াত এবং হাদীসটি ব্যতীত আর সব কিছু আমি ভুলে গিয়েছি। তখন হযরত শিবলী র. ক্রন্দন করা আরম্ভ করলেন। হয়ত কবুলিয়্যাতের সময় ছিল। হযরত উন্দুলুসী র.ও বিগলিত হয়ে পড়লেন, আহাজারি আরম্ভ করলেন, এক পর্যায়ে বলতে লাগলেন- আয় আল্লাহ! আমি তো কোন দিন আশা করিনি এমন অবস্থাও আমার হবে? যখন বিনয় নম্রতার সাথে দু' একটি কথা বললেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পছন্দ হল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা হারানো সব নেয়ামত ফিরিয়ে দিলেন, তওবার তাওফীক দান করলেন, অসংখ্য অগণিত মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার মাধ্যমে আবার হিদায়াত দান করলেন।

বন্ধুরা আমার! কুরআন হাদীসের হাফিয কোন মহান ব্যক্তির মুখ দিয়েও যদি অসতর্কতায় এতটুকু কথা উচ্চারিত হয়, তাহলেও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে পাকড়াও এসে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে শুকর পালের রাখাল বানিয়ে দেন। আর আমাদের কি হাইছিয়াত রয়েছে! আমরা তো ক্ষেত খামারের সাধারণ কৃষক মজদুর। আমাদের কি পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ওজব এর চিকিৎসায় দু'টি আয়াত

হযরত থানবী র. লিখেছেন, কুরআনে কারীমে দু'টি আয়াত রয়েছে এ দু'টি আয়াত যে ব্যক্তি পাঠ করল, সে কোন দিন ওজব দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে না, আত্ম প্রসাদ লাভ করতে পারে না। একটি আয়াত ইলম সম্পর্কে, অপরটি আমল সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন- কাকে? স্বয়ং

হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, যাকে সৃষ্টি না করলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতেন না, স্বয়ং তাকেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন-

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ

'আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি, সব কিছু ছিনিয়ে নিতে পারি।'

লক্ষ্য করুন আলোচ্য বক্তব্যে বড়ত্ব, কর্তৃত্ব এবং সর্বময়তার কেমন কঠোর উচ্চারণ- আমি যদি চাই তাহলে ওহীর মাধ্যমে আপনাকে প্রদত্ত সবকিছু অবশ্যই অবশ্যই ছিনিয়ে নিতে পারি।

একটু চিন্তা করুন, কাকে কেমন ভাষায় সতর্ক করা হচ্ছে? অতএব এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর কোন আলিম, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞান-গরিমার উপর কোন বড়াই করতে পারে না।

অপর আয়াতটি হচ্ছে আমল সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানের সরদার নবী-রাসূল এবং ফিরিশতাকুলের ইমাম স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করছেন-

وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ

'হে আমার হাবীব! যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম'-

لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا اِذًا لَّاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا.

আয়াতটির অর্থ করার হিম্মত-সাহস এ অধমের নেই।

আয়াত খানা তিলাওয়াত করে একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জাত কত মহান, কত আযমতওয়ালা? স্বয়ং হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে এ কথাগুলো ইরশাদ করেছেন। (আল্লাহু আকবার!) অত:পর আমরা আমাদের আমলের উপর কি করে গর্ব করি?

যে তালিবে ইলম এ আয়াত দু'খানা পড়ল এবং চিন্তা-ভাবনা করল, সে কখনই নিজের ইলম এবং আমলের উপর গর্ব করতে পারবে না। তার মস্তক সদা অবনত থাকবে, সর্বদা শঙ্কিত-কম্পিত থাকবে। জীবনে কখনো তার মধ্যে আমিত্ব ভাব আসবে না। সে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের একজন অধম বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করবে। অতএব আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের বড়ত্ব-মহত্বকে অনুধাবন করে আমাদের বিনয়-নম্র জীবন অবলম্বন করা

উচিত। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের এভাবেই চেষ্টা করা উচিত, যে ভাবে পালাতক গোলাম ধরা পড়ার পর লজ্জিত হয়। পুনরায় কাজে নিয়োজিত করা হলে মনিবকে খুশী করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। এ গোলাম মালিককে খুশী করার জন্য যেভাবে জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করে, আমাদেরও উচিত প্রাণ উজাড় করে দিয়ে নেক আমলের জন্য চেষ্টা করা। যেন পরওয়ারদিগারে আলম রাজি হয়ে যান। এটি হচ্ছে খাওফ বা ভয়ের সর্বোচ্চ স্তর। অর্থাৎ সদা-সর্বদা পরিণাম পরিণতির ব্যাপারে শঙ্কিত থাকা। এর আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আল্লাহর হাবীব সা. এর ভয়

সাইয়্যিদিনা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ভয় এমন পর্যায়ের ছিল যে, কখনো যদি ঝড় আসতো, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে চলে যেতেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারকের রঙ বদলে যেত। চেহারা মুবারক জুড়ে ভীতির ছাপ ফুটে উঠত। সাহাবায়ে কিরাম রা. জিজ্ঞেস করতেন, হে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনাকে যে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে? তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেন- পূর্বের উম্মতের উপর এভাবে ঝড় আসত, আকাশ মেঘে ঢাকা পরত, আর তারা মনে করত প্রবল বর্ষণ হবে, কিন্তু পাথর বৃষ্টি দ্বারা তাদেরকে তছনছ করে দেয়া হত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বজ্র তুফান দেখলে ভয় পেয়ে যেতেন। সলাতুল হাজত পড়তেন এবং মসজিদ ছেড়ে ঘরে যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুফান বন্ধ না হত।

আল্লাহ তা'আলার এই পরিমাণ ভয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরে সর্বদা বিরাজ করত। সদা শঙ্কিত থাকতেন না জানি আমাদের কি হয়?

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর ভয়

সাইয়্যিদিনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আবু বকর উপনামটিও বিরল অর্থ বোধক। ب ك ر বর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দের অর্থই হল সবকিছুর প্রথম

যেমন بُكُوْر (বুকূর) মৌসুমের সর্বপ্রথম ফলকে বলা হয়, بُكْرَةٌ (বুকরাতুন) দিনের প্রথম ভাগের নাম, بَاكِرَة (বাকেরা) এমন কুমারী মেয়েকে বলে যে কোন পুরুষকে স্বামীর চোখে দেখেনি বা প্রথম দেখেছে। এই বিশ্লেষণটি সামনে রেখে চিন্তা করুন আবু বকর নামটিই বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এ উম্মতের মধ্যে সম্মান-মর্যাদার শীর্ষ স্থানটি তাকে দান করেছেন।

তাছাড়া সাধারণ নিয়ম হল, যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তার আলো সর্ব প্রথম উঁচু দালান-কোঠায় পড়ে, তদ্রূপ নবুওয়াতের সূর্য যখন উদিত হল তখন এর আলোও সর্বাগ্রে ঐ ব্যক্তিত্বের উপর পড়েছিল যিনি উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত সুসংবাদ দিয়েছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন- আমি সকলের ইহসানের প্রতিদান দিয়েছি, কিন্তু আবু বকর এর ইহসানের প্রতিদান আল্লাহ-ই দিবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা বলা কত বড় ব্যাপার? (আল্লাহু আকবার!) তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যের সর্বোচ্চ স্থান লাভ কারী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তাঁর মিল ছিল বিস্ময়কর।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ভয় এতো প্রবল ছিল যে, তিনি সদা শঙ্কিত-কম্পিত থাকতেন, কখনো বলতেন- আহ! আমার জননী যদি আমাকে জন্ম না দিতেন, কতই না ভাল হত। আহ! আমি যদি লতা-পাতা হতাম, অথবা যদি পাখি হতাম, আবার কখনো বলতেন, হায়! আমি যদি কোন মু'মিন বান্দার শরীরের পশম হতাম, এমন সব উক্তি করতেন। কারণ তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের আযমত-বড়ত্ব, মহত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফ ছিলেন, এ জন্যই ভয়ে কম্পিত থাকতেন, না জানি আমার কি হয়?

হযরত উমর ফারুক রা. এর ভয়

সাইয়্যিদিনা হযরত উমর ফারুক রা.। যার সম্পর্কে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লা[illegible]লাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ.

'যদি আমার পরে কোন নবী আসতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা উমর রা.কে এমন সব গুণাবলী দান করেছেন যে, তিনি-ই নবী হতেন।'

তিনি দুনিয়াতে জান্নাতের অগ্রিম সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। যাকে মুরাদে মুস্তফা বলা হয়। যার সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন- যে পথ দিয়ে উমর রা. চলাচল করে, শয়তান সে পথ থেকে পালিয়ে যায়। এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সদা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কম্পিত থাকতেন। স্বীয় শাসন কালে একবার তিনি হযরত হুযাইফা রা.কে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হুযাইফা! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মুনাফিকদের নাম বলে গিয়েছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে, তুমি এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না। আমি তোমাকে মুনাফিকদের নাম তো জিজ্ঞেস করছি না। এতটুকু জিজ্ঞেস করছি উমরের নাম তো ঐ তালিকায় নেই? কেমন আশ্চর্য কথা!

হযরত উমর ফারুক রা. মৃত্যুর সময় যখন নিকটবর্তী হল, তখন ইরশাদ করলেন- আমার রূহ দেহ ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্র আমাকে গোসল করিয়ে দ্রুত কাফন-দাফন সমাপ্ত করবে, এ কথাটি বারবার বলছিলেন। তখন একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! ঠিক আছে আমরা দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করব, কিন্তু এ বিষয়ে আপনি এত জোর কেন দিচ্ছেন? হযরত উমর ফারুক রা. দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন, তারপর ইরশাদ করলেন, কাফন-দাফন দ্রুত করার জন্য আমি জোর দিচ্ছি এ কারণে যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহলে তোমরা আমাকে আল্লাহর কাছে দ্রুত পৌঁছে দিবে, আর যদি আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে আমার বোঝা যত দ্রুত সম্ভব পৃথিবীর কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়া উচিত। উমরের পরিণাম তো আল্লাহই ভাল জানেন। (আল্লাহু আকবার!)

আল্লাহর ভয়ের চূড়ান্ত নমুনা

একজন সাহাবী বসে কাঁদছেন এমন সময় তাঁর বন্ধু আসলেন, জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে? কোন গুনাহ করেছ? কোন বিচ্যুতি ঘটেছে? সাহাবীর সম্মুখে গমের একটি দানা পরেছিল, তিনি দানাটি উঠিয়ে দেখালেন এবং

কসম করে বললেন, খোদার কসম! আমার জীবনের গুনাহসমূহের ওজন এ দানা সমপরিমাণও হবে না, গুনাহের কারণে আমি কাঁদছি না, আমি ক্রন্দন করছি এ ভয়ে যে, না জানি মৃত্যুর পূর্বে আমি ঈমান হারা হয়ে যাই। এটি হল ভয়ের চূড়ান্ত নমুনা। যা সাহাবায়ে কিরাম রা. এর অন্তরে সদা সর্বদা বিরাজ করত।

মাহবূবায়ে মাহবূবে খোদা উম্মুল মু'মিনীন মাখদূমাতুল মুসলিমীন হযরত সাইয়্যিদাহ আয়শা সিদ্দীকা রা. রাত ভর এ আয়াতখানা বার বার পড়তেন-

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারা এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে যা তারা কল্পনাও করেনি। এ আয়াতখানা বার বার পড়তেন, এমনকি রাত কাটিয়ে দিতেন। তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয় এ পরিমাণ ছিল।

হযরত হাসান বসরী র. এর ভয়

হযরত হাসান বসরী র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় এমন প্রবল ছিল যে, তিনি যখন রাস্তায় চলতেন, তখন তাকে দেখলে মনে হত, সবে মাত্র আপন পিতাকে কবরস্থ করে প্রত্যাবর্তন কারী এক শোক সন্তপ্ত যুবক। যখন তিনি কথা বলতেন, মুখমন্ডল জুড়ে ভয় এমনভাবে ছেয়ে থাকত যে, মনে হত তিনি বড় কোন অপরাধী, যার ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে। তিনি এত কাঁদতেন এত কাঁদতেন যে, চোখের পানি জমিনে পড়ে বয়ে যেত। একবার তার চোখের পানি নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। এমন নেককার আল্লাহওয়ালা বান্দা ছিলেন অথচ আল্লাহর ভয়ে এ ভাবে কাঁদতেন।

হযরত রাবেয়া বছরিয়্যা র. এর কান্না

হযরত রাবেয়া বছরিয়্যা র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কান্না করতেন এবং তাঁর চোখের অশ্রু মাটিতে গড়িয়ে পড়ত, এমনকি অনেক সময় তার চোখের পানিতে জমিনে ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত। একবার কেউ একটি ভুনা মুরগি তাকে হাদিয়া দিল, মুরগিটি দেখা মাত্র তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? এখন কান্নার কি কারণ? তিনি বললেন, আরে এ মুরগিটি তো আমার চেয়ে উত্তম। লোকটি বলল, তা কিভাবে? বললেন, মুরগিটি প্রথমে মারা হয়েছে অর্থাৎ যবাই করা হয়েছে,

অত:পর আগুনের উপর ভুনা করা হয়েছে। যদি রাবেয়ার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা না হয়, তাহলে তো তাকে জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।
তারা এমন ছিলেন যে, ভুনা গোশত দেখে জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন।

সরবত পান করার সময় আল্লাহর ভয়

হযরত উমর ফারুক রা. এর ঘটনা। একবার তিনি পানি চাইলেন। কেউ তাকে পান করার জন্য সরবত পেশ করল। সরবতের গ্লাসটি ঠোঁটে স্পর্শ করা মাত্র চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। এমনকি কান্নার ফোটা গ্লাসে পড়তে লাগল। কেউ বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন, ভয় হয় আল্লাহ তা'আলা যদি কিয়ামতের দিন বলে দেন-

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَعْتَمْتُمْ بِهَا.

'তোমরা মজাদার বস্তুসমূহ দুনিয়াতেই লাভ করেছ এবং উপভোগ করেছ।' অথচ আয়াতটি কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের বেলায় আয়াতখানা ফিট করছেন। এমন ভয় ছিল তাদের অন্তরে। সদা সর্বদা এই ভয়ে কম্পিত থাকতেন, না জানি আমার কি দশা হবে? এ ভয় তাদেরকে রাত্রি বেলা ঘুমাতে দিত না।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

'তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে পৃথক থাকত।'

আপন প্রতিপালককে তারা সন্তুষ্ট করতেন। বলতেন, আজকের রাতটি হল সিজদার রাত, কখনো বলতেন, এ রাতটি রুকুর রাত, আবার কখনো বলতেন, আজকের এই রাত কিয়ামের রাত। আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করতেন, মঞ্জুর করিয়ে নিতেন।

হাদীসের পাঠ দানের সময় আল্লাহর ভয়

একজন মুহাদ্দিসের ঘটনা। হাদীস পড়ানোর সময় ছাত্ররা হঠাৎ লক্ষ্য করল যে, তাঁর মুখমন্ডলের রঙ পরিবর্তন হচ্ছে, ভয়ের আছর ফুটে উঠছে, ক্লাশ শেষ হওয়ার পর কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত! আজকে এমন কি ঘটেছিল যে, আপনার মুখমন্ডলে আমরা সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করলাম। হযরত বললেন, তোমরা কি দেখনি দরসের সময় আমার মাথার উপর মেঘ জমে গিয়েছিল, আমি আশঙ্কা করছিলাম, না জানি এই মেঘ থেকে পাথর বর্ষণ করে আমার

আকৃতি বিগড়ে দেয়া হয়। হাদীসের দরস দেয়ার সময় মুহাদ্দিসগণ ভয়ে এমনিভাবে সন্ত্রস্ত থাকতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর ভয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র.কে হাদীস শাস্ত্রের সম্রাট বলা হয়। আসমাউর রিজাল গ্রন্থসমূহে তার প্রশংসায় যে সব বাক্যাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তা অন্য কোন মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তিনি সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বয়সে তাঁর বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি ইমামে আ'যম হযরত ইমাম আবু হানীফা র. এর সুযোগ্য শাগরিদ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অতি উচ্চ মাকাম দান করেছিলেন। এক সঙ্গে চল্লিশ হাজার ছাত্র তাঁর দরসে উপস্থিত থাকতেন। ঐ যুগে মাইকের কোন ব্যবস্থা তো ছিল না, তাই হযরতের দরসে মুকাব্বিরের ন্যায় লোক নিয়োজিত থাকত যারা দূর দূরান্ত পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে দিতেন। এমনকি অনেক সময় এ মুকাব্বিরের সংখ্যা হত ১১০০। অনুমান করুন যে, মজমার মুকাব্বিরের সংখ্যা ১১০০, সে মজমার বিশালত্ব কেমন হতে পারে? এমন অসংখ্য লোককে হাদীসের দরস দানকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. যখন জীবন সায়হ্নে উপনীত হলেন, একদিন শাগরিদদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে চৌকি থেকে নামিয়ে মাটির উপর শুইয়ে দাও। শাগরিদরা পেরেশান হয়ে পড়লেন। মেঝে তো কার্পেট মোড়ানো ছিল না, ইতস্ত: করতে লাগলেন, যখন দেখলেন বিলম্ব হচ্ছে, তখন আবার বললেন, আমাকে মাটিতে শুইয়ে দাও। আদেশ পালনার্থে ছাত্ররা মাটির উপর শুইয়ে দিলেন। হযরতকে মাটিতে রাখা মাত্র সকলেই চিৎকার করে উঠলেন। অবাক বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এ দৃশ্য দেখলেন যে, হযরত স্বীয় ললাট জমিনের উপর ঘষছেন। দাড়িগুলো ধরে কাঁদছেন আর বিলাপ করছেন, আল্লাহ! আবদুল্লাহর বার্ধক্যের উপর আপনি দয়া করুন।

সৃষ্ট জীব মাত্রই আল্লাহকে ভয় করে

হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মে'রাজে গমন করেন, তখন সপ্তম আকাশে দেখলেন, অত্যধিক লম্বা ফিরিশতাদের একটি জামাত সিজদারত অবস্থায় রয়েছেন। তাদের শরীর কাঁপছে এবং এ কম্পন থেকে আশ্চর্য এক আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে। নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আ.কে জিজ্ঞেস করলেন এটা কিসের আওয়াজ? হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, হে আল্লাহর নবী! এসব ফিরিশতা সিজদারত অবস্থায়-ই সৃষ্টি হয়েছেন এবং সদা সর্বদা তারা এ অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জালালাতে শানের প্রভাব তাদের উপর এত বেশি যে, সে কারণে তাঁরা কাঁপছেন আর তাদের কম্পন থেকে এ আশ্চর্য আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে।

একটু ভেবে দেখুন! আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জালালাতে শানের কি অবস্থা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের দিকে গমন করলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, জিবরাঈল আ.! এটা কিসের আওয়াজ? আরয করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! এটি হচ্ছে আরশে পাকের আওয়াজ। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের আজমত দ্বারা প্রভাবিত আরশ থেকে এ আওয়াজ হচ্ছে। যেমন কোন চেয়ারে সুঠাম দেহের কেউ বসলে চেয়ার থেকে এক ধরনের আওয়াজ বের হয়, এ ধরনের আওয়াজ আরশে পাক থেকে ভেসে আসছিল। যখন ফিরিশতাদের এ অবস্থা, আরশের এ অবস্থা, তো প্রিয় বন্ধুরা আমার! আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত, আমরা তো সেচ্ছায় গুনাহ করি, আমাদের পরিণতি কি হবে?

অতএব আল্লাহর ভয়ে আমাদেরকে সদা সর্বদা কম্পিত শঙ্কিত থাকতে হবে, রাত-দিন কেঁদে-কেটে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হতে।

আল্লাহ তা'আলা বড়ই আত্মমর্যাদাশালী

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا أَغْيَرُ وُلْدِ آدَمَ

আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন।

وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ

আর আল্লাহ তা'আলা আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাশালী সত্তা।

আমরা যখন গুনাহ করি, আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে পাকড়াও করেন না, অবকাশ দেন। এটা আল্লাহ তা'আলার বিরাট বড় অনুগ্রহ। যদি আমাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে আমাদের কি অবস্থা হত?

বন্ধুরা আমার! যদি গুনাহের বিশেষ কোন দুর্গন্ধ থাকত, তাহলে আমাদের আশে পাশে মানুষ বসতেও পারত না। আমাদের শরীর থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াতো।

আল্লাহ তা'আলা বড়ই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন যাত। কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি মিসরের- এক ব্যক্তি আযান দেয়ার উদ্দেশ্যে মিনারে উঠলেন। সেখানে উঠে জানালা দিয়ে এদিক সেদিক তাকালেন। হঠাৎ প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদে এক যুবতী মেয়েকে দেখে তার আসক্ত হয়ে গেলেন। মিনারা থেকে দ্রুত নেমে আসলেন এবং ঐ প্রতিবেশীর সাথে কথা বার্তা বলে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। প্রতিবেশীটি ছিল অমুসলিম, সে বলল, আসুন, ঘরে আসুন; ঘরে বসে কথা বলি। লোকটি ঐ বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় হঠাৎ পা ফসকে নিচে পড়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা অনেক সময় এমনই করেন, আযান দেয়ার উদ্দেশ্যে লোকটি যখন মিনারে উঠছিলেন, তখন তো মুসলমান ছিলেন, কিন্তু যখন নিচে নেমে আসলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা সব নেয়ামত ছিনিয়ে নিলেন। আমরা তো স্ব ইচ্ছায় গুনাহ করে থাকি, এটা আল্লাহর বিরাট বড় অনুগ্রহ যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অবকাশ দেন, আমাদের উপর রহমতের পর্দা ফেলে আমাদেরকে ঢেকে দেন। লোকমুখে আমাদের প্রশংসা করান, এ জন্যই কোন এক বুযুর্গ বলেন, হে বন্ধু! যে ব্যক্তি তোমার প্রশংসা করল, বস্তুত: সে তোমার প্রতিপালকের সাত্তারীর প্রশংসা করল। অর্থাৎ যে পরওয়ারদিগার দোষ ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন, তার প্রশংসা করল। যদি আমাদের আসল অবস্থা লুকিয়ে না রাখা হত, তাহলে মানুষের আমাদের মুখে থুথু দেয়ার ধৈর্যটুকুও হত না।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কত করুণাময়! কত দয়াময়! কত বড় হালিম! মানব ও দানব ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিকুল আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এ জন্য কোন সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে না। প্রত্যেকটি বস্তু আপন আপন কাজে নিয়োজিত। গাছ-গাছালী এবং পাথর-কংকরও আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.

'যতকিছু রয়েছে সবই তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝ না।'

প্রতিটি বস্তুর জানা রয়েছে তার দায়িত্ব কি? তার ডিউটি কি? ইরশাদ হয়েছে-

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَوتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

'প্রতিটি বস্তু তার নামায এবং তাসবীহ সম্পর্কে অবগত এবং সকলেই নিজ নিজ ইবাদত পালনে ব্যস্ত, মগ্ন।'

শুধুমাত্র মানব আর দানব ইচ্ছামত চলে, নাফরমানী করে, এজন্যই ইরশাদ হয়েছে-

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ

অবাধ্য জিন ও অবাধ্য মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তোমরা আমার জমিনের উপর বোঝা হয়ে রয়েছ, হে বোঝারা! শুন আমি অতি সত্বর তোমাদের জন্য অবসর হচ্ছি, আমি তোমাদেরকে মজা বুঝাব। মা যেমন বাচ্চাকে ধমক দিয়ে বলেন, আমি এখনই আসছি, এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি আসতে সক্ষম নন; বরং এর দ্বারা ধমক দেয়া ও সতর্ক করা উদ্দেশ্য যেন সে শোধরে যায়, অন্যায় থেকে বিরত থাকে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাও ইরশাদ করেছেন, আমি অতি সত্বর নিজেকে ফারিগ করছি তোমাদেরকে বুঝাব।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমরা তো হলাম ভূ-পৃষ্ঠের বোঝা। কত গুনাহই না আমরা করেছি, হায়! আমরা যারা দু' চার কেজি ওযন বহন করতে পারি না তারা টনকে টন গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। (আল্লাহু আকবার)

নামায হল সব ইবাদতের সমষ্টি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ গাছ পালা এবং পাথর এরাও আল্লাহর ইবাদত করে, বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গাছ পালাকে কিয়াম তথা দণ্ডায়মান অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। এরা সারা জীবন কিয়াম অবস্থায়-ই থাকবে। পোকা মাকড়কে আল্লাহ তা'আলা সিজদারত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, এরা জীবনভর সিজদারত অবস্থাতেই থাকবে। পাহাড়-পর্বতকে তাশাহহুদ (বৈঠক) অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, এ অবস্থায়ই তারা আল্লাহর হামদ ছানা করবে।

হে মানব জাতি! তাদেরকে তো একেকটি আমল দেয়া হয়েছে, তারা একটি একটি আমল করে, আর তোমাদেরকে তো সমস্ত আমলের সমষ্টি নামাযের মাধ্যমে দান করা হয়েছে। যদি আমরা উত্তমরূপে নামায পড়ার চেষ্টা করি, তাহলে কতই না ভাল হয়। যখন আমরা কিয়াম করি, তখন আমাদের ঐ সব ফিরিশতাদের সাথে সাদৃশ্য হয়, যারা কিয়াম অবস্থায়

সৃষ্টি হয়েছেন। যখন রুকু করি, তখন ঐ সব ফিরিশতাদের সঙ্গে আমাদের মিল হয় যারা রুকু অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছেন, এভাবে সিজদা অবস্থায় সিজদারত ফিরিশতাদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য হয়। এক নামাযের মধ্যে কত মর্যাদা আমরা লাভ করছি। এ জন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কোন ছায়াদার বৃক্ষের নিচে মল-মূত্র ত্যাগ করো না। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে হিকমত কি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যখন তার ছায়া কম বেশি হতে থাকে, তখন বৃক্ষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদারত থাকে।

বুঝা গেল বৃক্ষও সিজদা করে। আর আমরা অলসতা করি, কত আফসোসের কথা! সব সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকেও খওফে খোদা তথা আল্লাহর ভয় দান করেন। যেন আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

উটের খোদাভীতির আশ্চর্য ঘটনা

মদীনা শরীফের ঘটনা। বর্ণিত আছে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে একজন সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার একটি উট আছে, আমি এ উটের পিঠে মাল-সামান বোঝাই করে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছিয়ে থাকি, পশুটির প্রতি যথেষ্ট আমি লক্ষ্য রাখি। তার দানা-পানির ব্যবস্থা করি, কোন ত্রুটি করি না। কিন্তু যখন রাত হয়, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ি, হে আল্লাহর হাবীব! সে এমন হৃদয় বিদারক আওয়াজ করে যে, আমার চোখ খুলে যায়, আমার নিদ্রা পূর্ণ হয় না, আগামী দিন আবার আমাকে কাজে বের হতে হয়, এতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। এ বিষয়টি আমি আপনার খেদমতে বলার জন্য এসেছি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমরা তো বাদীর কথা শুনলাম, এখন আমাদের বিবাদীর কথাও শুনা উচিত। দেখি সে কি বলে? সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটি নিয়ে আসার জন্য বললেন, আনা হল, কিতাবের মধ্যে রয়েছে যে, সেই উট অত্যন্ত আদবের সাথে হেঁটে হেঁটে আসল এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তাশাহহুদ (বৈঠক) অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বসল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার মালিক তোমার নামে অভিযোগ করছে যে, সে তোমার

দানা-পানির প্রতি পুরোপুরি যত্নবান, আর তুমি রাত হলে তাকে ঘুমাতে দাও না। তখন উট জবাব দিল, হে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মালিক সত্য বলেছে, সে আমার দানা-পানির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ রাখে; হে আল্লাহর হাবীব! আমিও তার প্রতি লক্ষ রাখি। সে আমার পিঠে যত বোঝাই চাপায়, আমি কখনো তা বহনে অস্বীকার করি না। সর্বদা আমি তার বোঝাগুলো গন্তব্যে পৌঁছে দেই। সেও পরিশ্রম করে, আমিও পরিশ্রম করি। অতঃপর উভয়ে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে সন্ধা বেলা ঘরে ফিরে আসি। হে আল্লাহর হাবীব! সে মাগরিবের পর খাবার খেয়ে ক্লান্তির কারণে অল্প কিছুক্ষণ আরাম করার জন্য শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুমের চাপ থাকার কারণে সে এমন গভীরভাবে ঘুমাতে থাকে যে, রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন আমার ভয় হয়, আশঙ্কা হয় না জানি তার এশার নামায কাযা হয়ে যায়। এ আশঙ্কায় আমি রাত্রে আর নিদ্রা যাই না। ক্লান্তিতে আমার দেহ চুর্ণ বিচূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি জেগে থাকি, আর কিছুক্ষণ পর পর হৃদয় বিদারক আওয়াজ করি এবং তাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করি, যেন আমার মালিক জেগে উঠে এবং তার মালিক আল্লাহ তা'আলার আদেশ পূর্ণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। কিয়ামতের দিন যেন আমাকে জিজ্ঞেস করা না হয় যে, তুমি তো তার সঙ্গী ছিলে, তার পাশেই বসে থাকতে, তুমি তাকে জাগিয়ে দিতে। সে আমার হুকুম পুরা করে নিত।

হে আল্লাহর হাবীব! সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত-অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমি ঘুমাই না, আমার মালিককে জাগিয়ে দেই, যেন সে তার মালিকের নাফরমানী না করে।

কত বিস্ময়কর কথা! এ সব প্রাণীর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার এমন ভয় ছিল, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা এমন খওফ দান করেছেন। আমরা তো সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নিকট এমন খওফ লাভ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা দরকার। যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও এমন খওফে খোদা দান করেন। এর উসিলায় আমরা যেন গুনাহমুক্ত জীবন-যাপন করতে পারি।

আসুন, আজ আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই। হে আমাদের প্রতিপালক! আজ পর্যন্ত যত গুনাহই আমাদের দ্বারা হয়েছে, আমরা লজ্জিত, মর্মাহত, হে আমাদের মাওলা! আমরা তওবা করছি, অঙ্গীকার করছি, পরওয়ারদিগার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, আপনার যদি মর্জি হয়,

তাহলে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি ভবিষ্যতে আমাদেরকে গুনাহ থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

হযরত রাবেয়া বসরী র. এর আশ্চর্য দু'আ

হযরত রাবেয়া বসরী র. রাত্রে দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদ নামায পড়ে হাত তুলে দু'আ করতেন। তার দু'আ ছিল বড়ই আশ্চর্জনক। দু'আর সময় তিনি বলতেন আয় আল্লাহ! এখন দিন শেষ হয়ে রাত হয়েছে, প্রত্যেকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে গেছে। মালিক! আমার মহব্বত আর ভালবাসা হল তোমার সাথে। আমি তোমার সম্মুখে আঁচল খুলে বসে আছি। এরপর বড়ই আজব কথা তিনি বলতেন।

বলতেন- আল্লাহ! দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা কপাট বন্ধ করে দিয়েছে, তোমার দরজা এখনও খোলা। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। এক পর্যায়ে তিনি বলতেন- হে আল্লাহ! আপনি তো ঐ সত্তা যিনি আকাশকে যমীনের উপর পতিত হওয়া থেকে ধরে রেখেছেন। আপনি শয়তানকে আমার উপর প্রবল হওয়া থেকে ধরে রাখুন। এভাবে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে মানাইতেন এবং নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতেন, যে কারণে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাকে গুনাহমুক্ত জীবন দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খওফে খোদা দান করুন। আল্লাহ তা'আলার এ পর্যায়ের ভয় দান করুন, যদ্বারা আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি, গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে পারি। এ ভয় যখন মানুষের অন্তরে থাকে, তখন সে গুনাহ থেকে রক্ষা পায়। হে পরওয়ারদিগার! অনাগত ভবিষ্যতে আমাদেরকে গুনাহর লাঞ্ছনামুক্ত জীবন দান করুন। নেক জীবন-যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

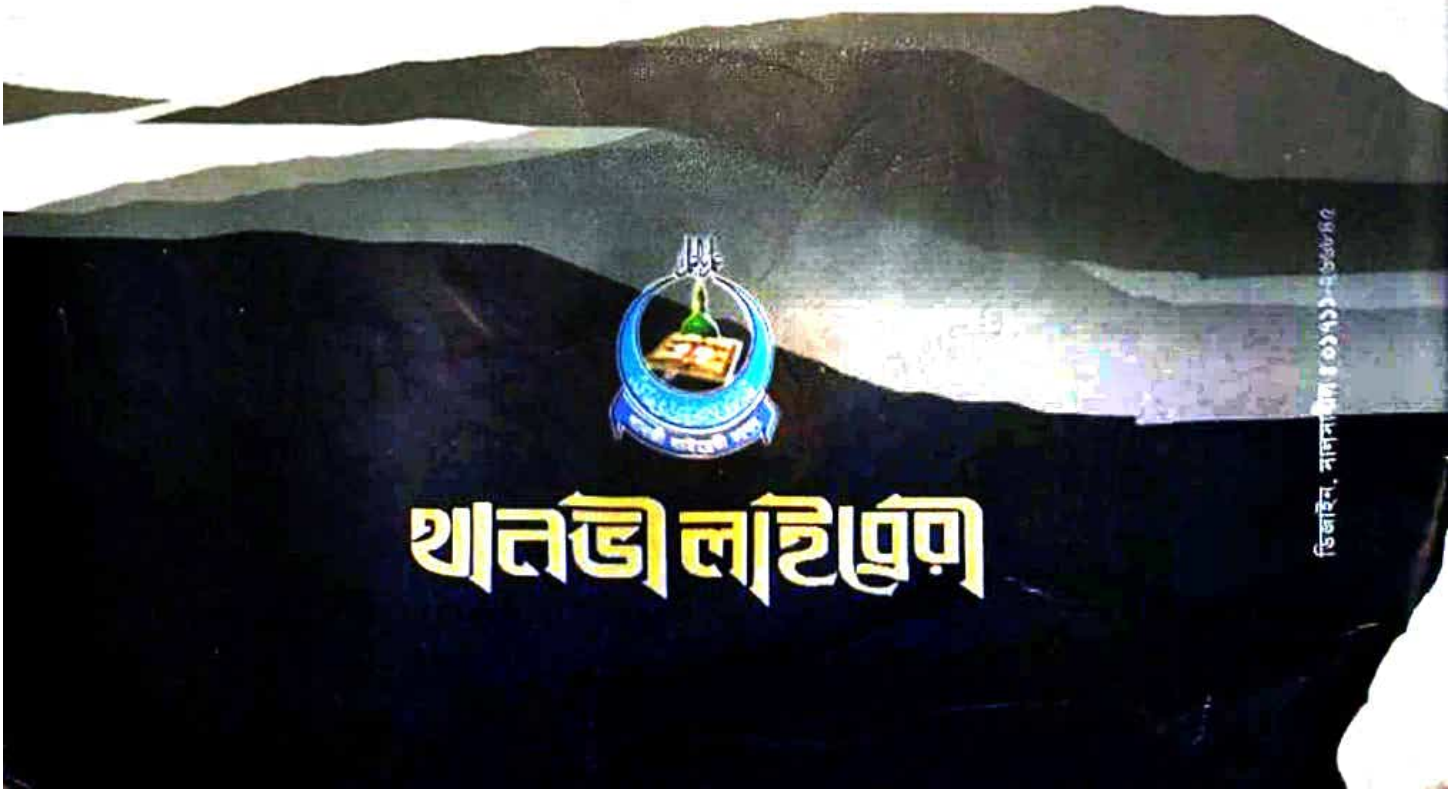
থানভী লাইব্রেরী